KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর ওসমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol & Number : 45/1 45/2 45/3 45/5	Year of Publication : May 1984 Jun 1984 July 1984 Sep 1984
	Condition : Brittle ✓ Good ✓
Editor : রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৫ বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা
জুলাই ১৯৮৪

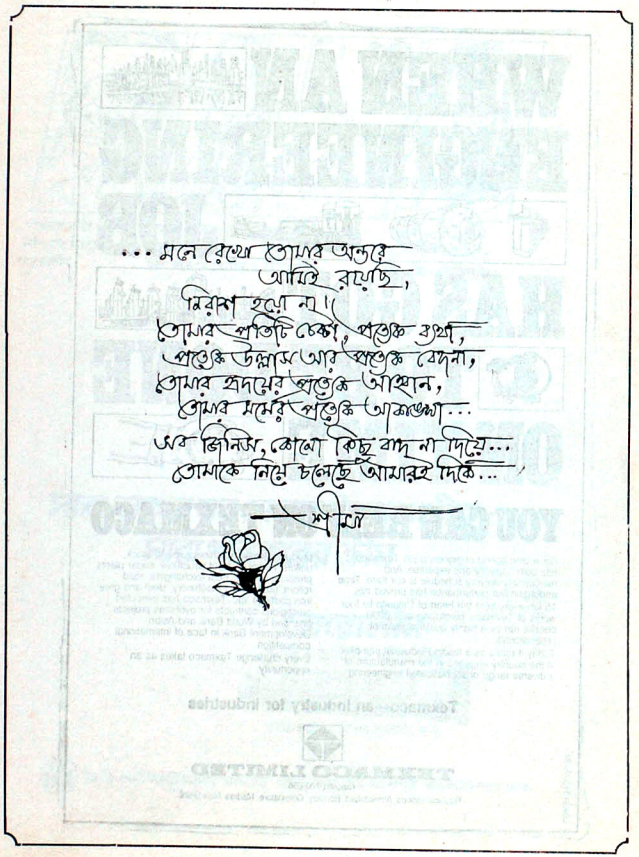

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্খা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শমী

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, টামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৪৫। সংখ্যা ৩
জুলাই ১৯৮৪
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৯১

আমাদের উচ্চশিক্ষার গতিপ্রকৃতি ভবতোষ দত্ত ২০১
মাধ্যম এখন ইলেকট্রনিকস গুরুদাস ভট্টাচার্য ২২৬

সেও ঠিক এমন বৃষ্টি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৯
ফরেস্ট অফিসারের ডায়েরি বিজয়া মুখোপাধ্যায় ২২২
বলেছিলেন রত্নেশ্বর হাজরা ২২৩
তিনটি চড়ুই মতি মুখোপাধ্যায় ২২৪
অলৌকিক ড্রাম গ্যাব্রিয়েল ওকারা/সমর চন্দ ২২৫

ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর রায় ২০৯
মৃত্যুর আগে অসীম রায় ২৩৬
শহর সংস্করণ শংকর বসু ২৪৫
জাহাজী গল্প অমৃতময় মুখোপাধ্যায় ২৫৪
গুরুজীর সঙ্গে চীনে শ্যামাদাস চক্রবর্তী ২৬৩

আলোচনা ২৬৮
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, উমা সেহানবীশ, কমল সরকার, রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদচিত্র। কালীঘাটের পট
(জুলেখা রহমানের সৌজন্যে)
শিল্পপরিকল্পনা রনেনআয়ন দত্ত

প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। ফোন ঃ ২৭-৬৩২৭

Aradhana Investments Limited
"EAGLE HOUSE"
4, Goverment Place North, Calcutta-700 001

সেও ঠিক এমনি বৃষ্টি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গোঁফ ওঠে নি ; ডিং মেরেও
দরোজার ছিটকিনিতে যে বয়সে পৌঁছোয় না হাত—
শরীর পায় না টের
রক্তের দোলায় দিনরাত্রির তফাত,
সকলের সমক্ষে ছেড়েও
অম্লানবদনে দিব্যি পরা যেত খালিগায়ে সুধু যৎসামান্য ইজের।

সে সময়ে থেকে থেকে দমকা ছাটে
কানা করে দিয়ে দৃষ্টি
হাটে মাঠে বাটে
অহর্নিশ একনাগাড়ে পড়েছিল মুষলধারায়
সেও ঠিক এমনি বৃষ্টি।

আর সেই জলবন্দী দ্বীপে
শানবাঁধানো ইঁদারায়
পা-টিপে পা-টিপে
হাতের নাগালে উঠে এসেছিল অন্ধকারে নির্বাসিত
বহুশ্রুত
কূপমণ্ডুক দুটো
ব্যাং।
বাইরের জগতে তারা ইচ্ছে করলে ড্যাডাং ড্যাডাং
অনায়াসে দিতে পারত লাফ—
কিন্তু কী আশ্চর্য, লাফ দিতে দেখি নি তো।

সামনের জিওল গাছে খালি চাপ-চাপ
ঝুলত জমাট রক্ত
থুত্থুড়ে বুড়োর মতো পাকাপোক্ত
কোঁচকানো বাকলে।
বর্ষার কয়েকটা মাস দেখেছি যদ্দুর
চোখ তার ভরে উঠত জলে।

যাঁর কথা বলব বলে এ কবিতা লেখা
তিনি কিন্তু এতক্ষণ একা
এককোণে ;
ফুটো ছাদ ;
উনুন নেভানো।
শিকেয় মাটির হাঁড়িকুঁড়িগুলো খালি পেটে কেবলি দোল খায়।
চাল বাড়ন্ত ; কাছেপিঠে থাকে বেশ ক-ঘর যজমানও।
উঠুক রোদ্দুর।

এরপর শুধু একটা দৃশ্য আছে মনে।
কী যে হতভম্ব হয়ে আধখোলা জানলায়
আমি গণেছিলাম প্রমাদ।

নখদন্তহীন সেই পুরুতঠাকুর
অঙ্গুষ্ঠে জড়ানো পৈতে, ঊর্ধ্বমুখে নিক্ষিপ্ত তর্জনী
পড়লেন কিসব মন্ত্র (পাল্লা দিচ্ছে তার সঙ্গে মেঘের গুড়গুড়)
ওঁ স্বাহা ফট্ বলে গলবাদ্যে ফোটালেন ধ্বনি।

পৈতে ছিঁড়ল, মন্ত্র গেল বৃথা।
সেও ঠিক এমনি বৃষ্টি
ভাসল সৃষ্টি
সে বালক আজও ভোলে নি তা॥

আমাদের উচ্চশিক্ষার গতিপ্রকৃতি

ভবতোষ দত্ত

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন প্রধানত দেখানো হয় এর প্রসার কতটা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা সত্যি সত্যি কতটা উঁচু, তা নিয়ে বেশি কেউ চিন্তাভাবনা করেন না। পরিসংখ্যান দিয়ে অনায়াসেই দেখানো যায় যে ১৯৫০-এর পর থেকে প্রায় সাড়ে তিন দশকে দেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে আশাতীতভাবে, এবং ছাত্রসংখ্যাও দ্রুতগতিতে বাড়ছে। বর্তমানে সারা ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ১৫০, এবং কলেজের সংখ্যা প্রায় ২,৫০০। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রসংখ্যা এখন ৩২ লক্ষ। যদি বর্তমান হারে সংখ্যাটা বাড়তে থাকে, তাহলে ২০০০ সালে এটা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৬০ লক্ষতে।

তথাকথিত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যানগত প্রসার বহির্বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের প্রকাশিত হিসাব অনুসারে, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ভারতে নয় শতাংশ কোনো না কোনো উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র। দরিদ্র দেশ বলে যাদের অভিহিত করা হয় এই অনুপাত তাদের মধ্যে ভারতে সবচেয়ে বেশি—অনুপাতটা বাংলাদেশে তিন শতাংশ, শ্রীলঙ্কাতে তিন শতাংশ এবং পাকিস্তানে দুই শতাংশ মাত্র। সমৃদ্ধ দেশগুলিতে অবশ্য এই অনুপাত সাধারণত কুড়ি থেকে ত্রিশ শতাংশের মধ্যে। যেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটা এই যে, ভারতে উচ্চশিক্ষায় নিযুক্ত ছাত্রের অনুপাত ২০-২৪ বয়সের জনসংখ্যার মধ্যে ১৯৬০ সালে ছিল মাত্র তিন শতাংশ ; ১৯ বছরে অনুপাতটা তিনগুণ বেড়েছে। তা ছাড়া, কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একটা বিরাট সংখ্যা ২০ বছর বয়সের নীচে ; তাদের এই পরিসংখ্যানে ধরা হয় নি।

সারা ভারতের মতো পশ্চিমবঙ্গেও উচ্চশিক্ষার সংখ্যাগত প্রসার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখন সংখ্যাটা নয়—কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী এবং কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়কে ধরে নিয়ে। তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য ডিগ্রি-প্রদাতা মহাবিদ্যালয় আছে আরো দুটি—খড়্গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব টেকনোলজি এবং কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিট্যুট। কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিট্যুট অব ম্যানেজমেন্টকেও এদের সঙ্গে ধরে নেওয়া

উচিত। সারা রাজ্যে কলেজ আছে প্রায় ৩০০ এবং সব মিলিয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। বছরে দেড় থেকে দুই লক্ষ ছাত্র উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে বি-এ, বি-কম, বি-এসসি. ক্লাসে ভরতি হবার জন্য চেষ্টা করে।

উচ্চশিক্ষার এই প্রসার দেশের উন্নতির লক্ষণ নয়, বরং আর্থিক উন্নয়নে অসাফল্যেরই পরিচায়ক। অধিকাংশ ছাত্র কলেজে আসে তাদের আর-কিছু করবার নেই বলে। স্কুলের পরীক্ষার শেষেই যদি তারা কাজ পেয়ে যেত—যেমন অন্য দেশে হয়—তাহলে তারা কলেজে ভিড় করত না। যে-দেশে জাতীয় উৎপাদন বাড়ে গড়পড়তা বছরে মাত্র সাড়ে তিন শতাংশ, এবং জনসংখ্যা বাড়ে প্রায় সোয়া-দুই শতাংশ, সেখানে ক্রমবর্ধমান তরুণবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের কাজ জুটবে না—এটা সহজেই বোঝা যায়। কলেজে ছাত্র হিসাবে নাম লেখানোটা হয় বেকারত্বের বিকল্প। পরেও অবশ্য এরা বেকারই থাকবে—আমরা বহু অর্থ বিনিয়োগ করে বেকার মাধ্যমিক-পাশ তরুণকে বেকার গ্র্যাজুয়েটে পরিণত করছি। তা ছাড়া সবাই গ্র্যাজুয়েট হয়ও না। সাধারণত প্রায় অর্ধেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। যে পরীক্ষা পাশ করতে তিন বছর লাগা উচিত তার জন্য চার বা পাঁচ বছর লেগে যায়। সবসুদ্ধ এর ফলে হয়—অর্থ এবং সামর্থ্যের একটা বিরাট অপচয়।

এই প্রসারের মধ্যেও একটা বড়ো সমস্যা দেখা দিয়েছে ভৌগোলিক বৈষম্যে। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমতুল্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এক উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর সব কয়টিই হয় কলকাতায় বা তার একশ মাইলের মধ্যে। কলেজগুলির বেলাতেও চিত্রটি একই রকম। কলকাতার বড়ো কলেজগুলি বাদ দিলেও এই শহরের এবং আশেপাশের জেলাতেই রাজ্যের অধিকাংশ কলেজ। এখনো দার্জিলিঙ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলাতে কলেজের সংখ্যা অপ্রচুর। আর সুদূর মফঃস্বলে যেখানে কলেজ আছে সেখানেও বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ নেই, অনেক জায়গায় অনার্স পড়বার ব্যবস্থাও নেই। আমাদের রাজ্যের উচ্চশিক্ষা এখনো লক্ষণীয়ভাবে কলকাতা-কেন্দ্রিক।

নানা কারণে কলকাতার কলেজে পড়া ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয়। বাড়ির কাছের কলেজে না পড়ে কলকাতার কলেজে পড়তে আসার মধ্যে একটা 'স্নবারি' আছে, সুযোগ সুবিধাও কলকাতার কলেজে বেশি পাওয়া যায় —বিশেষত বিজ্ঞান পড়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু কলকাতার কাছাকাছি কলেজগুলিতেও ভালো শিক্ষক আছেন। এদের মধ্যে অনেক কলেজ যে-কোনো মানদণ্ড অনুসারে খুবই ভালো। অথচ ছাত্রের ভিড় কলকাতার কলেজে। অন্যদিকে, এইসব বাইরের কলেজের অধ্যাপকেরা অনেকে থাকেন কলকাতায়। সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যায় ছাত্ররা বাইরে থেকে কলকাতা আসে কলেজে ক্লাস করতে ; আর অধ্যাপকেরা কলকাতা থেকে বাইরের কলেজে যান ক্লাস নিতে। ফলে কোনো ক্ষেত্রেই ছাত্র-শিক্ষকের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় না। ছাত্ররা কলকাতা এসে ক্লাস করে, বাড়ি ফিরবার ট্রেনের সময় হল কিনা তাই নিয়ে চিন্তিত থাকে ; অধ্যাপকেরা কলকাতা থেকে ট্রেনে তাঁদের গন্তব্য স্থানে গিয়ে কোনোপ্রকারে ক্লাস নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। ক্লাসের বাইরে ছাত্রদের সঙ্গে যে মূল্যবান সংযোগ স্থাপিত হবার কথা, সেটা হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এই একই অবস্থা। বর্ধমান বা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কলকাতা থেকে যাতায়াত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বা শহরের সাংস্কৃতিক জীবনে এঁদের কোনো ভূমিকা নেই। অবশ্য কথা উঠবে যে, কলকাতার বাইরে থাকার অনেক অসুবিধা আছে, কিন্তু মফঃস্বলে যদি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় খুলতেই হয় তাহলে অধ্যাপকদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করতেই হবে। না হলে সব চেষ্টাই গতানুগতিক ক্লাস নেওয়া, পারসেনটেজ রাখা ইত্যাদিতে পর্যবসিত হবে।

সবচেয়ে বড়ো সমস্যা কলকাতার অতিকায় কলেজগুলিকে নিয়ে। এগুলিতে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তিন পর্যায়ে ক্লাস চলে, ছাত্রসংখ্যা প্রত্যেক পর্যায়ে দু হাজার বা তারও বেশি। আর্থিক প্রয়োজন ছাড়াও অন্য কারণে এদের ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়ে চলতে হয়। নিজেদের কলেজের উচ্চ-মাধ্যমিকের ছাত্রদের স্নাতক শ্রেণীতে ভরতি না করলে চলে না। এর উপরে আছে নানা রকমের রাজনৈতিক এবং সংগঠনগত চাপ। এই কলেজগুলিতে অনেক ভালো অধ্যাপক আছেন। আগেকার দিনে এসব কলেজে নানা কারণে বহু জ্ঞানী-গুণী অধ্যাপক পাওয়া যেত। এখন সে অবস্থা না থাকলেও অধ্যাপনার কাজে আগ্রহী বহু তরুণ সরকারি কলেজের বদলি এবং নানা-রকম বাধানিষেধের সম্ভাবনার মধ্যে না গিয়ে কলকাতার কলেজে কাজ করাটাই বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু সব-সুদ্ধ ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম। এবং সবচেয়ে কঠিন সমস্যা—স্থানাভাব আর সময়াভাব।

সব ছাত্রের জন্য যথা-প্রয়োজন ক্লাসের ব্যবস্থা করতে যতগুলি ঘর দরকার, তা এসব কলেজে নেই। টিউটোরিয়াল ক্লাস করবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় ছোটো ছোটো ঘর প্রায় কোথাও নেই। তা ছাড়া, তিন বেলা যেখানে ক্লাস চলে সেখানে প্রয়োজনমতো রুটিন করবার পক্ষে যথেষ্ট সময়ও পাওয়া যায় না। খুব সকালের ক্লাস আরম্ভ হতে দেরি হয়, দুপুরের ক্লাসের প্রয়োজনে সকালের ক্লাস তাড়াহুড়ো করে শেষ করতে হয়, সন্ধ্যার ক্লাস ('লোডশেডিং'-এর কথা না ধরলেও) বেশিক্ষণ চালানো যায় না। এক-একটি ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে—কিন্তু ক্লাস-বদল, নাম-ডাকা, ঘণ্টার শেষের দিকে বারান্দায় ভিড় ইত্যাদি কারণে ৩০ মিনিটও পড়ানো হয় কিনা সন্দেহ। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিজ্ঞানের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস। এর জন্য যে সময় দরকার তা পাওয়া যায় না। ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা অপ্রতুল। লাইব্রেরিতে নতুন বই কেনা প্রায় বন্ধ। কলকাতায় ভালো কলেজ বেশ কয়েকটি আছে, যেখানে এসব সমস্যা নেই, কিন্তু ছাত্রদের ১০ শতাংশ পড়ে সেইসব কলেজে যেগুলি 'অতিকায়' শুধু ছাত্র-সংখ্যার দিক থেকে এবং অন্য সব দিক থেকে ক্ষীণকায়।

এ অবস্থায় শিক্ষার মান নীচের দিকে নামতে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। বড়ো কলেজগুলি থেকে যারা পরীক্ষা দেয় তাদের অর্ধেকও পাশ করতে পারে না। পাশ-করা ছাত্রদের মানও নেমে যাচ্ছে, কিন্তু যারা পাশ করতে পারল না তাদের মান কত নীচুতে, সেটা সহজেই বোঝা যায়। এটা এক বিরাট অপচয়। সাধারণত শিক্ষার ব্যয় হিসাব করা হয় মোট ব্যয়কে ছাত্রসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে। এর বদলে, যদি যারা পাশ করছে শুধু তাদের নিয়ে হিসাব করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে অনেক তথাকথিত 'স্বল্প-ব্যয়'-এর কলেজে পাশ-করা গ্র্যাজুয়েট-পিছু ব্যয় খুবই বেশি। অধ্যাপক আর ছাত্রের মধ্যে অনুপাত ভালো করতে হলে, ছাত্রসংখ্যা কমানো দরকার, এবং এর জন্য প্রয়োজন মফঃসল কলেজের আকর্ষণ বাড়ানো। নতুন কলেজ হয়তো কোথাও কোথাও দরকার হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দরকার ছাত্রাবাস এবং অধ্যাপকদের জন্য বাসগৃহ। কলকাতার কলেজগুলিতে ছাত্রের ভিড়, অথচ মফঃসল কলেজে ছাত্র নেই—বিশেষত মানবিক বিষয়গুলিতে—এটা বাঞ্ছনীয় নয়। অনেকের হয়তো জানা নেই যে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০টি কলেজ আছে তাদের ছাত্রসংখ্যা ১০০-র নীচে। এদের কোনো-টিরই বয়স দশ বছরের কম নয়।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলে শিক্ষার মান উঁচু করা যায় না। কলেজ-প্রশাসন এবং পরীক্ষা-পরিচালনার সুবিধার জন্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন হতে পারে। যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, নতুনতর বিষয়ে বিশেষভাবে অধ্যাপনার জন্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয় দরকার হতে পারে। এ যুক্তি বাস্তবক্ষেত্রে দুর্বল, কারণ একবার একটা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে পারিপার্শ্বিকের চাপে সেটা অল্প দিনের মধ্যেই গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়। বিশ্বভারতী এখন আর-পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রভারতীর যা বিশেষত্ব হবার কথা ছিল, তা না হয়ে এটা একটা সাধারণ মহাবিদ্যালয়ের স্তরে চলে এসেছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা যোগ্য অধ্যাপক পাওয়া। এমনিতেই সারা দেশে যোগ্য পণ্ডিতের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, তা ছাড়া আমাদের শিক্ষিত তরুণদের একটা বিরাট অংশ অন্য নানা দিকে চলে যায়, কারণ সেখানে আর্থিক আকর্ষণ অনেক বেশি। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো অসুবিধা হয়—অন্তত প্রথম দিকে—শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারলে। যথেষ্ট অর্থসংগতি থাকলে সবই হয়, কিন্তু আর্থিক প্রাচুর্যের প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল কেটে যায়।

আমাদের রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ভৌগোলিক পরিকল্পনার একটা বড়ো ত্রুটি কল্যাণীকে বেছে নেওয়ায়। কলকাতার বাইরে বর্ধমান আর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরে তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপ-যুক্ত স্থান হত বহরমপুর-মুরশিদাবাদ—অর্থাৎ কলকাতা এবং শিলিগুড়ির প্রায় মাঝামাঝি। কল্যাণীতে বিশ্ব-বিদ্যালয় করবার পক্ষে যুক্তি ছিল যে সেখানে আমে-রিকান সৈন্যদের জন্য তৈরি কিছু নাগরিক সুব্যবস্থা

ছিল। এ যুক্তি বেশিদূর টেনে নেওয়া যায় না। এইসব 'সুব্যবস্থা' থাকা সত্ত্বেও কল্যাণীতে বহু কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহ নির্মাণ করতে হয়েছে। পুরানো বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে, অতএব বিশ্ববিদ্যালয় হোক—এই যুক্তি বর্ধমানের বেলাতেও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার রাজপ্রাসাদ প্রায় কোনো কাজেই লাগে নি—প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ি সব নতুন করে তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল। বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজকে কেন্দ্র করে একটি ভালো বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা যেত। এখনো যদি কলকাতার উত্তর দিকের সব কলেজকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাহলে বহরমপুর কলেজকে এই প্রসারিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে গড়ে তোলা যায়—স্নাতকোত্তর ক্লাস খুলে এবং স্বয়ংশাসিত কলেজে পরিণত করে।

কলেজে-কলেজে শিক্ষণের মানে যেরকম বৈষম্য আছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যেও তেমনি অ-সমতা সহজেই চোখে পড়ে। এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হতে পারল না, তারা যখন অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন মনে সংশয় জাগে। অপেক্ষাকৃত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বি-এ, বি-কম পরীক্ষায় পাশের হার পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ভালো। এটাও ভালো করে সমীক্ষা করে দেখা উচিত। সম্প্রতি দিল্লীর কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ তাঁদের গবেষণাবৃত্তি দেবার জন্য একটি পরীক্ষা নিয়েছিলেন। সেই পরীক্ষায় দক্ষিণ ভারতের একটি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এম-এসসি-র কেউই শতকরা পঁচিশের উপরে নম্বর পান নি। অথচ প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি থাকলে কলেজের অধ্যাপকের কাজ পাওয়া খুবই সহজ। শিক্ষাজগতের বাইরে যাঁরা বড়ো বড়ো নিয়োগকর্তা তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলের উপরে আস্থা হারিয়েছেন এবং নিজেরাই নির্বাচনী পরীক্ষা নেন। এইসব পরীক্ষায় কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কত শতাংশ কাজ পায় সেটারও সমীক্ষা হওয়া উচিত। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার মানে যথাসম্ভব সমতা আনবার চেষ্টা আইন করে করা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা একযোগে সিদ্ধান্ত এবং পন্থা অবলম্বন করলে এদিকে কিছুটা উন্নতি হতে পারে।

নানা রকমের পারিপার্শ্বিক চাপে যখন শিক্ষার মান নেমে যায় তখন দুঃখ হয়, কিন্তু আরো বেশি দুঃখ হয় যখন দেখা যায় যে কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টায় পরীক্ষার মান নামিয়ে আনছেন। এর দুটি উদাহরণ প্রথমেই চোখে পড়ে—প্রথম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ ক্লাসে শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে ইংরেজি ভাষা আর সাহিত্যের অবনয়ন, এবং দ্বিতীয়, এই কলকাতাতেই অনারস পরীক্ষার মান নামিয়ে আনবার জন্য চেষ্টা। ইংরেজিতে ছাত্ররা বেশি ফেল করে, অতএব ইংরেজির বাদ দেওয়া হোক—এ যুক্তি গ্রহণ করলে প্রথমেই সর্বস্তরে গণিত তুলে দিতে হয়। আর এটা অনেকেই মনে রাখেন না যে, অঙ্ক এবং ইংরেজির পরেই সবচেয়ে বেশি ফেল করে বাঙলায়—মাধ্যমিক থেকে বি-এ পর্যন্ত। ইংরেজির দরকার নেই—এই যুক্তি বহুভাষাভাষী ভারতে খাটে না। ইংরেজি তুলে দিলে সর্বভারতীয় আলাপ-আলোচনার ভাষা হবে হিন্দি। এটা যাঁরা বাঞ্ছনীয় বা সম্ভব বলে মনে করেন তাঁদের সংখ্যা হিন্দিভাষী অঞ্চলের বাইরে নগণ্য। বিশ্বসাহিত্য এবং বিজ্ঞানের দরজায় ঢুকতে হলেও ইংরেজি প্রয়োজন।

বলা যেতে পারে, ইংরেজিকে আবশ্যিক রাখার কী দরকার? এই প্রশ্নের মধ্যে যুক্তি আছে, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা হাস্যকর। বি-এ ক্লাসের ছেলেদের জন্য ইংরেজি একটি 'আবশ্যিক-অতিরিক্ত' বিষয়—'আবশ্যিক' এই কারণে যে বিষয়টা পড়তে হবে, বা অন্তত 'পার্সেন্টেজ' রাখতে হবে এবং পরীক্ষা দিতে হবে; 'অতিরিক্ত' এই কারণে যে বিষয়টিতে পাশ না করলেও চলবে, পরীক্ষায় একবার বসলেই হল, শুন্য পেলেও পাশ করা আটকাবে না। অবশ্য বিষয়টিতে ২০ নম্বরের বেশি পেলে বাড়তি নম্বরটা মোট নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হবে, কিন্তু অনেক ছাত্রই ২০ নম্বর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

অনারস পরীক্ষার মান নামানোর চেষ্টা হয়েছিল এই প্রস্তাব করে যে প্রত্যেক ছাত্রই প্রথমে দু বছর 'পাস-কোরসে' পড়বে। পরে তাদের মধ্যে যারা কোনো বিষয়ে একটা নিম্নসীমার উপরে নম্বর পাবে তারা এক বছরের অনারস পড়বে সেই বিষয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের তৃতীয় বছরটি যে এক বছর নয়, মাত্র ছয় মাস—সেটা অনেকেই ভেবে দেখেন নি। এক বছরে অনারস পড়ানো

আর প্রথম থেকে তিন বছর ধরে অনারস পড়ানোর মধ্যে কী আকাশ-পাতাল তফাত, সেটা অভিজ্ঞ শিক্ষকের বুঝতে দেরি হয় না। পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো অনারস পরীক্ষার একটা মান-সম্ভ্রম আছে—সেটাকে ধুলায় লুণ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চস্তরের কর্তারা—ছাত্ররা এটা চেয়েছে বলে জানা নেই। সুখের বিষয় যে এই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু যে মনোভাব এই ধরনের প্রস্তাব আনতে প্রবুদ্ধ করে সেটা বিপজ্জনক।

তৃতীয় আর-একটা বিষয়ও উল্লেখ করা যায়—সেটা হল ডকটরেট সম্পর্কিত। পি-এইচডি ডিগ্রির মান সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমান নয়, এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগেও সমান নয়। পশ্চিমবঙ্গের কাছাকাছি একটি রাজ্যে এমন বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে পাস-কোরসে বি-এ পাশ করে এম এ পরীক্ষায় শিক্ষকের দেওয়া সুপ্রাচীন নোট-খাতার উশ্চিরণ করে প্রথম শ্রেণী পাওয়া যায় এবং তারপরেই একটি 'গ্রাম-সমীক্ষা' করে ডকটরেট অর্জন করা যায়। এই 'গ্রাম-সমীক্ষা'তে এমন কিছু থাকে না যা স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার জানেন না। পশ্চিমবঙ্গেও অনেক বিষয়ে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার নামে যা হয়েছে তার কোনো ভদ্র সংজ্ঞা নেই। অথচ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত উঁচুদরের গবেষণা-নিবন্ধ তৈরিও হয়েছে। বি-এ পাস পরীক্ষার আজকাল প্রায় কোনো মানই নেই; অনারসের উপরে আক্রমণ চলছে; এম-এ পরীক্ষাকে সহজ করে আনবার চেষ্টা হয়েছে; এবং গবেষণা-ডিগ্রি সহজলভ্য করে তোলা হয়েছে।

অনেক সময় ভালো প্রকল্প আমরা এমনভাবে প্রয়োগ করি যাতে সমস্ত উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। এম-এ পরীক্ষাতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'সিমেস্টার' বা ষাণ্মাষিক মূল্যায়নের প্রথা কার্যকর করবার চেষ্টা হয়েছে। এই 'ষাণ্মাষিকী' পাশ্চাত্য দেশে খুবই সফলভাবে অনুসৃত হয়েছে। এই প্রথা সফল করতে হলে কয়েকটি বিশেষ দিকে নজর রাখতে হয়—লাইব্রেরিতে বই চাই প্রচুর সংখ্যায়, লাইব্রেরি খোলা রাখতে হয় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, কোনো বাইরের পরীক্ষক থাকেন না বলে, আভ্যন্তরিক পরীক্ষকদের কাজটা খুবে দায়িত্ব নিয়ে করতে হয়। যদি এইসব শর্ত পালিত না হয় তাহলে 'ষাণ্মাষিকী' প্রথা একটা ঘরোয়া ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যায়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থা খুব ভালোভাবে চলছে, আবার কোথাও কোথাও এই ব্যবস্থা খুব ঘটা করে আরম্ভ করে পরে তুলে দিতে হয়েছে।

তবুও পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ এম-এসসি পরীক্ষার মান অপেক্ষাকৃতভাবে ভালো—কোনো কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে ভালো। সমস্যা বি-এ, বি-কম, বি-এসসি নিয়ে। কলেজগুলির সমস্যার কথা আগেই বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয় কাজ—কলেজগুলিকে নিয়মিতভাবে পরিদর্শন এবং সেই পরিদর্শনের রিপোর্ট অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া। সবগুলি কলেজ বছরে একবার বা অন্তত দু বছরে একবার পরিদর্শন করতে হলে যে যোগ্যতম পরিদর্শকমণ্ডলী থাকা দরকার, তা কোথাও নেই। ফলে পরিদর্শনের রিপোর্টে ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষকের সংখ্যা, ঘরের সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য মাত্র পাওয়া যায়, কলেজে পড়ানো ঠিকমতো হয় কিনা, পরীক্ষার ফল বছর বছর খারাপ হলে উন্নতির জন্য কী করা দরকার, তা জানা যায় না। যে কলেজে পড়াশোনা হয় না, সে কলেজও ছাত্র পাঠাতে থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ বলে কিছু থাকে না।

এই অব্যবস্থার ফল ভোগ করে ভালো কলেজগুলি। তারা অন্য সব কলেজের সঙ্গে একই নিয়মে বা অনিয়মে চলে, তবে তাদের নিজেদের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা ভালো বলে সবটা ভেঙে পড়ে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম, পরীক্ষার পদ্ধতি, মূল্যায়ন—সবই হয় একই ছাঁচে, যার ফলে ভালো ছাত্ররা তাদের কৃতিত্বের মূল্য পায় না, ভালো করে কাজ করতে উৎসাহ পায় না। জ্ঞানী-গুণী শিক্ষকের উৎসাহও স্তিমিত হয়ে আসে। এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার ভালো কলেজগুলিকে অনেকটা স্বাধিকার দেওয়া এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা। শাসন যেখানে অনুপস্থিত বা শাসন যেখানে অপশাসন, সেখানে বাছাই-করা কলেজগুলিকে স্বয়ংশাসিত করার বিপক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

বলা হয় যে স্বয়ংশাসিত কলেজগুলির এক-একটি শীর্ষস্থানীয় সমাজের উপকারে আসবে—এগুলি হবে 'এলিট' প্রতিষ্ঠান। 'এলিট' শব্দটার অপব্যবহার করে যে-কোনো ভালো জিনিসকে আটকানো যায়। যদি যে

কোনো ভালো ছাত্রের এইসব স্বয়ংশাসিত কলেজে ভরতি হবার অধিকার থাকে, যদি যথেষ্ট বৃত্তির ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে আয়বৈষম্যের সুবিধা-অসুবিধার কথা উঠবে না। আসল প্রশ্ন যেটা সবাই এড়িয়ে যান সেটা হল : আগামী দিনে আমাদের ভালো বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, সাহিত্য-বিচারক প্রয়োজন হবে কিনা। যদি এদের প্রয়োজন থাকে, তাহলে এদের তৈরি করে নিতে হবে। আর তা না হলে যারা বহু টাকা ব্যয় করে বিদেশে শিক্ষালাভ করে আসতে পারবে তারাই কেবল সব দিকে নেতৃত্ব নিতে পারবে। বিদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আমাদের দেশের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাবে না কেন—এ প্রশ্নের মাত্র একটিই উত্তর হতে পারে। যাঁরা 'এলিটিজম' এবং 'ঔপনিবেশিকতা'র দোহাই দেন, তাঁদের বলা যেতে পারে যে প্রত্যেকটি সমাজতান্ত্রিক দেশে—সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে চীন পর্যন্ত—বাছাই-করা ছাত্রদের বাছাই-করা প্রতিষ্ঠানে উচ্চতম বিদ্যার শিখরে নিয়ে যাওয়া হয়। আরো বলা যায়, যে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা এখনো সর্বস্তরে পৌঁছয় নি এবং এখনো শতকরা ৬৪ জন নিরক্ষর, সেদেশে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ মাত্রই 'এলিট'। 'এলিটিজম'-এর যুক্তিতে সব কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় তুলে দিতে হয়, বা অন্তত নতুন আর-কোনো উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা চলে না।

প্রস্তাবিত 'উৎকর্ষ-কেন্দ্র' কলেজেও হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়েও হতে পারে। সব কলেজ বা সব বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চতম স্তরে তোলা যখন অসম্ভব, তখন তার জন্য সবগুলিকে নীচে ফেলে না রেখে, কয়েকটিকে অন্তত উন্নতির পথে অগ্রসর করে দেওয়াই সমীচীন। সব গ্রন্থাগার ভালো না হলে একটি গ্রন্থাগারও ভালো হবে না—এ যুক্তি যেমন অচল, সব কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমান নীচু স্তরে রাখার যুক্তিও তেমনি অচল। সারা ভারতে অন্তত একশটি কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগকে যদি উৎকর্ষ-কেন্দ্রে পরিণত করা যায়, তাহলে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী ইত্যাদিকে তৈরি করে নিতে পারি। নিজেদের উচ্চশিক্ষা নিজেরাই দেব বিশ্বের উচ্চতম মানে—এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলেই 'ঔপনিবেশিকতা'-র অবসান হবে।

পশ্চিমবঙ্গে স্বয়ংশাসিত কলেজের কথা তুললে প্রথমেই নাম ওঠে প্রেসিডেন্সি কলেজের আর শিবপুরের ইনজিনীয়ারিং কলেজের। আমাদের আজব দেশে রবীন্দ্র-ভারতী পায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান, অথচ তার চেয়ে সর্বাংশে বহুগুণে সমৃদ্ধ হয়েও প্রেসিডেন্সি মাত্র একটি 'অধীন' কলেজ হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের কাছ থেকে যে স্বাধিকার দাবি করে সেটা নীচের দিকে কলেজকে দিতে রাজি হয় না। শিবপুরের ইনজিনীয়ারিং কলেজ বহুদিন পর্যন্ত কার্যত স্বয়ংশাসিতই ছিল, কিন্তু সম্প্রতি এর মর্যাদা কমানো হয়েছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজেদের বি-টেক, এম-টেক পাঠক্রম চালু হবার পরে। সংস্কৃত কলেজকেও একটা ভালো স্বয়ংশাসিত শিক্ষা ও গবেষণা-কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা যায়। শুধু যে সরকারি কলেজ থেকেই স্বয়ংশাসিত কলেজ জন্মগ্রহণ করবে তাই নয়। কলকাতার উত্তর দিকে সব কলেজ যদি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যায়, তাহলে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজকে স্নাতকোত্তর ক্লাস-সহ স্বয়ংশাসিত কলেজে পরিণত করা যেতে পারে। হয়তো দু-একটি মিশনারি কলেজও এই অধিকার যুক্তিসংগতভাবেই চাইতে পারেন। বস্তুত, বর্তমান অবস্থায় সরকারি কলেজ রাখার কোনো কারণ আছে কিনা—এই নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে।

স্বয়ংশাসিত কলেজ নিজেরা পাঠক্রম প্রণয়ন করবে, শিক্ষক নিয়োগ করবে, এবং পরীক্ষা নেবে। ডিগ্রিটা প্রথম দিকে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং পরে হয়তো কলেজের নিজেরই। সরকারি নিয়ন্ত্রণ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যতটুকু ততটুকুই থাকবে—অর্থাৎ সরকার অনুদান দেবেন এবং টাকাটার অপব্যয় না হয়, সেটাও দেখবেন। সরকারি কলেজগুলি যদি রাখতে হয় তাহলে সেগুলিকে আদর্শ কলেজ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। এটাই ছিল আদি লক্ষ্য—অবিভক্ত বাঙলার প্রত্যেক 'বিভাগে' একটি করে সরকারি কলেজ থাকবে, এই নীতি গত শতাব্দীতেই গ্রহণ করা হয়েছিল—এই নীতি অনুসারেই সরকারি কলেজ হয় হুগলীতে, কৃষ্ণনগরে, রাজশাহীতে, ঢাকাতে এবং চট্টগ্রামে। এখনো অজস্র কলেজে অপরিণত এবং ছাত্রহীন অনারস ক্লাস না খুলে প্রত্যেক জেলাতে অন্তত একটি করে কলেজকে ভালো অনারস কলেজে পরিণত করা যায়—সেগুলি সরকারি কলেজও হতে পারে, বেসরকারিও হতে পারে। অর্থাৎ কলেজে

কলেজে তফাত হবে শিক্ষার মানে, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যেও বিভিন্ন বিভাগে উৎকর্ষ-কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন হবে, এবং কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরোপুরিই এরকম কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কমানোর আর-একটি উপায় হতে পারে 'পাস' পরীক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ প্রত্যেক কলেজকে তাদের নিজেদের ছাত্রদের 'পাস' ডিগ্রির জন্য পরীক্ষার ভার দেওয়া। প্রশ্ন করবে বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু খাতা দেখবেন কলেজেরই অধ্যাপকেরা। মূল্যায়ন হয়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ তথ্য পাঠানো হবে, এবং সেখান থেকেই ডিগ্রি দেওয়া হবে। এর বিরুদ্ধে দুটো আপত্তি তোলা হয়—প্রথম, এতে নিয়োগকর্তারা কলেজের নাম দেখে পছন্দ-অপছন্দ করবেন, এবং দ্বিতীয়, কলেজের অধ্যাপকেরা খাতা দেখলে তাঁরা সব ছেলেকে পাশ করিয়ে দেবার চাপে পড়বেন। নিয়োগ-কর্তার কাছ থেকে কলেজের নাম আজকালও গোপন রাখা যায় না—দরখাস্তে কলেজের নাম উল্লেখ করতে হয়। আর, বড়ো নিয়োগকর্তারা তো নিজেরাই আলাদা পরীক্ষা নেন। দ্বিতীয় আপত্তির বিরুদ্ধে বলা যায়, প্রথম দু-এক বছর হয়তো সমস্যাটা উঠতে পারে, কিন্তু পরে যখন ছাত্ররা দেখবে যে ঢালাও-পাশকরানো কলেজের ছেলেরা কাজ পায় না, তখন তারা নিজেরাই সংযত হবে। কলেজে কলেজে আলাদা করে মূল্যায়ন হলে যদি একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ে, সেটাও মঙ্গলজনক।

বি-এ, এম-এ ডিগ্রির যে সামাজিক কদর আগে ছিল, এখন তা আর নেই। বিবাহ-সম্বন্ধের সময় প্রশ্ন করা হত, পাত্র ক-টা পাশ? আমার ভাই 'গ্র্যাজুয়েটের সোনার মেডেল' কেন গলায় পরছে না তাই ভেবে দাদা অস্থির। প্রথম দুজন মহিলা যখন বি-এ পাশ করলেন তখন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অভিনন্দন জানিয়ে পরে লিখলেন, "তোমাদের পূর্বগামী আমি একজন, ও উপাধি, ওই বেশ করেছি ধারণ", অর্থাৎ জানিয়ে দিলেন যে তিনিও একজন গ্র্যাজুয়েট। বি-এ পাশ সমালোচকের ভয়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটা দিন অস্বস্তিতে কাটিয়েছিলেন। এখন ডিগ্রির দাম কমেছে। যে ভালো উপার্জন করছে তার ডিগ্রি আছে কিনা সেটা বড়ো করে কেউ দেখে না। কিন্তু তবুও, বহু ধরনের কাজের জন্য একটা বি-এর সার্টিফিকেট আবশ্যিক প্রবেশপত্র। অন্য দেশে স্কুলের পাশ ছেলেদের যতটুকু দাম, আমাদের দেশে গ্র্যাজুয়েটের দাম তার চেয়ে বেশি নয়। এই দাম বাড়ানো যায় যদি পরীক্ষাব্যবস্থা আর শিক্ষাব্যবস্থা একই সঙ্গে উচ্চস্তরে তোলা যায়। হয়তো একথাও বলা যায় যে পরীক্ষার মান উপরে তুলতে পারলে শিক্ষণের মান তার ফলেই বাড়বে।

এত কথা বলার পরেও বহু প্রশ্ন থেকে যায়। আমরা যারা শিক্ষক, আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি—মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক, এই দুই স্তরে দুবার বাছাই হবার পরে ছেলেরা কলেজে আসে, তারপর দু-তিন বছর আমরা তাদের পড়াই, তবু এত ছাত্র অকৃতকার্য হয় কেন? শিক্ষক হিসাবে আমাদের যা করণীয়—পাঠক্রম সুষ্ঠুভাবে শেষ করা, নিজেকে অধিকতর শিক্ষিত করে তোলা ইত্যাদি—তা কি আমরা সবাই করি? আমরা যারা গবেষণা-নিবন্ধ লিখে ডকটরেট পাই, তারা ডিগ্রি পাবার পরে আর কোনো কাজ করি না কেন? আরো প্রশ্ন তুলতে পারি, যেসব ছাত্রদের পাঁচ বছর অনারস আর এম-এ পড়িয়ে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মার্কা দিয়ে ছেড়ে দিই, তারা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন-চার বছর কাটাবার পর উঁচুদরের গবেষক হয়ে ওঠে কী প্রকারে? আমাদের ত্রুটি কোথায় সেটা আমরাই হয়তো বিচার করে বার করতে পারি।

কলেজের যাঁরা পরিচালক তাঁদের প্রশ্ন করা যায়—নিয়মিত ক্লাস হয় কিনা, প্রত্যেক শিক্ষক নির্ধারিত কাজ করছেন কিনা, এটা কে দেখবেন? কলেজের অধ্যক্ষের সবটা সময় চলে যায় সরকার আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে লম্বা-লম্বা চিঠিপত্রের আদান-প্রদানে এবং অনেক সময় শক্তিধরদের ঘরের বারান্দায় ঘোরাঘুরি করতে। সাধারণ ছুটি এবং পরীক্ষার জন্য ছুটি বাদ দিলেও বছরে অন্তত ১৮০ দিন ক্লাস হওয়া উচিত—আসলে অধিকাংশ কলেজে ১৫০ দিনও হয় না কেন? সরকারকে প্রশ্ন করা যায় যে, ৩০০ কলেজের জন্য লাইব্রেরির আর ল্যাবরেটরির জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে বছরে ২৫,০০০ টাকা দিলে মাত্র ৭৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বাজেটের ৪৫৬ কোটি টাকার (১৯৮৪-৮৫) মধ্যে

থেকে কি এই ৭৫ লক্ষ বা ১ কোটি টাকা বার করা যায় না? কয়েকটি সরকারি কলেজের পরিচালনাতেই কি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের সরাসরি কর্তব্যের শেষ? উপযুক্ত ছাত্রদের জন্য যথাসম্ভব উচ্চমানের ব্যবস্থা করা কি সরকারের প্রথম কর্তব্য নয়?

তার পরেও মৌলিক প্রশ্ন থেকে যায়—কোনটা বেশি জরুরি : শিক্ষার মান উন্নয়ন, না প্রশাসনিক অধিকার নিয়ে বিরোধ? উপাচার্য কীভাবে নিযুক্ত হবেন, তাঁর ক্ষমতা খর্ব করা হবে কিনা, আচার্য কে হবেন, তাঁরই বা ক্ষমতা কতটা থাকবে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ কতদূর যাবে, বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, না কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যাবে—এইসব নিয়ে শুধু বাদবিতণ্ডা হয় না, ব্যয়বহুল এবং কালক্ষয়কর মামলা-মোকদ্দমাও হয়। পৃথিবীর আর-কোনো দেশে শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে এত মামলা কোর্টে যায় না—শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীরা নিজেরাই সমস্যার সমাধান করে নেন। আমরা তা পারি না কেন? শিক্ষক এবং পরিচালক, ছাত্র এবং অভিভাবক—প্রত্যেকেরই এখন আত্মজিজ্ঞাসার সময় এসেছে।*

*উচ্চশিক্ষা-সংক্রান্ত যে কমিশনে লেখক যুক্ত ছিলেন, তার সংগৃহীত বিশেষ তথ্য এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয় নি। এই রিপোর্ট এখানে প্রকাশিত হয় নি। তাই সে রিপোর্টের জন্য প্রবন্ধের মতামত লেখকের ব্যক্তিগত।

ক্রান্তদর্শী

ছয়

অন্নদাশঙ্কর রায়

অনেক দিন বাদে সৌম্যদার চিঠি। আশ্রমে ফিরে গিয়ে জীর্ণসংস্কার করছে, সেইসঙ্গে তৈরি করছে একটি কুটির। সেখানে জুলির সঙ্গে সংসার পাতবে। বাপু অনুমতি দিয়েছেন। তবে একটা শর্ত আছে, সেটা মুখে বলবে। ভাবনায় পড়েছে। আপাতত বিবাহ স্থির। স্বরাজের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে না। জুলির মা আর ওকে সামলাতে পারছেন না। তাঁরও তো বয়স হয়েছে।

"আপাতত আমরা মুস্তাফীদের অতিথি। জুলি মিলিকে আর তার বাচ্চাকে সঙ্গ দেয়। আমি বেশির ভাগ সময় আশ্রমে আর ভাণ্ডারে কাটাই, মাঝে-মাঝে পরিদর্শনে যাই। বিয়েটা কোনো একটা আশ্রমে হবে। সেবাগ্রামে তো যেতে পারছি নে, তার বদলে সোদপুরে যাবার কথা ভাবছি। এতে জুলির মায়ের ভার হালকা হবে। তা ছাড়া যে মেয়ের বিয়ে তাঁরা ঘটা করে একবার দিয়েছেন সেই মেয়ের আবার বিয়ে দেওয়া তাঁদের কর্তব্য নয়। যাকে একবার সম্প্রদান করা হয়েছে তাকে দ্বিতীয় বার সম্প্রদানের প্রশ্ন ওঠে না। জুলি এখন স্বাধীনা নারী। আমরা সিভিল ম্যারেজের আগে কোয়েকারদের প্রথা অনুসরণ করব। ওদের সোসাইটিতে একটা ঘর থাকে। সেই ঘরে গিয়ে ওরা বিবাহের বইতে নাম সই করে। আমরাও তাই করব। তবে আশ্রমের কর্মীদের মিষ্টিমুখ করাব। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে না। কিন্তু জুলির ইচ্ছায় রবীন্দ্রসংগীত আর আমার ইচ্ছায় লালন-গীতি হবে। তার উপর যদি আরেকটি গান যোগ করতে হয় তো বাপুর প্রিয় গান 'লীড কাইন্ডলি লাইট।' ও গান আমাকেও বিচলিত করে। আমি মনে মনে জপ করি 'ওয়ান স্টেপ ইনাফ ফর মী।'

"জুলির মা বলেছেন তিনি তাঁর বাড়িতে একটা পার্টি দেবেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। আমি বলেছি বর সাজতে পারব না। আমি যা পরি তাই পরব। গায়ে খদ্দরের পানজাবি পায়জামা জওহর কোট। মাথায় গান্ধী টুপি। পায়ে বিদ্যাসাগরি চটি বা কোলহাপুরি চপ্পল। কী বল? খুব খারাপ দেখাবে? হংসো মধ্যে বকো যথা। ইঙ্গবঙ্গ ব্যারিস্টার-ডাক্তার-অধ্যাপকদের সভায় ইতর জন।

যাক, জীবনে একবার তো? জুলিকে খুশি করার জন্যে আমি রাজি হয়েছি।

"এখন এক আজব সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা জানতুম না যে মিলি সুকুমারকে ফেলে তার ছেলেকে নিয়ে আগেভাগে আসবে। মা-বাবাকে দেখবার জন্যে আর তাঁদের নাতি তাঁদের দেখাবার জন্যে সে প্লেনে জায়গা পাওয়া মাত্রই চলে আসে। সুকুমার ছুটির অপেক্ষায় আর সেইসঙ্গে জাহাজের অপেক্ষায় লন্ডনে থেকে যায়। মন্দ কী? অমন তো কত হয়। কিন্তু মিলি তো জুলিকে এখানে প্রত্যাশা করে নি। জুলির উপস্থিতি প্রথম দিকে ও আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই ওর ব্যবহারে একটা শীতলতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সেটা জুলির বেলা। আমার বেলা নয়। আমার বেলা উষ্ণতা। আমি তোমার মতো মনস্তত্ত্ববিদ নই। নারীচিত্ত আমার কাছে রহস্যময়। আমার মনে হয় মিলির বিশ্বাস জুলি এখনো সুকুমারকে ভালোবাসে। আর জুলির বিশ্বাস মিলি এখনো আমাকে। এদের সম্পর্কটা অহেতুক ঈর্ষার। একদিন একটা বিস্ফোরণ ঘটবে, তার আগে সরে পড়াই শ্রেয়। আতিথ্যেরও একটা অলিখিত মেয়াদ আছে। কিন্তু আমাদের কুটির এখনো বাসযোগ্য হয় নি, হলেও আমরা বিয়ের আগে সেখানে থাকতে পারি নে। বিয়ে তো সেই অগ্রহায়ণে। জুলির মা ইঙ্গবঙ্গ হলেও পাঁজি মানেন।

"এখানে আমার বন্ধুর অভাব নেই। তাঁদের দরজা খোলা। কিন্তু এক বাড়িতে দুজনের জন্যে দুটো ঘর কোথায়? তা হলে আমাদের ঠাঁই-ঠাঁই হতে হয়। তাতে জুলির বিষম আপত্তি। জুলিকে আমি কলকাতা ফিরে যেতে বলি। কিন্তু আমাকে সে একলা ফেলে যাবে না। এখন থেকেই সম্পত্তির মতো দখল নিচ্ছে। বিয়ে না হতেই এই। বিয়ের পরে আমাকে বোধহয় সিন্দুকে পুরবে আর সিন্দুক পাহারা দেবে। কিন্তু একবার বাগদান করার পর আর পেছিয়ে যাওয়া চলে না। এগিয়েই যেতে হবে, যা থাকে কপালে। বাপু আমাকে দিয়েছেন গঠনের কাজ। তিন বছর অবহেলা করেছি রাজনীতির ঝড়ঝাপটার খর্পরে পড়ে। জনগণের সেবা করা হয় নি। তাদের দুর্দশা বেড়ে গেছে। জনসেবাও এক ঈর্ষাপরায়ণা নারী। রাজনীতি তার সপত্নী। তারপর জুলির মা দিয়েছেন জুলির ভার। তাকে রাজনীতির মত্ততা থেকে সামলাতে হবে। রাজনীতিও ক্রমশ হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠছে। একদল হাতিয়ার শানাচ্ছে ইংরেজকে ভারতছাড়া করতে। আরেক দল হাতিয়ার শানাচ্ছে হিন্দুকে ভিটেছাড়া করতে। একদলের লক্ষ্য স্বাধীনতা। আরেক দলের লক্ষ্য পাকিস্তান। এ রাজনীতি জুলির জন্যে নয়। আমার জন্যে তো নয়ই।

"বিয়ের পর জুলিকে নিয়ে যেতে চাই তার শ্বশুরবাড়ি। সেখানে ওরা যদি ওকে বধূরূপে বরণ করে তা হলে গ্রামসুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করে বউভাত হবে। সবাইকে বসিয়ে দেওয়া হবে পংক্তিভোজনে। হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ হরিজন ভেদ মানা হবে না! যারা মানে তারা বাদ পড়বে। তাদের কিছু চালকলা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হবে। জুলি রান্নার কাজে পটু নয়। তবু গোটা দু-তিন পদ রাঁধবে। যদি দেখি সরষের ভিতরেই ভূত, পরিবারের ভিতরেই আপত্তি, তা হলে বউভাতের আয়োজন করব না, গ্রামের পাঠশালার জন্যে কিছু চাঁদা ধরে দিয়ে চলে আসব। পরে যদি কখনো আগ্রহ দেখি তখন যাব। তখন হবে বিলম্বিত বউভাত। সমাজসংস্কার তড়িদ্‌গতিতে হবার নয়। মহাত্মা গান্ধীও এক্ষেত্রে অসহায়। তবু তিনি যা করেছেন তা অবিশ্বাস্য। ব্রাহ্মণ-হরিজন বিবাহ। অপরের বিবাহে হরিজনের পৌরোহিত্য। মহারাষ্ট্রের মতো রক্ষণশীলদের দুর্গে।

"জুলির আর আমার আশা যূথিকা আর তুমি আমাদের শুভকর্মে যোগ দেবে। কিন্তু এই সামান্য কারণে ছুটি নিতে যেয়ো না। তারিখটা কবে পড়বে ঠিক হয় নি। সে সময় ছুটি থাকলে এসো। গ্রামের বাড়িতে যদি যাই তা হলে ফেরবার সময় তোমাদের ওখানে ঘুরে আসতে পারি। তোমাদের অসুবিধে না হলে দু-একদিন থেকে যেতেও পারি। দীপক আর মণিকাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করে।"

যূথিকা চিঠিখানা কেড়ে নিয়ে পড়ে। হাসতে-হাসতে বলে, "যেমন মিলি তেমনি জুলি। বিপ্লববাদীই হোক, আর রাজবন্দীই হোক, মেয়েলি ঈর্ষা যাবে কোথায়! এ তো ভারি মজার কথা। সৌম্যদাকে নিয়ে ত্রিভুজ। জুলিকে ওবাড়ি থেকে সরাতেই হবে। আর কোথাও যদি জায়গা না থাকে আমাদের এখানে আছে। গভর্নমেন্ট কি আমাদের সন্দেহ করবে? তোমার কোনো ক্ষতি হবে না তো? বিয়ে তো এখানেও হতে পারে। এখানেও গান্ধীবাদীদের আশ্রম আছে।"

"কিন্তু সৌম্যদা যদি তার স্বস্থান ত্যাগ করে গঠনের কাজে আরো একবার অবহেলা হবে। গঠনের কাজ হচ্ছে সংগঠনেরও কাজ। অহিংস ভাবে সংগঠনের। আবার যদি সংগ্রামে নামতে হয় তবে অহিংসাত্মক সংগঠনের প্রয়োজন হবে। মন্ত্রিত্ব করতে গিয়ে কংগ্রেস গঠনের কাজে মন দেয় নি, মন্ত্রিত্বত্যাগের পরও আপসের ভাবনাই ভেবেছে, আর নয়তো সংগ্রামের ভাবনা। যখন সত্যিসত্যি পালে বাঘ পড়ল, গণ-সত্যাগ্রহের ডাক এল, তখন দেখা গেল সংগঠন বলতে বিশেষ কিছু নেই। যে যেমনভাবে পারে লড়ছে। সংহতভাবে একটা সৈন্যদল যেমনভাবে লড়ে তেমনভাবে নয়। এটাকে মরাল ইকুইভালেন্ট অভ্‌ ওয়ার বলা শক্ত। বাপু বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেয়ে এটার দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। সৌম্যদাও বোঝে রেল লাইন ভেঙে, টেলিগ্রাফের তার কেটে যা হয় তা একপ্রকার বিদ্রোহ, তা অন্যপ্রকার যুদ্ধ নয়। লোকের মন এখন যুদ্ধের নৈতিক বিকল্পের দিকে নয়, আসল যুদ্ধের দিকেই ঝুঁকছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের মতো প্রেস্টিজ আগস্ট আন্দোলনের বিদ্রোহী জনতারও নেই। ওই যে শাহ্‌নওয়াজ, সায়গল আর ধিলন—ওদের সম্মান এখন সর্বভারতীয় বাদ দিলে প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদের চেয়েও বেশি। একদল জাতীয়তাবাদী যদি ইংরেজদের ভারতছাড়া করার জন্যে হাতিয়ারে শান দেয় তবে আশ্চর্য হবার কী আছে? কিন্তু অবাক হচ্ছি শুনে যে আরেকদল হাতিয়ারে শান দিচ্ছে হিন্দুদের ভিটেছাড়া করে পাকিস্তান হাসিল করতে।" মানস উদ্বেগের কণ্ঠে বলে।

"বেশ তো, পলাশী আর পানিপথ দুটোই পর পর হয়ে যাক। দেখা যাক কে জেতে কে হারে।" যূথিকা পরিহাস করে।

"এসব হল দারুণ সীরিয়াস ব্যাপার, ঠাট্টা-তামাশার বিষয় নয়। কত মানুষ মরবে, কত মানুষ ঘরছাড়া হবে, কত মানুষ সম্বল-সম্পত্তি হারাবে ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়। এ তো শুধু রাজায় রাজায় যুদ্ধ নয়, প্রজায় প্রজায় যুদ্ধ।" মানস প্রমাদ গণে।

"তোমার মতো স্বপ্নদ্রষ্টাদের কপালে স্বপ্নভঙ্গ আছে। তুমি কি বুঝতে পারছ না যে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই সারা হলে মুসলিম লীগের সঙ্গে লড়াই শুরু হবে? সেটা হবে পানিপথের কাছাকাছি কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে। যেখানে আফগানরা মারাঠাদের হারিয়ে দিয়েছিল। কংগ্রেস যদি হেরে যায় দিল্লী আগ্রা হারাবে। পাঞ্জাব সিন্ধু তো হারাবেই। বাঙলাদেশের একটা বলপরীক্ষা হবে। কোথায়, কবে বলতে পারব না। এইটুকু বলতে পারি যে ইংরেজদের যারা সশস্ত্র সংগ্রামে হারাবে তারা সশস্ত্র মুসলমানদের কাছে হার মানবে না। যুদ্ধ হলে তাতে দুই পক্ষেরই বহু মানুষ মরে, বহু মানুষ ঘরছাড়া হয় ; বহু মানুষ সম্বল-সম্পত্তি হারায়। এটাই নিয়ম। দেশের লোক যদি অহিংসার চেয়ে হিংসা পছন্দ করে তো তার লজিকসম্মত পরিণামের জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। দু শো বছর পরাধীনতার পরেও মুসলমান প্রধানদের মানসিক পরিবর্তন হয় নি। আবার সেই মুসলিম রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে চান। একটা দিনও সবুর করবেন না। ইংরেজরা যাবার আগেই তাঁদের মসনদে বসিয়ে দেবে। আর হিন্দুরা যে মারাঠা রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে চান না তা নয়। এবার অন্য নামে। এইটুকু যা পরিবর্তন হয়েছে।"

মানস খেই হাতে নিয়ে বলে, "বিস্ফোরণ তো আমাদের জীবনে একবার ঘটেছিল। বাসা না পেয়ে আমরা তখন বোস দম্পতির অতিথি। কী একটা তুচ্ছ কারণে খাবার টেবিলে মিসেস বোসের সঙ্গে তোমার বচসা বেধে যায়। তুমি খেতে-খেতে উঠে গিয়ে শোবার ঘরে দরজা দিলে। মিসেস বোসের সঙ্গে মিটমাট হল না। পরের দিন ওদের বাড়ি থেকে বিদায়। বিদায়কালেও মুখদেখাদেখি বন্ধ। তুচ্ছ কারণের পেছনে ছিল একটা গুপ্ত কারণ। মিসেস বোসের সন্দেহ, বোস তোমাকে পুজো করেন। বোসের অতীতটি তাঁর স্ত্রীর মনে সন্দেহ জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ওরকম ঘটনা জুলি-মিলির বেলাও ঘটতে পারে। সৌম্যদার যাবার জায়গা আছে, সে সেখানে গিয়ে থাকতে পারে। জুলির সঙ্গে একবাড়িতে থাকতেই হবে, এমন কী কথা আছে? ওটা বিলেতের বোর্ডিং হাউস নয়। জুলি কলকাতায় ওর মার কাছে ফিরে যাক, বিয়ের নোটিস দিক, শাড়ি শাঁখা আংটি কিনুক। সৌম্যদা নিজের আশ্রমে গিয়ে কুটির-নির্মাণ শেষ করুক। বিয়ের তারিখ জানতে পেলে আমরা ভেবে দেখব যোগ দিতে যাব কি না। কিন্তু বর্ধন যদি দিল্লী

চলে গিয়ে থাকে ওর ওখানে ওঠা হবে না। উঠতে হবে স্বপনদার ওখানে, যদি বৌদি রাজি হন। তোমার সঙ্গে ওঁর এখনো দেখা হয় নি। তা ছাড়া আমরা গেলে দীপক আর মণিকেও তো নিয়ে যেতে হবে। অতিথিসেবার ভার বেড়ে যাবে। বিলেতফেরত অধ্যাপিকার উপর এত বেশি ভার চাপানো কি ঠিক হবে? উদিতার কথা আলাদা। ওর বিয়েতে আমার একটু হাত ছিল। সেটা ও ভোলে নি।"

যূথিকা সেই পুরাতন বিস্ফোরণের কথা ভাবছিল। তার খেয়াল হয় নি যে ওর মূলে ছিল মেয়েলি ঈর্ষা। লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে, "আমারই বোঝা উচিত ছিল যে মিসেস বোসের পক্ষে ওটা স্বাভাবিক। বোসের পুরানো ডায়েরি উনি পড়েছিলেন। তাতে বহু বান্ধবীর উল্লেখ। না, বিস্ফোরণের ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। কেন ওরা ও বাড়িতে এতদিন আছে? একসঙ্গে থাকার আনন্দ তো সারাজীবন ধরে পাবে। সৌম্যদাকে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে লেখো যে বিয়ের আয়োজন করার জন্যে জুলির উচিত কলকাতায় এসে মায়ের কাছে থাকা। কিংবা আমাদের কাছে। এখানেও আশ্রম আছে, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আছেন। তা হলে আমাদের আর-কোথাও গিয়ে আর-কারো অতিথি হতে হবে না। তুমি হবে বরের বেস্ট-ম্যান, আমি হব কনের ব্রাইড্‌সমেড। কী মজা! ওরা শান্তিনিকেতনে গিয়ে মধুমাস কাটাবে। যাকে ইংরেজিতে বলে হনিমুন। মুন মানে এখানে চাঁদ নয়। মাস। মধুচন্দ্র হচ্ছে ভুল অনুবাদ।"

"বাঃ! কলকাতায় মায়ের ওখানে ওয়েডিং পার্টি? সেটা হবে না?" মানস মনে করিয়ে দেয়।

"যা বলেছ। আমাদের বেলা সেটা হয় নি। পনেরো বছর কেটে গেছে। কী কঠিন প্রাণ!" যূথিকার চোখে জল আসে।

"ও প্রসঙ্গ থাক।" মানস ওটা ধামাচাপা দেয়। ওর শ্বশুর শাশুড়ী এখনো ভুলতে পারেন নি যে তাঁরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। রানী ভবানীর কী যেন হন। ওদিকে প্রচণ্ড সাহেব। খানাপিনা সাজপোশাক চালচলন বিলকুল সাহেবি।

যূথিকা তার বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। একান্ত আদরের ধন। ছেলেবেলা থেকে সে মনে মনে স্থির করে রেখেছে সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তী-সুভদ্রার মতো সেও স্বয়ংবরা হবে, নিজের পতি নিজে নির্বাচন করবে। বাপ-মা এতে রাজি হবেন কেন? তাঁরা মেয়ের বিয়ের জন্যে যথারীতি উদ্যোগী হন। মেয়ের ষোলো বছর বয়স থেকেই শুরু হয়ে যায় পাত্র-অন্বেষণ। যতদিন না বিয়ে হচ্ছে ততদিন বাড়িতে বসে না থেকে সে কলেজে পড়ুক। দিল্লীতে তাকে মিরান্দা হাউসে দেওয়া হয়। সঙ্গদোষে বা সঙ্গগুণে সেও হয়ে ওঠে একজন ফেমিনিস্ট। আইন-সভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের মতো বিবাহে পতিনির্বাচনের অধিকারও নারীর সহজাত অধিকার! এর জন্যেও দরকার হলে লড়তে হবে। লড়াইটা নিজের গুরুজনের সঙ্গে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে যারা লড়বে তারা কি জীবনসঙ্গী মনোনয়নের স্বাধীনতার জন্যেও লড়বে না? জীবনটা কার? তাদের, না তাদের মা-বাপের? মেয়ে ভুল করবে। অসম্ভব নয়। কিন্তু বাপ-মাও কি ভুল করেন না? তাঁদের ভুলের জন্যে কত মেয়ের জীবন নষ্ট হচ্ছে।

ধনপতি রায়চৌধুরী কড়া মেজাজের লোক। তাঁর স্ত্রী শৈলবালার মেজাজও চড়া। তাঁরা মেয়ের মতামতকে এককড়াও দাম দেন না। তাঁদের চোখে মেয়ের সেই গৌরীদান কি রোহিণীদানের বয়স। আট কি নয় বছর। ও যেন কলেজের মেয়ে নয়, পাঠশালার মেয়ে। চাকর-বাকরদের মতো সেও জোহুকুম। তাঁরা তাঁদের ফরমাস-মতো পাত্রের অন্বেষণে ঘটক লাগান। তার পেছনে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেন। ফরমাসমতো পাত্র হবে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কুলীন। বনেদি জমিদারবংশীয়, যদিও জমিদারি বলতে এখন গুঁড়ামাত্র আছে। বিলেতফেরত ব্যারিস্টার বা সিভিলিয়ান, নিদেনপক্ষে ইনজিনীয়ার! সাহেবদের মতো ধবধবে ফরসা, ইংরেজি বলবে সাহেবি টানে। পরদার আড়ালে থাকলে বাঙালি বলে চিনতে পারা যাবে না। লাস্ট, বাট নট লীস্ট—কার্তিকের মতো রূপবান। এক-এক করে অনেকগুলি পাত্রকে খারিজ করে শেষ পর্যন্ত যাঁকে পছন্দ হয় তিনি কলকাতা হাইকোর্টের উঠতি ব্যারিস্টার, কলকাতায় তাঁদের নিজস্ব বাড়ি আছে, নাটোর মহকুমায় পৈতৃক ভদ্রাসন। কিন্তু—চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। তাঁরও আছে পানদোষ, জুয়ায় আসক্তি, মাঝে-মাঝে তিনি অন্যত্র রাত কাটান। তাঁর বউ তা সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি ফিরে গেছেন। আর আসবেন না। ওঁরাও বড়লোক।

যূথিকা ঘৃণাভরে এ সম্বন্ধ খারিজ করে। এমন স্বামীর সঙ্গে জীবন কাটানো যেন একটা দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে বেঁচে থাকা। মা রাগ করেন, বাবা বকেন। অভিমানী মেয়ে খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে। তখন ওঁরা বলেন, "আচ্ছা, তুই নিজেই কাকে বিয়ে করবি স্থির কর। কিন্তু মনে রাখতে হবে পাত্রটি হবে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন, বনেদি জমিদার-বংশীয়, জমিদারি লাটে উঠলেও চলে, বিলেতফেরত ব্যারিস্টার বা সিভিলিয়ান বা আর কিছু, সাহেবদের মতো ধবধবে ফরসা, উচ্চারণ সাহেবদের মতো, পরদার আড়াল থেকে কথা শুনে বাঙালি বলে চিনতে পারা যাবে না, সবশেষে কার্তিকের মতো রূপবান।" যূথিকা জবাব দেয়, "রাজকন্যারা রাজ-পুত্র খুঁজে বেড়ায় না। রাজপুত্ররাই রাজকন্যার খোঁজে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়। আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব।" বি-এ পরীক্ষা দেবার ঠিক আগে তাজমহল দেখতে গিয়ে মানসের সঙ্গে পরিচয়। প্রথম দর্শনেই প্রেম। দ্বিপাক্ষিক। পালিয়ে গিয়ে বান্ধবীর বাড়িতে গোপনে বিবাহ।

ধনপতিবাবু তখন সিমলায়। যূথিকা তার বরকে নিয়ে তাঁদের প্রণাম করতে যাবে। শৈলবালা দেবী পা সরিয়ে নিয়ে বলেন, "আমি এইমাত্র স্নান করে উঠেছি। শুদ্দুরটা আমার পা ছুঁয়ে দিল।" ধনপতিবাবু সাহেবি কেতায় হ্যান্ডশেক করে বলেন, "মিস্টার মালিক, ইউ মে রাইজ টু বি আ কমিশনার সাম ডে। অর আ হাইকোর্ট জজ পরহ্যাপস। আই উইশ ইউ লাক। বাট ইউ আর নো ম্যাচ ফর মাই হাই-বর্ন ডটার।" মানস তো হাঁ। তাকে প্রকারান্তরে বলা হল লো-বর্ন। ক্রোধে তার সর্ব-শরীর জ্বলে যায়। সে থরথর করে কাঁপে। তার পরে তোতলাতে-তোতলাতে দেয় মুখের মতো জবাব : "আমি ইংরেজিতে কথা বলি ইংরেজের সঙ্গেই। বাঙালির সঙ্গে নয়। আপনি যা বলেছেন তা ফিরিয়ে নিন।" তিনি খেপে গিয়ে বলেন, "আই কল আ স্পেড আ স্পেড। অ্যান আপস্টার্ট, অ্যান আপস্টার্ট।"

যূথিকার মুখ তখন রক্তরাঙা। শিবকে এই কথা বলেছিলেন দক্ষ। সে কি সতীর মতো দেহত্যাগ করবে? মানসের দিকে বিহ্বলভাবে তাকায়। মানস আপনাকে সামলে নিয়ে বলে, "আমরা তিনশো বছর ধরে বাদশাহি তালুক ভোগ করে এসেছি। মোগল সরকারকে এক পয়সা খাজনা দিই নি। ব্রিটিশ সরকারকেও না। বংশ-মর্যাদায় আমরা কারো চেয়ে খাটো নই। আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আমি জাতে উঠতে চাই বা আপনার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে অর্ধেক রাজত্ব চাই তা হলে সেটা আপনার ভুল। আমাদের বংশে কেউ কখনো পণ যৌতুক নেয় নি। আমিও নেব না।" ধনপতিবাবু বলেন, "বাট ইউ ক্যান নট বি আ ব্রাহ্‌মিন। ইয়োর সন উইল বি আ চণ্ডাল।"

তার পর যূথিকার দিকে ফিরে গম্ভীরভাবে বলেন, "চুজ বিটুইন ইয়োর ফাদার অ্যান্ড ইয়োর সো-কল্ড হাজব্যান্ড।"

যূথিকাও তেমনি তেজি মেয়ে। বলে, "চুজ বিটুইন ইয়োর ডটার অ্যান্ড ইয়োর সো-কল্ড হাই কাস্ট।"

ওরা যেমন হাতধরাধরি করে এসেছিল তেমনি হাত-ধরাধরি করে বেরিয়ে যায়। মা চেঁচিয়ে বলেন, "চলে যাবার আগে গয়নাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যা।"

যূথিকা এক-এক করে সব খুলে দেয়, আংটি ছাড়া। সেটা মানসের দেওয়া। একটা দৃশ্য হয়ে যায়। বাড়ির চাকরবাকর 'হাঁ' 'হাঁ' করে ছুটে আসে। কোনো পক্ষ নত হয় না। ধনপতিবাবুকে বিমর্ষ দেখায়। এতটা তিনি চান নি। কিন্তু তাঁরও তো মান আছে। তিনিও নত হন না। কিন্তু মানসকে ডেকে নিয়ে শাসান, "আমি কোর্টে গিয়ে মামলা করব যে আপনি আমার নাবালিকা কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করেছেন। সে বিয়ে বাতিল হবার যোগ্য। আমি তার গার্জেন বাতিলের প্রার্থনা করছি।"

মানস আশ্চর্য হয়ে বলে, "সে কী! যূথিকা তো বিয়ের সময় ডিক্লেয়ার করেছে তার বয়স বিশ বছর।"

"সেটা চাপে পড়ে। ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে মেয়েদের বয়স লেখা থাকে না। আমার মেয়ে আমারই মতো জিনিয়াস। ও তেরো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস করে। এখন ওর বয়স সতেরো। আমি হোরোস্কোপ দেখাতে পারি।" ধনপতিবাবু বলেন।

"তা হলে আদালতেই আপনার সঙ্গে মোকাবিলা হবে।" মানস পালটা জবাব দেয়।

এবার যূথিকা ভেঙে পড়ে। "বাবা, তুমি আমাকে ত্যাগ করতে চাও ত্যাগ করো। তোমার সম্পত্তি আমি চাই নে। কিন্তু আমার বিয়েটা বাতিল করতে যেয়ো

না। একবার বিয়ে হয়েছিল শুনলে আর কেউ আমাকে বিয়ে করবে না। তোমার সেই ব্যারিস্টার সুপাত্র মিসটার সান্যালও না। মানসের কী! সে পুরুষ মানুষ। সে হয়তো আরো ভালো বউ পাবে। আমি কি ওকে এত সহজে ছেড়ে দিতে পারি? কড়ি দিয়ে কিনি নি, কিন্তু দড়ি দিয়ে বেঁধেছি। আদালতে দাঁড়িয়ে বলব যে আমিই অগ্রণী হয়ে বিয়ের নোটিস দিয়েছি। আর আমার দেওয়া বয়সের অঙ্ক যদি মিথ্যা হয়ে থাকে আমারই তো সাজা হবে। এ বিবাহ তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়। আর দু'দিন বাদে যে গ্র্যাজুয়েট হবে তার নিজের ইচ্ছার কি কোনো মূল্য নেই?"

'আগুন হয়ে বাপ বারে বারে দিলেন অভিশাপ।'

তার পর থেকে দেখাসাক্ষাৎ চিঠিপত্র বন্ধ। যেমন দেবা তেমনি দেবী। নাতি হয়েছে খবরের কাগজে দেখেও তাঁর মন নরম হয় নি। ও যদি ছুঁয়ে দেয় তা হলে তো তাঁকে দিনে দশবার স্নান করতে হবে। নাতনি হয়েছে, সেটাও খবরের কাগজে দেখে থাকবেন। কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন।

ওঁরা সিমলা থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় বাড়ি কিনেছেন। ছেলেরা বিলেতে পড়াশুনা করে লায়েক হয়েছে। একজন তো মেম বিয়ে করেছে। তাতে জাত যায় নি। সে যে ছেলে। দুঃখের বিষয়, ওরাও বোনের খোঁজ নেয় না। যূথিকাও গায়ে পড়ে অন্তত স্বামীর জন্যে অপমান ডেকে আনতে চায় না। শিবের জন্যে সতীর মতো সে দেহত্যাগ করে নি, পার্বতীর মতো পুত্রকন্যা নিয়ে ঘরসংসার করছে। পুরোনো প্রসঙ্গ উঠলে মানসকে মনে করিয়ে দেয়, "তোমাকে আমি ছাড়ি নি। ছাড়ব না। বাপমাকেও কি ছেড়েছি? না, তাঁরাই আমাকে ছেড়েছেন।"

এসব দেখেশুনে মানসের বিশ্বাস হয় না যে বিপ্লব কখনো এমন দেশে হবে, যেখানে মানুষ এই বিংশ শতাব্দীতেও বর্ণান্ধ। বিপ্লব যদি হয় তবে সেটা শ্রেণীযুদ্ধ নয়, বর্ণযুদ্ধ। হাই-বর্ন বনাম লো-বর্ন। হাই-বর্নকে সম্পূর্ণরূপে নতশির করতে হবে, আর লো-বর্নকে আত্মসম্মানে উচ্চশির। জন্মগত কারণে কেউ উপরে নয়, কেউ নীচে নয়। একটি বিশেষ জাতে জন্মেছে বলে কতক লোক চিরকাল উপরে, কতক লোক চিরকাল নীচে, এর ওলটপালটই বিপ্লব। এটা ঘটবে যখন লোকে বুঝতে পারবে যে কেউ পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মায় না, কেউ পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলে শূদ্র হয়ে জন্মায় না। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে সনাতন বলে চালাবার জন্যে কর্মবাদ বা জন্মান্তরবাদকে ব্যবহার করা অনুচিত। বর্ণাশ্রমীরাই এটা করেছে, বৌদ্ধরা এটা করে নি।

আহত হয়ে মানস বলেছিল যূথিকাকে, "জুঁই, তুমি ধীবরকন্যা সত্যবতী হলেও আমি তোমাকে বিয়ে করতুম। তোমার পরিচয় তুমি।"

"তা হলে আমি ত্যাজ্যকন্যা না হয়ে তুমি ত্যাজ্যপুত্র হতে। আমি কি তাতে সুখী হতুম?" যূথিকা দরদে বলে।

মানস স্বীকার করে হিন্দু সমাজে ধাপের পর ধাপ। উচ্চতর নিম্নতর অসংখ্য পইঁঠা। ওর বাবা শঙ্কিত হয়ে সুধিয়েছিলেন, "তুই নাকি গয়লানি বিয়ে করতে যাচ্ছিস?" না, সে চেয়েছিল চাষানি বিয়ে করতে। বলে না।

মানসের মা নেই, বাবা তাঁর বউমাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাতে কিন্তু প্রমাণ হল না যে যূথিকা যদি গোপী হত তিনি তেমনি উদার হতেন। মানস মনে প্রাণে ব্রাহ্ম, কিন্তু হিন্দুসমাজভুক্ত। সমাজকে সে ভিতর থেকেই সংস্কার করতে চায়। জাতের বিচার একদিনে দূর করতে পারা যাবে না, কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ ব্যাপক হলে তার থেকে হুল চলে যাবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর হাতে তাকে হেনস্থা হতে হবে না।

তার বিবাহ যেমন প্রতিলোম বিবাহ, সৌম্যদার বিবাহও তেমনি অনুলোম বিবাহ। ওর আত্মীয়রা কি জুলিকে সাদরে গ্রহণ করবে? হয়তো মানসের মতো অবমাননা হবে বেচারির। এই পনেরো বছরে সমাজ অনেকটা বদলেছে। তবে শহর অঞ্চলেই।

সৌম্যদার বিয়েতে মানস যোগ দিতে পারে না। দায়রার মামলায় আটকে পড়েছিল। তা ছাড়া স্বপনদাকে লিখতে তার মনে দ্বিধা ছিল। টেলিগ্রাম করে ক্ষমা চায় আর অভিনন্দন জানায়। আশা করে অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

সৌম্যর পরিকল্পিত বিবাহপদ্ধতি জুলির অনুমোদন পায় না। অনুষ্ঠান আশ্রমেই হয়, কিন্তু সংক্ষেপিত হিন্দুমতে। শালগ্রাম বাদ, কিন্তু সংস্কৃত মন্ত্র বাদ নয়। স্ত্রী-আচার বাদ, কিন্তু হোম বাদ নয়। সম্প্রদান বাদ, কিন্তু বরকন্যার পরস্পরকে বরণ বাদ নয়। সাতপাক বাদ, কিন্তু সপ্তপদী বাদ নয়। সংগীত বাদ, কিন্তু শঙ্খধ্বনি বাদ নয়। দর্শকদের সকলের মিষ্টিমুখের আয়োজন ছিল। জুলিই জনে জনে মিষ্টান্ন বিতরণ করে। এর পরে ওরা রেজিস্ট্রি অফিসে যায়।

জুলির মা বাড়িতে পার্টি না দিয়ে হোটেলেই ডিনার দেন। জুলির কথায় নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা সংক্ষেপিত করেন। স্বপনদা, দীপিকাদি, বাবলীও নিমন্ত্রিত। স্বপনদা বাবলীকে বলেন, "চকোলেট, এর পর তোমার পালা।" বাবলী হেসে উড়িয়ে দেয়। "বিয়ে একটা বুর্জোয়া ব্যাপার।"

সৌম্য তার কাকার কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছিল তা একজন বাস্তববাদীর লেখা। "রাষ্ট্রে তোমরা যেসব পরিবর্তন ঘটাতে চাও সেসব লোকে সমর্থন করতে রাজি, কিন্তু সমাজের বেলা তারা ঘোর রক্ষণশীল। জাত ভেঙে বিয়ে করলে সমাজও ভেঙে যায়, বিধবার বিয়ে তো পাপ। তোমরা আপাতত বাইরেই থাকো, আমি এখানকার জনমত পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা করি। সাধারণ নির্বাচনে আমাদের দল যদি জেতে আর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তা হলে আমি একজন মন্ত্রীকেই এখানে ধরে নিয়ে আসব আর তিনিই তোমাদের অভ্যর্থনা করবেন।"

দেশের বাড়িতে যাওয়া হয় না। শান্তিনিকেতনে দিন তিনেক থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে মানস সপরিবারে গিয়ে রবিবারটা কাটায়।

জুলি কি আর সেই জুলি? লজ্জানম্র লক্ষ্মী বউ। ঠিক যেন একটি পল্লীবধূ। উড়নচণ্ডী বিপ্লবী নায়িকা নয়। জোন অভ আর্ক নয়। সিঁথিতে সিঁদুর। কপালে টিপ। বদনে আনন্দের উদ্ভাস। বিয়ের জল পড়ে স্নিগ্ধ।

সৌম্যকেও আগের মতো শুষ্ক কাষ্ঠ মনে হয় না। তারও পরিবর্তন হয়েছে। অনুমান করা কঠিন নয় যে সেও রসের আস্বাদন পেয়েছে।

যূথিকা মানসের কানে কানে বলে, "জুলি এখন বিজয়িনী। সৌম্যদা বিজিত। বিশ্বামিত্র আর মেনকা।"

সাত

যূথিকা আর জুলি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যায়। সৌম্যর সঙ্গে গল্প করে মানস। বিবাহের প্রসঙ্গ যেন ফুরোতে চায় না।

"দেশ যতদিন না মুক্ত হয়েছে ততদিন আমাকে ভীষ্মের মতো প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে। এ ছাড়া আমি আর কোনো কথা ভাবি নি, মানস। কিন্তু দেখলুম বিয়াল্লিশ সালের সংগ্রামে আমাদের জিত হল না। আরো একবার লড়তে হবে। কবে, কতদিন পরে কেউ বলতে পারে না। বাপু বেঁচে আছেন আরো একবার লড়বেন বলে। একশো বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচার কথাও বলছেন। তার মানে পরের বারের সংগ্রামের জন্যে আরো পঁচিশ বছর সময় নিচ্ছেন। তা বলে আমিও কি বিবাহের জন্যে আরো পঁচিশ বছর সময় নিতে পারি? জুলির হতাশা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। তার আশা ছিল গান্ধীজী যা পারলেন না নেতাজী তা পারবেন। কিন্তু ইম্ফলে তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের জিত হয় নি। ইংরেজকে তা হলে তাড়াবে কারা? কমিউনিস্টরা? এ চিন্তা ওকে পাগল করে তোলে। ও বিপ্লব বলতে বোঝে রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজবিপ্লব নয়। এখন ওর সব আশা-ভরসা নির্মূল। ওর মা আমাকে ওর ভার নিতে বলেন। মা না বললেও আমি ওর অবস্থা বিবেচনা করে আপনা থেকে নিতুম। এদেশে বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকা যায় না। ওদেশে অবশ্য সেরকম নজীর আছে। সেটা তোমাদের সাহিত্যিক আর শিল্পীদের মধ্যে। আমি ভালো করেই বুঝতে পারি যে জুলিকে বিয়ে না করলে ওর অবস্থা আরো খারাপ হবে। সোনাদিকে লিখি, তিনি বাপুর সঙ্গে কথা বলে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করেন। কিন্তু—"

মানস সৌম্যর মুখে দুষ্টু হাসি দেখে বলে, "কিন্তু কী?"

"কিন্তু একটি শর্ত আছে।" সৌম্য সবটা এক-নিঃশ্বাসে বলে না।

"শর্ত! কী শর্ত!" মানস কৌতূহল দমন করতে পারে না।

"তোমার মাথায় ঢুকবে না। সাধারণ মানুষের

মাথায় ঢুকবে না। আমিও কি ভাবতে পেরেছি?" সৌম্যর চোখে মুখে হাসি।

"আরে বলোই না। অত ধানাইপানাই কেন?" মানস অধৈর্য হয়।

"বিবাহের শর্ত ব্রহ্মচর্য।" সৌম্য গম্ভীরভাবে বলে।

মানস আর সইতে পারে না। "গান্ধীজী একটা কিল্-জয়।"

সৌম্য গান্ধীজীর পক্ষ নেয়। "আমরা গান্ধী-পরিচালিত সত্যাগ্রহীরাও একটা ফৌজ। ফৌজে থাকতে হলে কতকগুলো কানুন মানতে হয়। এটাও সেইসব কানুনের একটা। যদি গঠনের কাজ নিয়ে থাকি, সত্যাগ্রহে যোগ না দিই, তা হলে বিবাহের পর ব্রহ্মচর্যের বাধ্যবাধকতা নেই। গঠনের কাজও দেশের কাজ। গঠন থেকেই সংগঠন গড়ে উঠবে। সংগঠন ছাড়া গণ-সত্যাগ্রহ সম্ভব নয়। এবার সেটা আমরা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি। অসংগঠিত জনতা যা করেছে তা গণ-সত্যাগ্রহ নয়। তার ব্যর্থতা গণ-সত্যাগ্রহের ব্যর্থতা নয়। গান্ধীজীর ব্যর্থতা তো নয়ই। আমি আপাতত গঠনকর্মেই আত্মনিয়োগ করছি। তাই বিবাহের পর ব্রহ্মচর্য পালন করছি নে। কিন্তু সত্যাগ্রহের সময় যখন আসবে তখন—"

"আবার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করবে।" মানস উপহাস করে।

"তুমি কি মনে করেছ আমি পারব না?" সৌম্য কঠোরভাবে বলে।

"এটা কি তুমি বুঝতে পারছ না যে তুমি ব্রহ্মচারী হলে তোমার স্ত্রীও ব্রহ্মচারিণী হতে বাধ্য হয়? কেন ওকে তুমি বাধ্য করবে? কী অধিকার আছে তোমার? তুমি ওর অনুমতি চাইতে পার, কিন্তু ও যদি অনুমতি না দেয়! অবশ্য সেও যদি সত্যাগ্রহে যোগ দিতে চায় সে কথা আলাদা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জোরজবরদস্তির সম্পর্ক নয়। একজন আরেকজনের উপর ব্রহ্মচর্য বা সত্যাগ্রহ চাপিয়ে দিতে পারে না। ভুলে যেয়ো না যে নারীরও ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। তাকে ক্ষুধিত তৃষিত রাখলে সে কষ্ট পায়। তোমার অন্তরে প্যাশন নেই, তা আমি জানি। কিন্তু কম্প্যাশন তো আছে। কী করে তুমি একটি নারীকে ক্ষুধিত তৃষিত রাখবে? কষ্ট দেবে?" মানস জিজ্ঞাসা করে।

সৌম্য খপ করে কথা কেড়ে নিয়ে বলে, "কী করে তুমি জানলে আমার অন্তরে প্যাশন নেই, শুধু কম্প্যাশন আছে? আমার প্যাশন আমি সাবলিমেট করেছি। দেশের মুক্তির জন্যেই সে প্যাশন। নারীর মধুর রসের জন্যে নয়। গান্ধী, জবাহরলাল, সুভাষ—এঁদের অন্তরেও প্যাশন আছে। সে প্যাশন দেশের মুক্তির জন্যে। নারীর সঙ্গে মিলনমাধুরী তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে নি। আমার আশঙ্কা আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।"

মানস তাকে আশ্বাস দেয় যে সবাই ব্রহ্মচারী না হলেও দেশ স্বাধীন হবে। আমেরিকা হয়েছে, ইটালি হয়েছে, আয়ারল্যান্ড হয়েছে। কোথাও ব্রহ্মচর্যের এমন মাহাত্ম্য নেই। সংগ্রামের নেতারা কেউ মহাত্মা নন। শুধু ভারতের বেলাই প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে সংগ্রামের নেতাদের মহাত্মা হতে হবে। আর মহাত্মা হতে হলে ব্রহ্মচারী হতে হবে। এ দেশের জনগণ ব্রাহ্মণ বলতেই অজ্ঞান, সন্ন্যাসী বলতেই মন্ত্রমুগ্ধ। নেতারাও হয় ব্রাহ্মণ, নয় সন্ন্যাসী। সেইজন্যেই তাঁদের এত প্রেস্টিজ। তবে মুসলমান বা শিখদের মধ্যে এ কুসংস্কার নেই। তাদের মধ্যে যে কেউ বীরপুরুষ হয় নি তা নয়। বীরপুরুষরা বরং বহুভোগী। দেশকে মুক্ত করা বীরপুরুষ এবং বীরাঙ্গনাদের কাজ। তাঁদের নিয়েই মহাকাব্য বা নাটক রচিত হয়।"

"সে কথা ঠিক।" সৌম্য স্বীকার করে। "জুলিকেও আমি ব্রহ্মচারিণী হতে বলি নে। কিন্তু আমি যদি ব্রহ্মচারী হই, ও যদি ব্রহ্মচারিণী হতে না চায়, তবে সে এক মহা অশান্তির ব্যাপার হবে। বাপু কলকাতা আসবেন শুনেছি। তাঁকে একলা পেলে জিজ্ঞাসা করব এহেন সমস্যার সমাধান কী।"

"নারীকেই আত্মবলি দিতে হবে, এ ছাড়া আর কী? কস্তুরবাকে তিনি আত্মবলি দিতে প্রণোদিত করেছেন। জুলিকেও কস্তুরবা হতে বলবেন। কিন্তু ও কেন শুনবে? তুমি কি বিয়ের আগে ওকে গান্ধীজীর শর্তের কথা জানিয়েছ।" মানস সৌম্যকে বেকায়দায় ফেলে।

"না, ভাই। জানালে ও হয়তো মারতে আসত। ওর প্রথম বিবাহে ফুলশয্যা হয় নি। ও ব্রহ্মচারিণী থেকে গেছে। দ্বিতীয় বিবাহেও তাই হলে সে কি ক্ষমা করবে? দেশের নেতারা ওকে নিরাশ করেছেন। আমি ওর স্বামী হয়ে যদি ওকে নিরাশ করি ও কি মারমুখী হবে না?" সৌম্য কৈফিয়ত দেয়।

এর পর মানস চিন্তা করে বলে, "গান্ধীজীর উচ্চাভিলাষ তিনি সেক্সলেস হতে চান। তার মানে একজন বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর কি মঞ্জুশ্রী। তাঁর পাল্লায় পড়ে তুমিও হবে আরেকজন বোধিসত্ত্ব। ক্ষিতিগর্ভ কি সামন্তভদ্র। তোমার পাল্লায় পড়ে বেচারি জুলি যে কী হবে তাই ভাবছি।" মানস রহস্য করে।

সৌম্য হেসে ওঠে। "আমার পাল্লায় পড়ে ও মা হতে চায়। একটি ছেলের ও একটি মেয়ের। এর পর তো ওর কোনো চাহিদা থাকার কথা নয়। সেক্স ব্যাপারটা তো সন্তানার্থে। মানুষ তার উপর আরো কিছু আরোপ করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির উদ্দেশ্য তো প্রজনন। সমাজেরও অভিপ্রায় পৌর্বাপর্যরক্ষা। যাকে বলে পিতৃ-ঋণশোধ। ঋণমুক্ত হবার পর আমাদের উভয়েরই কর্তব্য মিলনকামনাকে কায়িক স্তর থেকে আত্মিক স্তরে উন্নীত করা। যৌবন তো ফুরিয়ে আসছে। আর কয়েক বছর পরে আমার হবে বানপ্রস্থের বয়স। আর জুলির চেনজ অভ্ লাইফ। এমনিতেই দাঁড়ি টানতে হবে।"

"বিরতি হয়তো একদিন আপনি আসবে। কিন্তু জোরকরা বিরতির পরিণাম ভয়াবহ। যে প্রকৃতির দোহাই তুমি দিয়েছ সেই প্রকৃতিই কামনাপূরণের প্রবর্তনা দেয়, সন্তান থাকা সত্ত্বেও। স্ত্রী নারাজ হলে স্বামী অন্যত্র যায়, স্বামী নারাজ হলে স্ত্রী অশান্ত হয়। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে দুজনের পায়ে পা মিলিয়ে চলা। শয্যা-সংক্রান্ত ব্যাপারে একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া মহা অনর্থকর। একবার বিয়ে করলে তারপর থেকে তুমি আর ফ্রী নও। তোমার ফ্রীডম আসবে জুলি যেদিন স্বেচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাকে বলবে, আর চাই নে। কামনার কোনো বয়ঃসীমা নেই। সন্তানধারণের বয়স পার হয়ে গেলেও নারী পুরুষকে আকর্ষিত করতে পারে, তার দ্বারা আকৃষ্টও হতে পারে। তখন তার অন্তঃসত্ত্বা হবার ভয়ডর থাকে না। সুতরাং নিশ্চিত হয়ে আরো অনেকদিন ভোগসুখ চাইতে পারে। যদি না রোগে শোকে জর্জর হয়।" মানস যতদূর জানে।

সৌম্য কী যেন ভাবছিল। বলে, "বেদ-উপনিষদে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে ন স্ত্রী, ন পুমান্। ব্রহ্ম-শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। তোমরা ব্রাহ্মরা তাঁকে বানিয়েছ পুংলিঙ্গ। যিনি পুরুষও নন, নারীও নন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে হলে ন স্ত্রী ন পুমান্ হতে হবে। এটাই তো লজিক। এদিক থেকে বাপুই লজিকাল। তিনি আগে বলতেন ভগবানই সত্য। আজকাল বলেন সত্যই ভগবান। সত্য-শব্দটি ব্রহ্ম-শব্দটির মতো ক্লীবলিঙ্গ। ক্লীবলিঙ্গের সঙ্গে একাত্ম হতে হলে ক্লীবলিঙ্গই হতে হয়। সেটাই এখন তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা। সত্য আর অহিংসা আর ব্রহ্মচর্য—তিনটিই তাঁর কাছে এক, একটিই তিন। আমার কাছে এখনো হয় নি, কবে হবে তা নির্ভর করছে দীর্ঘ-জীবনের উপরে। পরের বারের সংগ্রামে যদি যোগ দিই তবে জেলে যেতে হবে না, সেটা সকলে পারে। বুলেটের সামনে বুক পেতে দিতে হবে কিংবা পেছন থেকে ছোরা খেতে হবে। সত্যাগ্রহ মানে জেলযাত্রা নয়। আন্ডার-গ্রাউন্ডে যাওয়া নয়। বাপু আমাকে গঠনের কাজে নিযুক্ত রেখে বাঁচিয়ে দিতে চান, কিন্তু আমার ভিতরে একজন সৈনিক আছে, সে তোমার মতো নীরব সাক্ষী হতে নারাজ। সে ঝাঁপিয়ে পড়বে, সম্ভবত মার খেয়ে মরবে।"

"গড ফরবিড।" মানস বলে ওঠে। "তুমি এখন বিবাহিত গৃহস্থ, তুমি আর স্বাধীন নও। জুলির অনুমতি না নিয়ে তুমি প্রাণ দিতে পারবে না। ওকে বিধবা করার কী অধিকার আছে তোমার? ও ক'বার বিধবা হবে? যদি ছেলেমেয়ের মা হয় তবে বিধবা হয়ে আরো কষ্ট পাবে। এইসব ভেবেই বাপু তোমাকে গঠনের কাজে একনিষ্ঠ হতে বলেছেন। তোমাকে তাঁর নির্দেশ মানতে হবে।"

এর পর ওঠে মিলির প্রসঙ্গ। একান্ত কুণ্ঠা আর সঙ্কোচ নিয়ে সৌম্য মানসকে বিশ্বাস করে বলে, "এক-চক্ষু হরিণের মতো আমি একটা দিকই দেখেছি, আরেকটা দিক দেখি নি। জুলির দিকটা দেখেছি, মিলির দিকটা দেখি নি। এখন বুঝতে পারছি একই বাড়িতে দুই নারী থাকতে পারে না। এমন কী, একই শহরেও না। মিলির বিলেত ফিরে যাবার অপেক্ষায় আছি, কিন্তু মিলি নাকি স্থির করেছে যে ওর ছেলেকে স্বদেশেই মানুষ করবে, বিদেশে নয়। ওদিকে সুকুমার লন্ডনের শহরতলি ব্রেনেটে সস্তায় পেয়ে বাড়ি কিনেছে, সেইখানেই সেটল করবে। ছেলেকে বিলেতের ভালো প্রাইভেট স্কুলে পড়াবে। তার পর অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজে। ছেলে যখন দেশে ফিরবে তখন সে একজন কেষ্টবিষ্টু হয়ে ফিরবে। যেমন শ্রীঅরবিন্দ। সুকুমারের মটো হচ্ছে বেস্ট এডুকেশন, নট স্বদেশী এডুকেশন। মিলির মটো ঠিক

বিপরীত। ছেলে দেশের পড়া সাঙ্গ করে বিদেশে যাবে। যেমন নেতাজী সুভাষচন্দ্র। মিলি তার ছেলের মঙ্গলের জন্যে দেশে থেকে যেতে চায়, স্বামীর মঙ্গলের জন্যে বিলেতে বসবাস করতে নারাজ। এই নিয়ে ওদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছে। সুকুমার দেশে ফিরে কী করবে? ভেরেন্ডা ভাজবে? তবে ও তুখোড় লোক। কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে আর কৃষ্ণ মেনন তো জবাহরলালের ভক্ত। লেবার পার্টিতে ওঁর যথেষ্ট প্রভাব। এখন তো লেবার পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের সম্ভাবনা নিকটবর্তী। জবাহরলাল ইচ্ছে করলে মেননকে আর মেনন ইচ্ছে করলে সুকুমারকে দেশে ফিরিয়ে এনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। মিলি কিন্তু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। চার্চিল এখন গভর্নমেন্টে নেই, কিন্তু অপোজিশনে তো আছেন। ভারতসংক্রান্ত প্রশ্নে ব্রিটিশ জনমত চার্চিলের মুখের দিকে তাকিয়ে, অ্যাটলির মুখের দিকে নয়। চার্চিলের পার্টির সঙ্গে জিন্নার পার্টির সম্পর্ক তেমনি নিবিড় যেমন লেবার পার্টির সঙ্গে নেহরুর পার্টির। কংগ্রেস যদি লীগের সঙ্গে মিটমাট না করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাট করবে না। কংগ্রেস কী করে পার্টিশনের ভিত্তিতে দেশকে স্বাধীন করবে? পাকিস্তান তো ব্রিটেনের তাঁবেদার হবে। বোমা-বিভল-ভারের দিন আবার আসছে। স্টেনগান, গ্রেনেড ইত্যাদির জোগাড় করতে হবে। মিলিকেও আবার আসরে নামতে হবে। সুকুমারের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্নেও তার বিরোধ। ইংরেজরা আর-সব বিষয়ে ভালো, কিন্তু হাড়ে-হাড়ে সাম্রাজ্যবাদী। সাম্রাজ্য ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। ছাড়লেও মুসলিম লীগের বগলমে ভারতের মাটিতে পা রাখবে। তার নাম কি স্বাধীনতা? কখনো নয়। প্রকৃত স্বাধীনতা হচ্ছে আমেরিকার স্বাধীনতা। তার জন্যে সিপাইদের নিয়ে লড়তে হবে। দশ বছর দেরি হবে। হোক না দশ বছর দেরি? নেতারা ততদিন বাঁচবেন না। নাই বা বাঁচলেন? নতুন নেতার উদয় হবে।"

মানস অবাক হয়ে শোনে। জিন্না-চার্চিল অ্যাকসিস আর নেহরু-লেবার অ্যাকসিস—দুটোই সত্য। কী করে এদের মধ্যে মিটমাট হবে ভগবান জানেন। গান্ধীজী অবশ্য চুপ করে থাকবেন না, হয় জেলে ফিরে যাবেন, নয় মরণপণ অনশন করে স্বর্গে চলে যাবেন। সৌম্য যদি গান্ধীর নিয়তির সঙ্গে নিজের নিয়তি সংযুক্ত করে তবে তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। জুলি কি তার সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে পারবে! আর ওই যে মিলি—ওই বা কেন আসমান থেকে নেমে এসেছে ঠিক এই মুহূর্তে? সৌম্যকে কেন মুশকিলে ফেলেছে? দুই নারীর মাঝ-খানে পড়ে বেচারা কি ও শহরে তিষ্ঠতে পারবে! ওর হাতে গড়া আশ্রম ওকে ছাড়তে হবে।

যূথিকা-জুলি দীপক আর মণিকাকে নিয়ে ফিরে আসে। জুলি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, "আহা, এমন না হলে আশ্রম! কী নেই এখানে! নাচ, গান, বাজনা, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য। নাচের ক্লাস চলছিল, অনর্মতি নিয়ে আমিও একটু নাচলুম। ওঁরা বলেছেন আমি যদি এখানে থাকি আমাকেও নাচের ক্লাসে ভর্তি করে নেবেন। কে একজন দক্ষিণী মন্তব্য করেন, 'ইউ আর আ বর্ন ডান্সার।' এই আশ্রম আর ওই আশ্রম! কার সঙ্গে কার তুলনা! এই, তুমি কেন ওখান থেকে এখানে চলে আস না? আলাদা একটা বাড়ি করে তোমার কাজ তুমি করবে, আমার কাজ আমি করব। নাচ, গান, ছবি আঁকা—এইসব আমার কাজ। আফসোস হচ্ছে আগে কেন এখানে আসি নি, নাচ গান ছবি-আঁকা শিখি নি। বিবাহিত ছাত্রীও দেখলুম। কারো কারো বয়স আমারই মতো। এই, তুমি কেন আমাকে এখানে ভর্তি করে দাও না? উত্তরায়ণে গিয়ে রথীদা আর বউঠানের সঙ্গে আলাপ করে এসেছি। ওঁরা আমাকে পেলে খুব খুশি হবেন। থিয়েটারে একটা পার্ট দেবেন। আহা, থিয়েটার! কী চমৎকার! বললেন আমাকে যা মানাবে। কার পার্টে, জান? 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর পার্টে। হ্যাঁ, আশ্রমে যদি থাকতে হয় তো এই হচ্ছে সেই আশ্রম। মহর্ষি ও মহাকবির স্বপ্ন।"

"জুলি যা বলছে তা ভেবে দেখবার মতো। এটাও আশ্রম। এখানে এলে বা এর কাছাকাছি নতুন একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না, ওর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হবে। তুমি বাপকে চিঠি লিখে ওঁর অনুমতি নাও। জুলিকে যদি রাজনীতি ভুলিয়ে দিতে চাও এই সেই পরিবেশ।" মানসের পরামর্শ।

সৌম্য গম্ভীরভাবে বলে, "জুলিকে নয়, মিলিকে। ওর ছেলের পড়াশুনার পক্ষে এই পরিবেশই আদর্শ। জুলির যদি ছেলেমেয়ে হয় ওরাও একটু বড়ো হলে এখানে আসবে। তখন জুলিও আসবে তাদের নিয়ে থাকতে। কিন্তু আমার কি সে স্বাধীনতা আছে? ওখানে আমি হাজার জন কাট্‌নিকে দিয়ে সুতো কাটাই, তাদের পেছনে আমার বছরে খরচ হয় সাড়ে তিন লাখ টাকা। তারপর স্থানীয় তাঁতিদের দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নিই। তাতেও খরচ হয় লাখ দেড়েক টাকা। ছুতোর, কামার, রঙরেজদের পেছনেও অনেক টাকা খরচ হয়। তা ছাড়া আশ্রমের কর্মীরা আছেন। ভাণ্ডার চালাতেও খরচ হয়। এখানে যদি আসি আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। আবার সেই চলি-চলি-পা-পা। কতকাল লাগবে তত বড়ো আকার-দিতে! সেই সময়টা ওখানে দিলে ওখানকার আশ্রম দ্বিগুণ বড়ো হতে পারে। আমাকে ওখানে পাঠানো হয়েছে পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করতে। গঠনকর্মের মাধ্যমে। আমি যে খরচটা করি তার সিংহের ভাগ পায় মুসলমানরা, তারাই স্থানীয় সংখ্যাগুরু। ব্যয়ের চেয়ে আয় অনেক কম। ফি বছর লোকসান দিতে হয়। খাদি এখনো আত্মনির্ভর হয় নি। সঙ্ঘ থেকে ভরতুকি দেয়। এই উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানের যে ঐক্য গড়ে তুলছি সেটা মুসলিম লীগ তথা হিন্দুমহাসভা উভয়েরই চক্ষুঃশূল। পালিয়ে এলে চলবে না, লেগে থাকতে হবে। আমাদের বিরুদ্ধে কী রকম প্রোপ্যাগান্ডা হচ্ছে, জান? বাবুরা দেশের জন্যে জেল খাটছেন, তাঁরা দেশকে ভালোবাসেন। কিন্তু দেশকে ভালোবাসলে কী হবে, দেশের মানুষকে যে ভালোবাসেন না। মুসলমানকে তাঁরা ক্ষমতার অংশ দেবেন না। ইংরেজকে তাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মুসল-মানকেও তাড়াবেন। ইংরেজও বিদেশী, মুসলমানও বিদেশী। ইংরেজও বিধর্মী, মুসলমানও বিধর্মী। ইংরেজও বিজেতা, মুসলমানও বিজেতা। এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন। পাকিস্তানই একমাত্র রক্ষাকবচ।"

মানস গভীরভাবে বিচলিত হয়। বলে, "তোমাকে কাসাবিয়াঙ্কার মতো ওই জাহাজের ডেকেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, সৌম্যদা। চারদিকে আগুন ধরে গেলেও। পলায়ন বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু সত্যাগ্রহীর কাজ নয়।"

জুলি খেপে গিয়ে বলে, "তা হলে তুমিই বা কেন ওখানে বদলি হয়ে যাও না? তুমিও তো হিন্দু-মুসল-মানের ঐক্য চাও।"

মানস এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। বলে, "আমি তো চাকরি থেকে অকালে অবসর নিতে চাইছি।"

"তার মানে তুমি এসকেপিস্ট। ছি ছি, মানসদা!" জুলি টিটকারি দেয়।

এবার যূথিকা তার স্বামীর পক্ষ নেয়। "ওর এই সিদ্ধান্তটা পাঁচ বছর আগেই নেওয়া হয়ে গেছে। শুধু যুদ্ধশেষের অপেক্ষা। আর আনুপাতিক পেনসনের।"

"সে কী, মানসদা, তুমি আমাদের বিপদের মুখে ফেলে নিজে নিরাপদ হতে চাও? যদিও তোমরা আমা-দের শত্রুপক্ষের লোক তবুও তোমরা থাকলে আমরা নিরাপদ বোধ করি।" জুলি অন্তর থেকে বলে।

"এতকাল তো দেশপ্রেমিকদের কাছ থেকে ইটপাটকেল খেয়ে এসেছি, আজ হঠাৎ ফুলের তোড়া কেন? কবে থেকে আমাদের কদর বেড়ে গেল?" মানস সুধায়।

"হিন্দু অফিসার একটি কমলে হিন্দুর রক্ষকও একটি কমে। দেখছ না পরিস্থিতি কেমন ঘোরালো হয়ে আসছে? ইংরেজকে তাড়াতে তাড়াতে গিয়ে শুনছি মুসল-মানকেও তাড়াতে যাচ্ছি। যা স্বপ্নেও ভাবি নি। মুসল-মান হচ্ছে ফ্লেশ অভ মাই ফ্লেশ, ব্লাড অভ মাই ব্লাড। কিন্তু এখন ওদের শেখানো হয়েছে যে ওরা আলাদা একটা নেশন, ওদের জন্যে আলাদা একটা দেশ চাই, যে তাতে নারাজ হবে সেই তার শত্রু। আমরা কি নারাজ না হয়ে পারি? গোটা বাঙলাদেশটাই ওদের পাওনা? না দিলে ইংরেজকে ছেড়ে আমাদেরকেই ওরা তাড়াবে? আর নয়তো সুলতানি আমল ও নবাবি আমলের মতো পদা-নত করে রাখবে। আমরা কি ইংরেজকে বিদায় দিতে যাচ্ছি মুসলমানের প্রজা হতে?" জুলির মোক্ষম প্রশ্ন।

"কিন্তু তোমার এটা ভুল যে আমি একজন হিন্দু অফিসার। না, আমাকে ধর্ম দেখে চাকরিতে নেওয়া হয় নি। যোগ্যতা দেখে নেওয়া হয়েছে। ধর্ম দেখে যাদের নেওয়া হয়েছে তারা মুসলমান। তাদের তুমি মুসলিম অফিসার বলতে পার। কিন্তু আমরা ইন্ডিয়ান অফি-সার। আমরা ইন্ডিয়ানদের সবাইকার রক্ষক। হিন্দু-মুসলমান ভেদবিচার করব না। অপরাধ করলে নির্বি-শেষে দণ্ড দেব। মুসলিম লীগ আমাদের খুব বেকায়দায় ফেলেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বৃহত্তর মুসলিম সমাজ এখনো আমাদের বিশ্বাস করে। আমি কি তাদের জন্যে কম ভেবেছি, কম করেছি? সৌম্যদাও ওদের জন্যে কম ভাবে নি, কম করে নি। তুমিও কম ভাববে না, কম করবে না। বৃহত্তর মুসলিম সমাজের সঙ্গে

সম্পর্ক যেমন প্রীতিপূর্ণ ছিল তেমনি প্রীতিপূর্ণ থাকবে। বৃহত্তর মুসলিম সমাজই পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুর রক্ষক।" মানস উত্তর দেয়।

"পশ্চিমবঙ্গে বসে তুমি তো ও কথা বলবেই। যেতে যদি পূর্ববঙ্গে আর দেখতে যদি কী অবস্থা, তোমার মত বদলে যেত। তা তো নয়, তুমি চাকরি ছেড়ে পালাবার তালে আছ।" জুলি টিটকারি দেয়।

এবার সৌম্য মুখ খোলে। "সপ্তপদী আমি চাই নি, জুলিই চেয়েছিল। বেচারিকে এখন আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে পূর্ববঙ্গে ফিরে যেতে হবে। বিপদের ভয়ে আমি কি পেছপাও হতে পারি? আমি যে গান্ধীজীর সৈনিক। বিপদের সঙ্গে আস্থার জোরে লড়ব। জুলি থাকবে আমার পাশে। জুলিই আমার শক্তি।"

"আচ্ছা, সৌম্যদা," যূথিকা সুধোয়, সপ্তপদী হয়েছে বলে কি স্ত্রীকেই স্বামীর সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে, স্বামীকে স্ত্রীর সঙ্গে নয়? কস্তুরবাকেই গান্ধীজীর অনুসরণ করতে হবে, গান্ধীজীকে কস্তুরবার নয়? আমাদের বিয়েতে সপ্তপদী হয় নি। তার জন্যে আমার মনে খেদ ছিল। কিন্তু এখন দেখছি সপ্তপদী না হয়ে ভালোই হয়েছে। আমি জুলির চেয়ে স্বাধীন। ও বেচারিকে তোমার মতো সৈনিকের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে।"

"ও না হলে আমাকে শক্তি জোগাবে কে?" সৌম্য পালটা সুধায়।

"কেন? এতদিন কে জুগিয়েছিল?" যূথিকা জেরা করে।

সৌম্য এর উত্তরে বলে, "ভারতমাতা। বন্দেমাতরম্।"

"তা হলে ভারতমাতাই আবার জোগাবেন। জুলিকে তুমি শান্তিনিকেতনে থাকতে দাও। পরে ওর সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবে।" যূথিকা বাজিয়ে দেখে।

"তবে তাই হোক। আপাতত আমার আশ্রম আমাকে টানছে। আমাকে যেতেই হবে। জুলি, তুমি কালকেই নাচের ক্লাসে ভর্তি হয়ে পড়ো।" সৌম্য গম্ভীরভাবে বলে।

জুলির মুখ শুকিয়ে যায়। "রাগ করলে নাকি? আমি কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি? তুমি যেখানে যাবে আমি সেখানে যাব।"

মানস হেসে বলে, "রাশিয়াতে একটা প্রবাদ আছে, ছুঁচ যেদিকে যায় সুতো সেইদিকে যায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যেন ছুঁচ-সুতোর সম্পর্ক। ছুঁচ না হলে সুতো অকেজো। সুতো না হলে ছুঁচ অকেজো। তবে ছুঁচই আগে-আগে যায়। সুতো অনুসরণ করে।"

তা শুনে যূথিকা ফোড়ন কাটে। "শোনো, শোনো। এই ছুঁচটির পিছুপিছু এই সুতোটিকেও বাঙলাদেশের কাঁথাখানা এফোঁড় ওফোঁড় করতে হয়েছে। কোথাও কি দুটো বছর থাকতে দিয়েছে? একবার বাদে। জুলি, তোমার ভাগ্যে বদলি নেই। তুমি ভাগ্যবতী।"

"সে তো আরো ভাবনার কথা। সারা জীবন ওখানেই কাটাতে হবে নাকি? যাবজ্জীবন স্বদীপান্তর?" জুলি আঁতকে ওঠে।

"কেন? ইংরেজ মিশনারিরা কি সারা জীবন ভারতে কাটান না? গান্ধীবাদী গঠনকর্মীরাও আরেক রকম মিশনারি। কোথাও একটা স্কুল, কোথাও একটা হাসপাতাল, কোথাও একটা কুষ্ঠসেবাশ্রম নিয়ে ইংরেজ মিশনারিরা বসে যান। তোমরাও তেমনি বসে যাবে। তা হলেই তো লোকের উপর তোমাদের নৈতিক প্রভাব পড়বে। খাদির কাজ একটা বিজনেস নয়। লোকে যদি সেটাকে টাকাপয়সার নিরিখে বিচার করে তবে মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শোষণহীন সমাজ সংস্থাপন। নইলে আর্থিক লোকসান দিতে-দিতে তোমরা একদিন দেউলে হবে। তখন আশ্রম গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র যাবে।" মানস যেমন অনুমান করে।

"নেহাত ভুল বলে নি মানস।" সৌম্য স্বীকার করে। "আমরা এখনো লোকের মনের মধ্যে গভীরভাবে শিকড় গাড়তে পারি নি। গভর্নমেন্ট সব তছনছ করে দিয়েছে। লোকে 'হাঁ, হাঁ' করে ছুটে আসে নি। পুলিশের সামনে শুয়ে পড়ে নি। যেসব কর্মী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছিল তাদের বাদ দিয়েও আরো কয়েকজন কর্মী ছিল গঠনকর্মে রত। তারা নিঃশব্দে সরে পড়ে। রুখে দাঁড়ায় না।"

"মানসদা," জুলি নিবেদন করে, "আমি কিন্তু গান্ধীবাদীও নই, মিশনারিও নই। মতবাদের দিক থেকে সৌম্য যেমন স্বাধীন, আমিও তেমনি স্বাধীন। তবে কার্যকলাপের বেলা আমাকে সতর্ক হতে হবে, যেন গঠনকর্ম বা সত্যাগ্রহ বাধা না পায়। আপাতত আমি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। এ রাজনীতি আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। আমি চাই বৈপ্লবিক রাজনীতি; অথচ

কমিউনিস্ট পার্টির ডিকটেটরশিপ নয়। রাশিয়ায় ওরা ধনিকদের মালিকানা রাষ্ট্রসাৎ করেছে, কিন্তু শ্রমিকদের মালিকানা বা মালিকানার অংশ দেয় নি। তারা শ্রম দেয়, পারিশ্রমিক পায়, যেমন বাড়ির চাকর। চাকরে মালিকে অনেক তফাত। রাষ্ট্রের চাকর বলে পরিচয় দেওয়াটা কি খুব গৌরবের? সরকারি চাকুরে হিসাবে তুমি, মানসদা, কি খুব একটা গৌরব বোধ কর? কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেও কি তোমার গৌরব বৃদ্ধি পাবে? শ্রমিকরা যেদিন জানবে যে তাদের কারখানার তারাই মালিক, প্রত্যেকেই মালিকানার অংশিদার, সেইদিনই সত্যিকার সমাজতন্ত্র। তার জন্যে যদি আমার ডাক পড়ে আমি আবার রাজনীতিতে যোগ দেব। কিন্তু স্বামীর সম্মতি নিয়ে।"

যূথিকা রুপ্ত করে। "সন্তানের সম্মতি নেবে না? না, তুমি সন্তান এড়াতে চাও? না, তুমি ওদেরকে ওদের বাপের ঘাড়ে চাপাতে চাও?"

"কী যে বল, যূথীদি! আমি কি কখনো মা না হয়ে পারি? আশা করি ওরা ততদিনে বড়ো হয়ে থাকবে। কোথায় বিপ্লব! তার কোনো লক্ষণই আমার চোখে পড়ছে না। বিশ্বপরিস্থিতি তার অনুকূল ছিল তিন বছর আগে। যুদ্ধের মাঝখানে। আবার কবে যুদ্ধ বাধবে, তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। এলোপাথাড়ি নরহত্যায় কোনো ফল হবে না। ভায়োলেন্স ফর ভায়োলেন্স সেক আমার মতো নয়। সমষ্টি যেখানে ঘুমিয়ে রয়েছে গোষ্ঠী সেখানে সফল হতে পারে না। তা দিয়ে হয়তো কতক লোককে কতক সময়ের জন্যে জাগানো যায়। কিন্তু তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। সৌম্য আমাকে অহিংসার দীক্ষা দেয় নি। তবে আমি নিজেই উপলব্ধি করছি যে এদেশে সংঘবদ্ধ হিংসা সম্ভব নয়, যদি না আর্মিকে তার মধ্যে ধরি। আর্মি যে ক্ষমতা হাতে পেয়ে হাতছাড়া করবে এটা বিশ্বাস করা শক্ত।"

মানস বলে, "সৌম্যদা, জুলি তোমার মতো পজিটিভ গান্ধীবাদী না হলেও নেগেটিভ গান্ধীবাদী। হাসকর শোনায়, কিন্তু আমরা অনেকেই তাই। যারা দুবেলা 'অহিংসা' 'অহিংসা' করে তারাই যে গান্ধীবাদী তা নয়। যারা দুবেলা হিংসাকে এড়িয়ে চলে তারাও গান্ধীবাদী। আর, বোন জুলি, তোমাকেও একটা কথা লবি। চরকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের মালিক আর শ্রমিক একই লোক। কেউ শোষকও নয়, কেউ শোষিতও নয়। যে ক্যাপিটাল জোগায়, সে শ্রমও জোগায়। এই হল থিয়োরি। প্র্যাকটিসে কিছু অদলবদল ঘটতে পারে। যেদেশে কোটি কোটি মানুষ বেকার বা অর্ধবেকার সেদেশে চরকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বিপুল হতে পারে। তবে ভারি শিল্পের বেলা এ ব্যবস্থা খাটবে না। চাই প্রচুর মূলধন, সুদক্ষ শ্রমিক, অভিজ্ঞ ইনজিনীয়ার, কারিতকর্মা ম্যানেজার, দূরদর্শী ডাইরেকটর। রেল, জাহাজ, প্লেন—সমস্তই আমাদের দেশে বানাতে হবে। প্রকৃতিদত্ত খনিজের সদ্ব্যবহার করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের হাতেই থাকুক, কিন্তু মালিকানা যতদূর সম্ভব ছাড়িয়ে দেওয়া যাক। শ্রমিকরাও শেয়ারহোল্ডার হোক। যেই শ্রমিক সেই আংশিকভাবে মালিক। গান্ধীজীকে বুঝিয়ে রাজি করাতে হবে।"

[ক্রমশ

ফরেস্ট অফিসারের ডায়েরি

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

অরণ্য কি বুঝেছিল মানুষের ভাষা?
মানুষের
আবর্জিত কাঁধদুটি যেন
অরণ্যের শববহনের
ছন্দে হেঁটে যায়।
উদীচী অলিন্দ থেকে দক্ষিণ দুয়ার
পর্ণমোচী গুল্মলতা বা চিরহরিৎ
বনভূমি জেনেছিল
মানুষের গুপ্তঘাতকতা?

দাবানল—ছিল ঝড় ছিল বজ্র এবং বিদ্যুৎ
ভূমিকম্প মারী
ছিল তবু বিশ্বাসহন্তার চেয়ে ভালো?

ভূপাতিত আর্য বৃক্ষপিতা, দেখো ভাঙে
অরণ্যপ্রাকার—প্রতিরোধহীন।
আবর্জিত কাঁধে কাঠ, চোখে লোভ—কারা হেঁটে যায়
মানুষও কি বুঝেছিল বৃক্ষদের ভাষা?

অবিমৃষ্যকারী মানুষেরা
কাষ্ঠলোভী বামন মানুষ, ওই দেখো
লোপোন্মুখ বনভূমি ওই
ফেলে দেয় কৃষ্ণরূপ চন্দ্রের কলাপ
হাওয়ায় গচ্ছিত রাখে বিষ, তারপর
একে একে আত্মহত্যা করে।

নিষ্পত্র পাথরে ফোটে আলো।

বলেছিলেন

রত্নেশ্বর হাজরা

আপনি কিন্তু বলেছিলেন—আমায় একটু সবুজ দেবেন
আপনিই না বলেছিলেন কয়েকটা নীল চাবুক দেবেন!
হলুদ রুমাল এবং একটা রঙিন টুপি—
আপনি কিন্তু বলেছিলেন চুপিচুপি
আমায় একটা দৃশ্য দেবেন
কম সময়ের জন্য হলেও অলৌকিক তা
এবং লোকায়তের কাছে
আপনিই তো বলেছিলেন—আমার মধ্যে
অনেক তারার জন্মভূমি মগ্ন আছে.....

পাশ ফিরে শোও বলেছিলেন তোমায় দেব
শীত বসন্ত এবং গ্রীষ্ম
পাশ ফিরে শোও তোমায় দেব
উদাস উরু এবং মধ্যরাতের বিশ্ব
সতর্কতাকে শোনার মতো শ্রবণশক্তি
তোমায় দেব একটা জীবন কিছুক্ষণের
ভুলভুলাইয়া
প্রবেশ এবং নিষ্ক্রমণের অনুরক্তি.....

তারপরেও দেওয়ার কথা গন্ধরাজের আদিম উত্থান
নাগরদোলার ভীষণ কাছে
হঠাৎ-নামা নক্ষত্রযান
অপাবৃত কালপুরুষের উদয়-অস্ত এবং সফেন
অন্ধকারের মধ্যে আমার দেহের শিল্পে সঠিক সংজ্ঞা।
তারপরেই বলেছিলেন সময় পেলে
ভুলতে চাই না এমন কিছু ভুল শেখাবেন—

তিনটি চড়ুই

মতি মুখোপাধ্যায়

চপল স্বভাব ভীষণ আমুদে দেখে মনে হয়
প্রকৃত সুজন ওরা তিনজন তিনটি চড়ুই
ডালে ও পাতায় এত আনাগোনা প্রয়োজনহীন
মনে হল যেই অমনি ব্যাকুল ঠোঁটে ও পালকে
কিছু কথা হয় আলাপচারিতা সে ওরাই জানে
ভাবনা-টাবনা কখন কী আসে উথাল পাথাল।

হঠাৎ বাতাস থামোকা আসতে একটা চড়ুই
দূর নিমগাছে চকিতে পালায় ভুল শোধরাতে
তিন কি কখনো এক পতাকার নীচে যেতে পারে
মিলেও মেলে না গ্রিমুখী হৃদয় চকিতে ত্রিবেণী
হয়েছিল তাই প্রণয়ী দুজন একটি প্রেমিকা
যে যাকে প্রকৃত ভালোবাসা দেয় সে-ই থাকে শেষে
বাকিজন যেন আগের দিনের খবরে-কাগজ
পঠিত হৃদয় আর কিবা তার প্রয়োজন থাকে?

অলৌকিক ড্রাম

গ্যাব্রিয়েল ওকারা

আমার বুকের মধ্যে বেজে উঠল অলৌকিক ড্রাম
নদীতে মাছেরা উঠল নেচে
বাজনার তালে তালে
নেচে উঠল নারী ও পুরুষ।

গাছের আড়াল থেকে মহীয়সী
মাথা নেড়ে মুচকি হাসে
কটিবন্ধে কোমল পল্লব।

আমার বুকের মধ্যে অলৌকিক ড্রাম
দ্রুতলয়ে ছেঁড়ে-খোঁড়ে উদাসী বাতাস
ছায়াপথে চুপিসাড়ে মৃত্যুও নাচে গায়।

গাছের আড়াল থেকে মহীয়সী
মাথা নেড়ে মুচকি হাসে
কটিবন্ধে কোমল পল্লব।

বুকে বাজে বেজে যায় ড্রাম
কেঁপে ওঠে বনস্থলী
নাচে গাছে
আকাশ সূর্য চাঁদ নদীর দেবতা
ঘর ছাড়ে
মাছ হয় মানুষ
মানুষ হয় মাছ
থেমে যায় সৃষ্টির স্পন্দন।

গাছের আড়াল থেকে মহীয়সী
মাথা নেড়ে মুচকি হাসে
কটিবন্ধে কোমল পল্লব।

সহসা নীরব হল ড্রাম
মানুষ হল মানুষ
মাছ হল মাছ
গাছ সূর্য চাঁদ ফেরে নিজস্ব ডেরায়
মৃত্যু ফেরে আঁধারে পাতালে।

কিন্তু হায় মহীয়সী
গাছের আড়ালে নিথর নীরব।
তার দুটি রাঙা পা জন্ম দেয় শিকড় শিকড়
তার মাথা জন্ম দেয় লক্ষ পাতা
তার নাক ধোঁয়া ছাড়ে
তার ঠোঁট আঁধারে বিলীন।

বুকবন্দী ড্রাম আমি তুলে নিই
ইচ্ছে আছে এত দ্রুত বাজাব না তাকে।

অনুবাদ : সমর চন্দ

মাধ্যম এখন ইলেকট্রনিক্‌স্

গুরুদাস ভট্টাচার্য

১. পটভূমিকা

একা-একা টিঁকে থাকা যায়, বাঁচা যায় না ; তার জন্যে জোট বাঁধতে হয়, জোটের গায়ে জট পাকাতে হয়। বাঁধন পাকা করার জন্যে চাই : বিনিময়—বস্তুর বিনিময়, হৃদয়ের বিনিময়, সেইসঙ্গে তথ্যের-জ্ঞানের-ভাবের, খবারের সঙ্গে খবরও। বিনিময়ের চাই মাধ্যম—কতিপয় হাবভাব শব্দচিৎকার ইশারাইঙ্গিত : আদি মানবের এর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। ওঁলমপিকে যেমন আদিতে ছিল, শুধুই দৌড়, দুশো চারশো হাজার মিটারের ; বর্শা, চাকতি, রথ, এসব বাজি পরে-পরে। অর্থাৎ জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হতে থাকে নতুন-নতুন মাধ্যম তথা হাতিয়ার ; খবর-দারির ক্ষেত্রে : আগুন-পাখি-বাঁদর-ঢাকের বাদ্যি, সংকেত-চিহ্ন-ছবি-ধাঁধা ইত্যাদি, এবং রানার তথা দৌড়ন্ত মানুষও। রূপকথার রাজপুত্রকন্যারা পাঠাত পাখি ফুল-হার-আংটি-লিপিও, রাজা-বাদশারা ঘৃরত রাতবিরেতে ছদ্মবেশে সংবাদসংগ্রহে। হারুন-অল রশীদ, বিক্রমাদিত্য, আর্থার ; আকবরও। তা ছাড়াও ছিল দূত-হরকরা-গুপ্তচর-পারাবত। এবং ঘোষক—চৌরাস্তার মোড়ে ঢোল বাজিয়ে লোক জড়ো করে রাজকীয় হুকুমনামা জারি করত সাড়ম্বরে। সর্বোপরি, সর্বজনীন তথাকেন্দ্র ছিল : হাট-বাজার-গঞ্জ-বন্দর, সরাইখানা মুদিখানা বারবিটখানা নাপিতখানা, এবং বলা বাহুল্য আফিমচীখানা।

যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষার তুলনা নেই। শব্দ থেকে আলেখ্য, কথ্য থেকে লেখ্য ভাষা ; তার জন্যে চিঠকর, খোদাইকর, মসীজীবী লেখক। পাথরে মাটিতে গাছে পাতায় চামড়ায় পুঁথিপত্রে ফলকে শতচ্ছিন্ন ফুলের পাপড়িতেও—আঁচড়ের পর আঁচড়। হামুরাবির টাবলেট, ফিনীশীয় প্রাচীর-পত্র, অশোকের শিলালিপি, সুলতানি ফরমান, মুঘলাই মদ্রা ইতিহাসখ্যাত। হিব্রু শাস্ত্রে : "দ্যা রিপোর্ট দেয়ারঅব ওয়জ হার্ড ইন ফারাওজ হাউস সেয়িঙ জোসেফস ব্রেদ্রেন ওয়্যার কামিঙ" ; তর্কবাগীশ গ্রীকরা পহলি মুলোকাতেই কুশল-বিনিময় করত : "কী খবর ?" আন্তর্জাতিক পথে-বিপথে খবরাদি চালাচালি করত নাবিক-বণিক-তীর্থযাত্রী-ট্যুরিস্টরা। দেশভ্রমণ করত গালগল্প জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মকর্ম। এক ধরনের ডাক-ব্যবস্থা ছিল রোম সাম্রাজ্য জুড়ে, আধুনিক

ভাষায় যাকে বলে 'নেটওয়ার্ক' ; 'বুলেটিন'ও বেরোত। 'নিউজলেটার' এল মধ্যযুগে, চার্চ অব গিল্‌ড্‌-এর আশ্রয়ে। সবই হাতে লেখা। অতঃপর মুদ্রণের আবিষ্কার আদান-প্রদানকে করে দিল সহজ সুলভ সর্বগ। ছাপার অক্ষরে 'পাম্‌ফলেট' বোধহয় জরমানরাই প্রথম বার করে ; তারপরে ইংরেজের 'নিউজ শীট'। ১৫২৩ সালে স্বনামখ্যাত 'News'। স্থলপথে 'ঘোড়ার ডাক', জলপথে 'সী/সার্‌ফেস্‌ মেইল' ; ক্রমশ 'রেলওয়ে/রোডওয়েজ মেইল সার্ভিস', শেষে 'বাই এয়ার মেইল'। প্রসপাত, নিছক বিনোদন নয়, প্রচার এবং জনসংযোগের মাধ্যম হিসেবে, সব দেশেই, নাচ-গান-যাত্রা-নাট-বহুরূপিয়া-তামাশাদির ভূমিকাও কম ছিল না বা এখনও কম নেই।

রেনেসাঁস। বিজ্ঞানে বিপ্লব ; শিল্পবিপ্লব ; শিল্পে বিপ্লব। তারপর ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী—বিশেষত শেষ দেড়শো বছরে বিজ্ঞানের দুর্ধর্ষ অগ্রগতি ক্রমাগত তাত্ত্বিক এবং কারিগরি আবিষ্কার, নবনব শিল্পোদ্যোগ, বড়ো-বড়ো শহর, সেইসঙ্গে মুদ্রণের পরিবহণের যোগাযোগের প্রচার-সঞ্চারমাধ্যমের অভাবনীয় উন্নতি : সংবাদপত্র-পত্রিকাপাঠ থেকে শুরু করে রেডিওটিভি সংবাদপাঠ, পত্রডাক থেকে তার-বেতার বার্তা—টেলিগ্রাফ টেলিফোন টেলিপ্রিন্টার টেলেকস্‌ ; চিৎকৃত চোঙা থেকে মাইক-লাউডস্পীকার ; ম্যাজিক লালটেন থেকে চলৎচিত্র ; রেডিওফটো থেকে টেলিফটো। হঠাৎ-হঠাৎ নয়। য়োরোপ-আমেরিকার সংখ্যাহীন বিজ্ঞানী তথা প্রযুক্তিবিদদের নিরবচ্ছিন্ন অন্বেষণা এবং নিরীক্ষার ফলস্বরূপ তবেই একটি টাইপরাইটার বা ক্যালকুলেটর বা ডিজিটাল অ্যানিমেটর। লিণ্ড স্কটের 'ফোনো-অটোগ্রাফ'-এর কুড়ি বছর পরে 'কলের গান' শোনালেন এডিসন (১৮৭৭)। বিদ্যুতেরও যুগন্ধর তিনি ; তার জন্যে ঋণী ফারাডে, ভোলটা, আমপীয়র প্রভৃতি জ্যেষ্ঠ গবেষকদের কাছে। এবং উত্তরসূরীদের কাছেও, যাঁরা ইলেকট্রিসিটিকে ক্রমে ক্রমে সবাসাচী করে তুলেছেন এবং পরিশেষে তাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন ইলেকট্রনিকস্‌-এর বহুবাচনিক অপরিমেয়তায়, তাঁরই প্রদর্শিত পথে।

ঘটনাটা ১৯৮০-র কাছাকাছি সময়ের, যখন বিজলির আলো রাতকে করে দিল দিন। কিন্তু বাল্‌বের ভেতরে আলোর সঙ্গে জড়িয়ে রইল অনেক কালো। কেন? উত্তর-সন্ধানী এডিসন একটা পাত ও তার লাগোয়া একটা তার ঢুকিয়ে দেখলেন : তারের গা বেয়ে তরতর বেরিয়ে আসছে অ-বাধ তরঙ্গ—আজাদ ইলেকট্রনের দল! নাম রাখা হল : 'এডিসন এফেক্ট'। পরবর্তী স্তরে, ইংলন্ডের আমব্রোজ ফ্লেমিং পাত সরিয়ে বাতির গোটা ফিলামেন্টটাই মুড়ে দিলেন একটা ধাতব সিলিনডার দিয়ে, তারটা ধথারীতি তার লেজুড়ে। হদিশ পাওয়া গেল রেডিও-ম্যাগনেটিক তরঙ্গমালার। দু বছর পরে আমেরিকার লী ডিফরেস্ট সেইসঙ্গে বসিয়ে দিলেন একটি সছিদ্র পাতও, যার কাজ : উদ্বাস্তু ইলেকট্রন-কণিকা নিয়ন্ত্রণ। প্রক্রিয়াটিতে স্মার্টনেস আনলেন জেনারেল ইলেকট্রিকের আরভিঙ এবং বেল টেলিফোনের আরনলড। এইভাবে বহুজনের বহুদিনের নিরলস প্রয়াস জুড়ে-জুড়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল 'ইলেকট্রনিক টিউব'—অঘটনঘটনপটীয়সী! তারও পরে সলিড স্টেট, ট্রানজিসটর, ডিজিট্যাল, সিলিকন চিপ, ফাইবার অপটিকস, লেসর বীম। এবং অতঃপর টিআর, সিটিআর, ভিডিও, ভিসিআর, কমপ্যুটর, ইনস্ট্যান্টামাইট, ইন্টারকম, স্যাটকম, ইত্যাদি ইত্যাদি। যুগান্তর ঘটে গেল যোগা-যোগব্যবস্থার, কম্যুনিকেশনের, বিনিময়ের : মানবিক পরিবেশের আচরণের মানসিকতার। ইলেকট্রনিকস দেখা দিল প্রবল সমাজশক্তিরূপে : দৈনন্দিন জীবনে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে এল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অভিঘাত, অভাবনীয় ॥

২. গুণে বৃদ্ধি সম্প্রসারণ

প্রচার-সঞ্চার-জনসংযোগের দায় আর দায়িত্ব অনেক : তথা/ঘটনা/সংবাদকে সকলের সামনে তুলে ধরা, মিথ্যা/ভ্রান্তি/অপবাদ/গুজবের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-নিরসন, কোনো বিশেষ বস্তু/সংস্থা/নির্দেশ/নীতি/বক্তব্যকে বিজ্ঞাপিত প্রতিষ্ঠিত করা, জ্ঞানের বিস্তার, ভাবের প্রসার, ইত্যাদি ; এবং যত কম সময়ে সম্ভব যত বেশি সংখ্যক লোকের কাছে এগুলি পৌঁছে দেওয়া।

এবং এ কাজ ইলেকট্রনিক মাধ্যম করতে পারে সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে—প্রচার-সঞ্চারকে সে বহুগুণিত করে দিতে পারে, স্থান-কালের সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে, পৌঁছতে পারে অধিকতম সংখ্যক লোকের কাছে। সেই লোকসংখ্যা একজায়গায় জড়ো-হওয়া একটা ঝাঁক হতে

পারে, দূর-দূরান্তের ক্লাবে জয়েন্ট সেন্টারে ড্রয়িংরুমে বারেকাবারে চণ্ডীমণ্ডপে শোহাউসে জটপাকানো আলাদা আলাদা গোষ্ঠী হতে পারে, আবার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়েছিটিয়েথাকা গৃহস্থ বা পথচারী বা সওয়ার বা চালক বা কর্মী বা ছুটন্ত বা দুলন্ত বা বিশ্রান্ত এক-একজন ব্যক্তিও হতে পারে। যে যেখানে যেভাবে আছে, সে সেখানে সেইভাবে থেকেই পেয়ে যেতে পারে যে-কোনো বার্তা বা চিত্র বা সচিত্র সংবাদ। একই ঘোষণা বা অনুষ্ঠানের দর্শক-শ্রোতা একই সঙ্গে ইন্ডিয়ান, রেড ইন্ডিয়ান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইন্দোচীনী কি এসকিমো। শুধু তাৎক্ষণিক নয়, দশ-বিশ-ত্রিশ কি তারও আগে ধরে রাখা ছবি বা কথা বা সবাক চিত্র—যন্ত্রে চড়িয়ে চালিয়ে দিন, একেবারে ফ্রেশ, তাজা! আর্কাইভে-লাইব্রেরিতে জমানো ফিলম/ক্যাসেট/টেপ বাজারে ছাড়ুন, ভাড়া দিন, কপি-প্রিনট করিয়ে নিন, যা খুশি। গোটা বিশ্বকোষ ধরে রাখুন নস্যির-ডিবে-সমান মাইক্রোফিলমে। যে-কোনো ছবির বা চিঠির বা দলিলের ফটোস্ট্যাট বা মাইক্রোকপি, যত কপি ইচ্ছে, হাতেহাতে পেয়ে যাবেন।

যত দিন যাচ্ছে, ইলেকট্রনিকসের আজব আজব কামাল ফুটে উঠছে, বেড়ে যাচ্ছে তার কাজের, অধিকারের সীমানা। যেমন 'ওয়াকি টকি' : শান্তিরক্ষক পুলিশের হাতে-হাতে, আবার জংগি ময়দানে অপরিহার্য সঙ্গিনী। 'র‍্যাডার-অ্যানটেনা' ছাড়া তো আজকাল কোনো দেশরক্ষী ক্যাডারই গড়া যায় না। এমন একদিন আসবে, যখন তাবিজের মতো বাহুতে 'ও.ট.' বা সাতনরী হারের মতো গলায় 'র‍্যা. আ,' ঝুলিয়ে-দুলিয়ে হেথাহোথা লুকোচুরি খেলবে খুদে শয়তানরা, ঘরে বসেই মা-বাবারা তাদের টিকির হদিশ পেতে থাকবেন রক্তের চাপ না বাড়িয়ে! এর চেয়ে কামাল 'বাগ' বা ইলেকট্রনিক ছারপোকা : ঘরের বা গাড়ির বা প্লেনের বা পকেটের ঘুপসি কোণে বসে অতন্দ্র 'মনিটর' করতে থাকবে দূরযানী গ্রাহক-যন্ত্রকে—যার বদৌলত প্রেসিডেন্ট নিকসনের অমন সাধের নোকরিটা গেল শ্বেত প্রাসাদ থেকে। অটোমেশন, ক্লোজ-সার্কিট-টিভি, রিমোট কন্ট্রোলের দৌলতে চলছে পথে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ, মাঠে চাষাবাদ, কারখানায় মেশিন, স্টুডিওয় শুটিং, ল্যাবে কাটাছেঁড়া, খেলৌনা ট্রেন-প্লেন-কার, ভিডিও গেম। গ্রাম-ওলিম্পিয়া থেকে পদব্রজে মশাল গেল এথেন্সে, তারপর বিদ্যুৎতরঙ্গের রূপ ধরে, সাগরে ডুবসাঁতার দিয়ে নিউইয়র্ক, পুনশ্চ স্বরূপধারণ ও ম্যারাথন-পাড়ি লস্ এঞ্জেল্স্-এর ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে, এই বছরেই। কমপ্যুটর যেন সহস্রচক্ষু ইন্দ্র—জটিলতম হিসাবপত্র (মায় জাল দু-নম্বরিও!), সময়, ক্যালেন্ডার, স্টপওয়াচ, এলার্ম, আবার বটতলার পাঁজিও—অমুক সালে, অমুক মাসে, অমুক তারিখে কী বার ছিল বা হবে, রবিবার পড়বে কোন্ কোন্ দিন, পূর্ণিমা-একাদশী-অমাবস্যা, পলকে জানিয়ে দেবে দশাসই 'ম্যাক্রো' বা তন্বীতমা 'মাইক্রো-কম্প্'। যে-কোনো ও যাবতীয় তথ্য—হোক সে প্রাকৃতিক সম্পদ বা পাশফেলের হার বা চোর ডাকাতের ঠিকুজীকোষ্ঠী—জমা দিন 'ডেটা-ব্যাংক'-এ; যখন যেমন যেটা দরকার, তুলে নিন বোতাম টিপে। ভাষা থেকে ভাষান্তরে অনুবাদ চান—'কম্প্-লেক্সিকন' হাসিমুখে করে দেবে অক্ষর-বাহিনীকে সংখ্যা-সেনানীর সাজ পরিয়ে। ছেলে-মেয়ে স্কুলে পৌঁছল কিনা? ভাববেন না। বাড়িতে ফোনে খবর নেবে 'রোবট-সুপার'। ঘরেতে ভ্রমর অর্থাৎ অতিথি এসেছিল, আপনাকে জানিয়ে দেবে 'ট্রান্স্-রিসীভার'। নতুন-নতুন রাগ-রাগিণী গুনগুনিয়ে উঠবে 'সলিড সিন্থে-সাইযার'-এ। এমনকি ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা কড়াপাক ভাষণও শুনিয়ে দেবে 'ইলেকট্রনিক গডম্যান'।

ইলেকট্রনিকস-এর অসীম সীমানা আজ অনন্তকেও ছাড়িয়ে গেছে দুরন্ত রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহের অনুগ্রহে। সংখ্যায় এরা এখন আড়াই হাজারেরও বেশি। সমুদ্রের গর্ভগৃহ থেকে মহাশূন্যের ব্রহ্মতালু ইস্তক তাবৎ হাল-হকিকত, সুদূর ভেনাসে কবে এক অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল, কত উঁচুতে তার হলকা উঠেছিল, কী-কী ধাতু প্রসব করেছিল, অভ্রান্তভাবে পৌঁছে দিচ্ছে আমাদের কাছে। ঘরের কাছের ভ্রাম্যমান দৃষ্টান্ত : ভারতের (তৈরি নয়, ওড়ানো) 'ইনস্যাট' : টেলিভিশন-টেলিকম্যুনিকেশন-ব্রডকাস্টিং, একই সঙ্গে তিন তাসের খেলা! সাংবাদিক-উপগ্রহ আজ আন্তর্জাতিক উপকথার নায়ক। ভিলেনও কভু-বা!

১৯৫৭ সালের ৪ অকটোবর কৃত্রিম উপগ্রহে সওয়ার মানুষের প্রথম মহাকাশযাত্রা। ঠিক পাঁচ বছর পরে সংবাদ-ছবি-রেডিও বুলেটিন-টিভি প্রোগ্রামের হাওয়াই চলাচল। ৬৫-র ৩১ মে 'আর্লী বার্ড'-এর মধ্যস্থতায় আমেরিকা আর ফ্রান্সের দুটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 'দূরদর্শনীয়' সাক্ষাৎকার ঘটল পঞ্চাশ মিনিটের জন্যে; কামু, বীট্ল্ লাতিন জ্যাজ পপ্ অ্যাব্সার্ডাদি নিয়ে সানন্দ বিতর্ক। আর এখন, উনিশ বছর পরে, আটলান্টিকের ওপারে পাতার পর পাতা কমপোজ হচ্ছে, অতলান্তিকের এপারে ছাপা হয়ে যাচ্ছে স্বয়ংক্রিয় মেশিনে। ছবি ভেসে উঠছে এনগ্রেভিং স্ক্রীনে। বিষুব-রেখায় বসে আইসক্রিম খেতে-খেতে উপভোগ করা যাচ্ছে বরফ-রোমাঞ্চিত আইস-ওলিমপিক উত্তর গোলার্ধেরও উত্তরে। ফলত, উপগ্রহণীয় কারুকৌশলে গোটা কম্যুনিকেশন-ব্যবস্থাটাই আজ হেভী ইনডাসট্রি। যেমন, মালটিন্যাশনাল 'ইনটেলস্যাট' : উপগ্রহগুলি তার ডাকঘর, কমপ্যুটর তার পোস্টম্যান, একুল-ওকুল পারাপার করে বিদ্যুৎগতি 'ইলেকট্রনিক মেইল।' বয়স হলে, এরা রিটায়ার করে, আসে নতুন রিক্রুট; খান তিনেক কারখানা থেকে। নতুনতর মাধ্যম, যারা তৈরি হচ্ছে, এল বলে : রকেট-আই, বায়োনিক কান, কবজি ফোন; দৈত্যের মতো বহুবলী ফিনফিনে 'ফাইবার অপটিকস', একসঙ্গে হাজার দশেক ফোনকল। ঝুড়িঝুড়ি শব্দ-ছবি-ডেটার লোড পলকে কানাকানি এহাত-ওহাত করে দিতে পারবে; এবং 'টেলিপোর্ট' : আন্তঃ-উপগ্রহ যোগাযোগব্যবস্থা। আশা করা যাচ্ছে : একদিন আন্তর-মহাদেশিক টেলি-কনফারেন্সের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে, যখন অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ দফতর/বৈঠকখানার বাইরে পাদমেকম্ যেতে হবে না, স্বগত ডিভানে সোফায় তোফা আরামে বসেই ছায়েব মুলাকাত, পরস্পর আলোচনা আর সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারবেন বিনা আয়াসে। যাতায়াতের ঝামেলা, নিরাপত্তার হাংগামা, সময় নিয়ে টানাহেঁচড়া থাকবে না; দোভাষীও না; কোড-ডিকোডিং চলতে থাকবে স্বত। মালটিন্যাশনাল কাজ-কারবার চলতে থাকবে মালটিচ্যানেল ফোনোভিশনে, তার স্ক্রীনে স্ক্যানারে ভেসে উঠবে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের শেয়ারমার্কেটের হৃদ্স্পন্দন। ক্লিক্বাজ লাইটার থেকে সুপারসোনিক বাযার, ইন্টার-ন্যাশ্কম থেকে অডিও সুপ্রা-সেন্সর—আপনি শুধু অর্ডার করবেন : জানলার পরদা খুলে যাবে, দরজার পাল্লা বন্ধ হবে, আলো জ্বলে উঠবে ঘরে ঘরে। দূর বলে, আড়াল বলে, গোপন বলে আর কোথাও কিছু থাকবে না, ফুলশয্যার 'একান্ত গোপনীয়' যমক-রাতও না : 'একদা আমাদের সমুদ্রতীরের সূর্যস্নানার্থিনীদের ফটো তুলত মেঘনাদ স্পাই-প্লেন; আজ সাতনরা হারেমের সাতপুরু হামামে তামাম দরজা বন্ধ রেখেও নিস্তার নেই মেঘনাদবিজয়ী ইলেকট্রনিক চক্ষু থেকে—বলেছিলেন কিউবার প্রেসিডেন্ট ফাইদেল কাস্ত্রো ॥

৩. বহুজনহিতায়

"বিবর্তমান প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের নিজের মধ্যেই থাকে সমাজকে বদলে দেবার পরা-অপরা শক্তি" (লর্ড ফ্রানসিস উইলিয়মস)। এই শক্তির অন্যতম অভিব্যক্তি ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমগুলিতে। দরবারি মজলিসের ঘেরাটোপ থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীতকে জলসার জনপথে-ফুটপাতে নিয়ে এসেছে পি, এ, বা পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম; খোলা ময়দান থেকে রান্নাঘর-শোবার ঘরে, ফুটবল-ক্রিকেটকে নিয়ে গেছে রেডিও ট্রানযিসটর টিভি; 'দূর-আলাপনী' স্থান নিয়েছে এবাড়ি-ওবাড়ি উচ্চকণ্ঠ পরচর্চা এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রেমালাপের।

সঞ্চার- ও প্রচার-বিদুষী ইলেকট্রনিক মাধ্যম ত্রিভুজা। প্রথম ভুজ : 'মিডিয়াম' তথা যন্ত্র তথা টেকনোলজি, যা বিজ্ঞান আর তার প্রয়োগ সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভুজ : 'মেসেজ' তথা প্রোগ্রাম, প্রচারণীয় বিবিধ প্রসঙ্গ। তৃতীয় ভুজ, যা প্রথম দুটিকে স্পর্শ এবং যুক্ত করে : 'মেসেন-জার'—একাধারে মিডিয়েটর-ক্যারিয়ার-রিসীভার—তথা মানবিক উপাদান; মানুষ, যে একইসঙ্গে স্রষ্টা-প্রয়োগ-কর্তা-উপভোক্তা। ভুজ তিনটি সর্বসম নাও হতে পারে কিন্তু পরস্পর শ্লিষ্ট; জরুরি তাদের সমন্বয়। যেমন জরুরি গণমাধ্যমের সমঞ্জসা দৃষ্টি, নির্বিশেষ সমদর্শন। যেহেতু তার মৌল লক্ষ্য : জাতীয় উন্নতি, জাতির সেবা; প্রতিবেশী দেশগুলির সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা; আন্তর্জাতিক সংবেদনার বিস্তার। গোটা বিশ্বকে, উপনিষদের ঋষি-কল্পিত 'একটি নীড়', ইলেকট্রনিক মাধ্যমের মোহান্ত আর্থার ক্লার্ক কথিত 'একটি পরিবার' করে তোলা। সুমহান দায়িত্ব নিঃসন্দেহ!

ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—রেডিও-ফিলম-টিভি। ত্রিমূর্তির প্রথম কাজ : লোকরঞ্জন—যার একদিকে বিনোদনের ঢালাও ব্যবস্থা, অন্যদিকে

শিল্পায়নের সাধের আসনটি। এক্ষেত্রে সে যেমন ট্রাডিশনাল শিল্প আর আঙ্গিককে আশ্রয় করে তেমনি নিজস্ব শিল্পরূপ আর শৈলীকেও প্রয়োগ করে, এবং ফলত উভয়ের মিশ্র রূপকলাকেও। ত্রয়ীর দ্বিতীয় কর্ম : প্রচার, প্রসার—তথ্য ঘটনা সংবাদ পরিবেক্ষণ পরিবেষণ, বাজারদর আবহাওয়া খেলাধুলা, কৃষি শিল্প বাণিজ্য, সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান, দেশবিদেশের পরিবেশ পরিস্থিতি, সরকারি নীতি বেসরকারি ক্রিয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রতিটি বিষয়ের জন্যে প্রতিটি মাধ্যমের স্বতন্ত্র ফর্ম আর ফর্মা, ভাষা আর স্টাইল—স্কিট ফীচার নিউজ-রীল ইন্টারভ্যু দলিলচিত্র ক্যাপশন ম্যাগাজিন ইন্টারসেপশন গান নাটক নৃত্যনাট্য বিচিত্রা—অজস্র। এর ওর মিলমিশও হয় ; রেডিও এবং ফিলম হাতধরাধরি করে টিভির অনতিবিস্তৃত বক্ষপটে। তৃতীয় কর্তব্য : শিক্ষকতা—সিলেবাস-নির্বাচিত/নির্বাসিত সব রকম এবং সব বিষয়েই। রেডিওর বোধোদয়-প্রোগ্রাম যেমন পাঠ্যপুস্তককে সহজসরলসরস করে তোলার সহায়ক, তেমনি সাধারণ জ্ঞান বাড়ায় জ্যাম, কুইয, জি, কে-র মতো আকর্ষণীয় সব অনুষ্ঠান। যেমন ঢাকা টিভির 'যদি কিছু না মনে করেন'। টিভি ব্যবহৃত ক্লাশরুমে, বীক্ষণাগারে, অপারেশন থিয়েটারে, রাজসভা-জনসভায়ও। বটানিক্যাল গার্ডেনে একটি ফুল ফুটতে যে সময় নেয়, তার চেয়েও অনেক অনেক কম সময়ে তাকে ফুটিয়ে দেয় ল্যাব-ফিলম ; মিনিটে ছবি এঁকে দেয় আর্ট-ফিলম ; খেলাধুলো শেখায় স্পোর্টস ফিলম। লিংগুয়াফোন, অডিও-ক্যাসেট শেখায় ভাষা, লাইট-অ্যান্ড-সাউন্ড জানায় ইতিহাস, ভিসিআর—আপনি যা চান! নিরক্ষরতা দূরীকরণ, হাতের কাজ শেখানো, জনজাগরণ—গণমাধ্যমের এগুলিই জরুরি শিডিউল, সমাজের দেহ আর মনের স্বাস্থ্যরক্ষা, সুনাগরিক গড়ে তোলা, তারই বিপুল বিচিত্র আয়োজন, যেখানে ইলেকট্রনিকস প্রযুক্তির ভূমিকা ক্রমেই প্রধান হয়ে উঠছে। উদাহরণত, এইরকম একটি আয়োজন ওয়াল্ট ডিজনীর ভবিষ্যমুখী স্বপ্নরাজ্য 'এপ্‌কট্', যার পৌত্তলিক অধিবাসীদের গোত্রনাম 'অডিও অ্যানিমেট্রনিকস'। সংখ্যায় এরা কয়েকশো ; বসবাস গ্যাজেট-অলংকৃত পারিপার্শ্বিকে ; প্রতি সেকেন্ডে বাহাত্তর হাজারেরও বেশি লৌকিক এবং অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ করে চলে নির্বিবাদে। দৈনিক লাখখানেক ভিজিটরের সেবা, দরজা খোলা, আলো জ্বালা, লিফট চালানো, পাহারাদারির কাজ—এসবও তার মধ্যে পড়ে। বিস্তৃত প্রোগ্রাম যদি জানতে চান, মাইক্রো-ইলেকট্রনিকস-মাখানো পরদা ছুঁলেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে জ্বলন্ত অক্ষরে।

শিক্ষা-বিনোদন-তথ্যপরিবেষণ। বস্তুত, জনসেবার ক্ষেত্রে মাধ্যমত্রয়ীর তুলনা নেই। কাঁচ কাঁচা থেকে পাকা চুল, গ্রামীণ কৃষক থেকে শহুরে উদ্বাস্তু থেকে কারখানার মজদুর, যুববাণী থেকে মহিলামহল থেকে চর্চা-কাবিষয়, চাষবাস শিল্প-উদ্যোগ ব্যবসাবাণিজ্য উন্নয়ন-প্রকল্প, খরা-বন্যার মোকাবিলা, রান্নাসেলাইসাজগোছ, অকালমৃত্যু ও জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, যুদ্ধ ঘরে-বাইরে, বিদেশী ও বিশেষ-বিশেষ অনুষ্ঠান—সকলের জন্যে সবকিছুর জন্যে সর্ববিধ প্রোগ্রাম আর প্রচার : সংবাদ সংলাপ বিবৃতি সাক্ষাৎকার সমীক্ষা পর্যালোচনা, এবং কী নয়! অন্যতম প্রধানতম কার্যক্রম : জনসেবকদের সহযোগে জনসংযোগ। যেমন নেপাল রেডিওতে—গাঁয়ের সমস্যা নিয়ে একটি বিশেষ প্রোগ্রাম, তার 'ফলো-আপ' ঘরেঘরে মাঠে পঞ্চায়েতে যেখানে সমাজসেবীর সংগী অনুষ্ঠান-পরিচালকও, তার ভিত্তিতে পরবর্তী অনুষ্ঠানের কার্যক্রম। পাপুয়া-নিউগিনির টিভিকেও একাজ করতে দেখেছি লোকায়ত যাত্রা 'রন রন থিয়েটার'-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে র‍্যাশনিং মদ্যপান যৌনব্যাধি চর্চায়। স্টুডিওর বাইরেও বিরাট কর্মক্ষেত্র ; অভিজ্ঞ ভিসুয়্যাল গ্যাজেট এবং ভ্যান গ্রামে গ্রামে ঘোরে সাক্ষরতা জনস্বাস্থ্য পরিবার-পরিকল্পনা কুটিরশিল্পশিক্ষাদি প্রযোজনায়, সমাজসুধারে, জাতিগঠনে। পরিবেশ-দূষণ নিয়ে উত্তেজনা ইদানীং দেশে-বিদেশে। রেডিওর গান-শ্লোগান, টিভির ক্যাপশন তো আছেই ; এ নিয়ে জাতিসংঘের নিজস্ব ছবি : "রিমেম্‌বার মী, সিটিযেন ইনভলভমেন্ট, ডেভেলপমেন্ট উইদাউট টীয়ার্স ?" প্রভৃতি। এক্ষেত্রে অন্যান্য মিডিয়াকেও কিভাবে কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে প্রায়োগিক গবেষণা চলছে পৃথিবী জুড়ে, যার সঙ্গে বর্তমান নিবন্ধলেখক ঘনিষ্ঠ জড়িত।

বহুজনহিতায়, মানবজাতির সমূহ কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ রেডিও ফিলম টিভি বিবিধ প্রোগ্রাম-প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকে। পুরনো, নতুন, প্রচলিত নবাবিষ্কৃতও। যেমন 'অ্যাকসেস'—দুর্ভিক্ষের সংবাদ-চিত্র-বিবৃতি শুধু নয়, পীড়িত জনগণকে ক্যামেরা-মাইকের সামনে এনে তাদের দিয়েই তাদের দুঃখ দুর্দশা তুলে ধরা, আলোচনা, পথের সন্ধান। অর্থাৎ অনুষ্ঠানের শামিল করা এবং সেইভাবে সক্রিয় করে তোলা, যাকে বলা যায় 'স্টুডিও টু ল্যান্ড প্রোগ্রাম'। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি সুপরিচিত 'ফীড্‌ব্যাক'—পত্রপত্রিকার 'সম্পাদকেষু' কলামের ইলেকট্রনিক প্রতিরূপ 'ফোন-ইন' ; সংগৃহীত হয় দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া মতামত, সেগুলির মূল্যায়ন হয়, অনুষ্ঠান সংশোধিত হয়, নিবিড় হয় জনসংযোগ। তৃতীয় প্রক্রিয়াটি 'গ্রুপ/প্যানেল প্রোগ্রামিং'—বাইরের লোক বা সংস্থা দিয়ে কোনো বিশেষ প্রোগ্রাম করানো, যাতে থাকে সমস্যার নিরপেক্ষ রিপোর্টাজ, ব্যাখ্যাও। এতে জনজীবনের ধাঁচ আর ধরন, বিপর্যয়ের আঁচ আর স্বরূপকে দেখা যায় নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে, এক গ্রামের অভিজ্ঞতা রফতানি হয় গ্রামান্তরে, জনমত দানা বাঁধে, সমাধানের কাজ সুষ্ঠু এবং ত্বরান্বিত হয়। স্টুডিও, ল্যাবরেটরি, ফিলড ওয়ার্ক, এডিটিং রুম, কনট্রোল প্যানেল, প্রোজেকশন, মোবাইল ভ্যান, এইসব প্রযুক্তি-বিজ্ঞান একদিকে ; অন্যদিকে জনসেবা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মনোরঞ্জনের কার্যক্রম ; উভয়কে মেলায় মানুষ, বিজ্ঞান আর আর্টকে, টেকনিক আর টেকনোলজিকে। নানান স্তরের, নানান জীবিকার মানুষ ; মানুষেরই জন্যে। ত্রি-মাধ্যমকে কেন্দ্র করে শিল্পী শিল্পপতি বিজ্ঞানী কারিগর ছাত্র শিক্ষক সমাজসেবী, রাজনীতিক প্রশাসনিক আমলা কৃষক মজুর শিশু যুব নারী মহাজন হরিজন—সবাই এসে এক বিন্দুতে মিলিত হতে পারে, মেলে, দেশরক্ষায় উন্নয়নে দুর্যোগরোধে যোগ দেয়, জাতীয় ঐক্যবোধে উদ্দীপ্ত হয়, আন্তর্জাতিক স্থিরবিন্দুগুলিকে চিনে নিতে পারে, মুক্তি পায় মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোর পাপ থেকে। জন্ম নেয়, ব্রেজিলের প্যানটো ফ্রেইয়ের ভাষায় : "ফেথ ইন দ্য পীপলস এবিলিটি টু লারন, চেনজ, লিবারেট ফ্রম ইগনোরেনস, পভার্টি, এক্সপ্লয়টেশন।" ইলেকট্রনিকস গণমাধ্যম তখন সত্য অর্থে জনগণের মাধ্যম হয়ে ওঠে ॥

৪. বহুজনশোষণায় চ

মুদ্রাযন্ত্র জন্ম দিয়েছিল 'পাবলিক', শিক্ষিত সচেতন জনসম্প্রদায় ; ইলেকট্রনিক যন্ত্রের জাতক 'ক্রাউড', জনতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে। তাৎক্ষণিকতার টেনশন, গণসমষ্টির কাছে পৌঁছনোর জরুরি তাগিদ, ভারি শিল্পের ভার আর ধার, ইত্যাদি কারণে রেডিও-ফিলম-টিভিকে এমন সব অনুষ্ঠানের, প্রচার-প্রক্রিয়ার আয়োজন করতে হয়, এবং এমন আঙ্গিকে আর ভঙ্গিতে, যা সর্বজনবোধ্য, সহজপাচ্য, অনায়াসসঞ্চারী। বিশেষ অনুষ্ঠান, সিরীয়াস প্রোগ্রাম অবশ্যই হয়, যেমন হয় নবনাট্য, শিল্পিত সিনেমা। কিন্তু এসবই মনে হবে 'ডেকরেটিভ পীস', ঘরসাজানোর সামগ্রী, যখন ও যেখানে গোটা বিনোদন-ব্যাপারটাই নির্ভেজাল বাণিজ্য—রেডিওতে টিভিতে হোটেলে বারে টেপে ক্যাসেটে রেকর্ডে পত্রিকায় গ্রন্থজগতেও। ঠিক যেমন ট্যুরিস্ট সেন্টার, খেলাধুলা, খেলনার দুনিয়ায়। ফলত, ইলেকট্রনিকস মিডিয়া একটি ভারি উদ্যোগ, বিরাট তার বাহার আর বাজার, এবং খদ্দের সববয়সী সব স্তরের সর্বজনগণ। প্রোডাকশন এবং মার্কেট-ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত জরুরি। তার সূত্রানুযায়ী লসাগু-গসাগুর হিসেব কষে রুচি আর বোধের একটা সাধারণ মান স্থির করে নিতেই হয়, সেই অনুপাতে প্রোগ্রামের নির্বাচন-উৎপাদন-বণ্টন। তাই সরকারি রেডিও-টিভিতেও বিজ্ঞাপন-বিভাগ খুলতে হয় সস্তা নাচগানের অনুপাতসহ। এবং কে না জানে, গোটা ফিলম-ইনডাস্ট্রিই দাঁড়িয়ে আছে এর ওপর।

কম সময়ে, কম খরচে, কম পরিশ্রমে, অথবা ব্যয়বাহুল্য এবং কর্মবহুলতায়, একই প্রোডাক্ট দিয়ে মনোরঞ্জন লক্ষ লক্ষ লোকের, যার উপাধি 'মাস'। যার ফল : "মাস প্রোগ্রাম...মাস প্রোডাকশন...মাস সেল...মাস কনযামশন...মাস মিডিয়া...মাস কালচার।" সুলভ সর্বগণীন অব্যর্থফলপ্রদ। বই পড়তে হলে লেখাপড়া শিখতে হয়, মাস মিডিয়ায় আবশ্যিক নয়। রেডিও থেকেও যখন খুশি যেখানে খুশি বাজাতে পারে ; চিত্রগৃহে স্বগৃহে যথেচ্ছ ছবি দেখতে পারে ; এবং টিভি তো পারিবারিক 'ইডিয়ট বক্‌স' : চিৎকৃত গান, প্রগল্‌ভ নাচ, দুর্দান্ত বলাৎকার-দৃশ্য, শাখামৃগপ্রেম, জন্মনিয়ন্ত্রণ-বটিকাটির রসাস্বাদ করে গোটা পরিবার, বয়সনির্বিশেষে, একসাথে।

আর্জেন্টিনার ঔপন্যাসিক মানুয়েল পুইগ দেখিয়েছেন, সর্বার্থসাধক মাস-কালচার সমাজের এবং মগজের কোষে-কোষে কিভাবে ছড়িয়ে যায়, যাকে গ্যাসটে বলেছেন 'অমানবিক প্রক্রিয়া', যার প্রতিক্রিয়ায় 'পার্বলিক'ও হয়ে যায় 'মব', রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জনতাপিণ্ড', যখন সমান হয়ে যায় অধ্যাপক আর ক্ষপণক, আমলা আর মস্তান, আইনজীবী আর রিকশাওয়ালা—একই পাত্র থেকে পান করে বিনোদিনী অমৃতরস। সুলভ জনপ্রিয়তা, উত্তেজক গ্ল্যামার, ত্বরিত অর্থ কট্টর বুদ্ধিজীবীকেও করে গণ-পিণ্ডসংস্কৃতিমান। কিছুদিন আগে, পূর্ব জারমানির আন্তর্জাতিক থিয়েটার সেন্টারের সহ-সভাপতি ক্রিস্ত বেয়েভাঁ, যিনি এদেশীয় অভিনয়জগতের হাঁড়ির খবর রাখেন, এক সাক্ষাৎকারে দুঃখ করে বলেছিলেন : ভারতীয় থিয়েটার এখনও শৈশবাবস্থায়, কোনোরকম নাট্য-আন্দোলন এখানে নেই ; দক্ষ অভিনেতা অভিনেত্রী পরিচালক কলাকুশলী আছেন, ভালো নাট্যকার নেই ; তেনদুলকাররা সিনেমার জন্যে লিখতে শুরু করেছেন... লোভনীয় টোপ এবং সুলভতা ও গণমুখিনতা এই দুই গুণের সুযোগ নিয়ে, চতুর যারা, যারা সওদাগর, মাস-মিডিয়াকে ব্যবহার করে বহুজনশোষণায় চ। অপ-সংস্কৃতিই হয় নবা-সংস্কৃতি। চতুর্দিকে, হরির লুটের বাতাসার মতো ক্রাইম-সেকস-ভায়োলেন্সের বেশুমার বেহিসাব ছড়াছড়ি, যা ছড়িয়ে পড়ে সমাজে। এ নিয়ে কত লেখালেখি আলোচনা বিতণ্ড সার্ভে ময় ইউনাই-টেড নেশনস/ইউনেসকোর ঝাঁঝাল রিপোর্ট/আইন আদা-লত শাস্তিও। সব নদারদ। হলিউডের সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছে কমিকস, পত্রিকার পাতায় পাতায় ইন-ডেপথ কিসসা, ইনভেস্‌টিগেটিভ্‌ ফটো-জারনালিজম!

জট পাকায় ভাষা নিয়েও। 'আকাশবাণী-দূরদর্শন' শব্দব্যবহারে তামিলনাড়ুর ঘোর আপত্তি, হিন্দি ছবি বানানোয় কিন্তু নয়! রাষ্ট্রভাষায় অনীহা যে বাঙালির, গল্পে চালায় ভুল হিন্দি, তারই পারিবারিক শ্রাদ্ধবাসরে বাজে বোম্বাই ফিলমি গানার কীর্তন। যেখানেই একা-ধিক ভাষা—কানাডা, বেলজিয়াম, ভারত, তানজানিয়া—'মাসভাষা'র দাপট, পরস্পর ঠোকাঠুকি, তার জের চলে আন্তর্জাতিক কমিশন পর্যন্ত। নরওয়ে রেডিওর সংবাদ-পাঠক যেই সংখ্যালঘুদের ভাষার প্রতি ঈষৎ মুহস্বত দেখিয়েছেন, গুরুভাষাভাষীরা হৈ হৈ করে উঠল 'অ্যাবোমিনেবল স্নোম্যান' ব'লে, চাকরি নিয়ে টানাটানি বেচারীর! এখন এম, এন, সী-র যুগ ; নরওয়ে-সুইডেন-ডেনমার্ক-ফিনল্যান্ড জোট বেঁধে বাজারে ছাড়ল মালটি-ন্যাশনাল টিভি প্রোগ্রাম ; ভাষা-কলহে টিভিরই নাভিশ্বাস!

কে বলে ছবির ভাষা সর্বজনীন? নাইজিরিয়ার একটি শিশুচিত্র দেখে উগান্ডার মায়েরা উগ্রচণ্ডা : "অ্যাঁ! বাচ্চা উলংগ কেন? চানের জল আগে মাথায় ঢালা হল কেন?" দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটুকরো কংগোলী সেনা ডিজনীর 'ডোনাল্‌ড্‌ ডাক' দেখে অগ্নি-কণা : "হাঁসের গায়ে আমাদের ইউনিফরম! ঠাট্টা?"—মার পাথর, মার পাথর! ফিলম ডিভিশনের পরিবার-নিয়ন্ত্রক ছবি, খাটিয়ায় বসে বাত্‌চিত্‌ দৃশ্যটি পর্দা-নশীন হতেই গোঁড়ীয় দর্শককণ্ঠে কোরাসি শ্লোগান : "বল হরি...!" তিন ক্ষেত্রেই মাস-ইমেজের ঝাঁঝে বক্তব্য গণ্যাযাত্রী।

এ ছাড়া আছে টেনশন। পৃথিবীর ছত্রিশটি ছোট-মেজো-সেজো দেশে নিজস্ব কোন সংবাদ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান নেই। আর, পৃথিবীর চারটে দানব-প্রতিষ্ঠানের দুটো আমেরিকায়, একটা ফ্রান্সে, একটা ইংলণ্ডে। দৈনিক সরবরাহের বরাদ্দ তেত্রিশ মিলিয়ন শব্দ। প্রায় গোটা প্লোবটাই স্যুপারমার্কেট। একচেটে ব্যবসায়। তথ্য : সত্য মিথ্যা বিকৃত বানানো ; সেইমতো টীকা টিপ্পনি ব্যাখ্যা। ওদেরই অপপ্রচারিত হেডলাইন : "আফ্রিকা অন্ধকার মহাদেশ...গান্ধী নাংগা ফকীর...ভিয়েৎকংরা জানোয়ার...নিগ্রোরা বাঁদরবাচ্চা...সাপ ডাকাত খুনে রেপিস্ট যোগী ভিখিরি নিয়েই ভারত"। গণমাধ্যমের টিকি থেকে লেজ পশ্চিমী গণেশের প্রবল থাবায়।

জাতিসংঘ সনদের সাবধানবাণী : "কোনো দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো চলবে না।"—কোন্‌ পহেলওয়ান শুনছে! যেহেতু আকাশ কারও ব্যক্তিগত জমিদারি নয়। মাইক্রোওয়েভের চলার পথে নেই কোনো পাঁচিল, সফিসটিকেটেড প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যে কথা-ছবি-সংকেত যেকোন দিশায় সহজেই পাঠানো যায়, এবং ঘরে বসে গ্রাহকযন্ত্রে যে-কেউ যখন-তখন তা ভোগ-উপভোগ করতে পারে, সেনসরের কাঁচি, কাসটমসের ছুরি, ডাক-তারি ফোরসেপের বালাই নেই, নেই আমদানি-রফতানির ঝুটঝামেলা, এবং সেইসঙ্গে দেশেদেশে নেই গোয়ে-বল্‌সীয় চেলাচামুণ্ডার অভাব, অতএব কমজোর/কোমরভাঙা জাতের চোখ-কানের ভেতর দিয়ে মরমে অবাধে প্রবেশ করে মজবুত দেশের মন্ত্রতন্ত্রপটপাঠ/ভিন দেশের প্রচার-প্রতিবাদ ভণ্ডুল করে দেওয়া হয় তরংগপথ জ্যাম বা ব্লক করে, নিপাট বোবা সেজে! শর্টওয়েভের প্রায়-রাজপথগুলোয় ওদেরই ইলেকট্রন-বাহনের শোভাযাত্রা। অতএব সিংহানুকের নকল কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ে কামপুচিয়ার রেডিও-রিসীভারে ; প্রেসি-ডেন্ট রিগ্যানের 'নাম-পরিবাদ' তথা নিজোট-সম্মেলন-নিন্দা বিশ্বে বিতরিত হয় বিনামূল্যে ; আর জেটহীন দেশ আহূত জাতিসংঘের শান্তিকামী অধিবেশন—বেবাক র‍্যাকআউট! লুই মাল বাসি খবর ; বিবিসিও বাসি ; এবং তাজাও—সাম্প্রতিক 'কাশ্মীর দর্শন' তার নিদর্শন। কিংবা গ্রানাডা টেলিভিশনের বিতর্কমূলক নেতাজী-চিত্র। পশ্চিম জারমানির এ, আর, ডী, টিভি কোম্পানির জাল ছড়ানো পশ্চিম য়োরোপের অলিতে গলিতে, লক্ষ লক্ষ দর্শক। ৫ ফেব্রুআরি ১৯৮৪-র ছবি উলফ লিটলম্যানের "ইন্দিরা গান্ধী—দ্য কুইন অব ইন্ডিয়া"—শ্রীমতী গান্ধী তো বটেই, গোটা ভারতের বিরুদ্ধেই কুৎসার উদ্‌গার! এবং এই সবেরই আদুরে নাম 'তথ্যের অবাধ প্রবাহ'! এবং এরই বিরুদ্ধে ইউনেসকোর অভিযান ; এবং সেকারণেই ইউ, এস, এ-র সবেগে গোঁসাঘরে প্রবেশ এবং তালাকের হুমকি। ব্রিটেন-জারমানিও আওয়াজ ছাড়ছে! কুলেশীলে উন্নয়নশীল দেশের পালটা-তালাকের হক আছে, হিম্মত নেই ; ভরসা শুধু সংবাদপত্র আর প্রতিবাদপত্র। কিন্তু তার খবর ওই লক্ষ লক্ষ য়োরোপ-বাসী রাখে না।

একদিকে প্রযুক্তি-প্রয়োগ-প্রোগ্রাম বিদ্যায় এই ঘাটতি, অন্যদিকে অর্থশাস্ত্রের মিটমিটে নীতি : "বাজারে যে-জিনিস হাফ-সস্তায় পাওয়া যায়, তা ঘরে তৈরি করার দরকার কী?" অতএব ভিক্ষার বুলি পেতে দিতেই হয়, পার্টস এনে-এনে ডায়াগ্রাম দেখে-দেখে, জুড়ে-জুড়ে 'স্বদেশে প্রস্তুত রঙিন টিভি' বলে চালাতেই হয়, অনুষ্ঠানসূচী ভারতে হয় দানদাক্ষিণ্যে বা কিনে বা ভাড়া করে। দিশারী পত্রিকায় বিদেশী কমিকস-এর মতো। ভালো ছবি, প্রোগ্রাম মেলে নইকি, বেশির ভাগই তৃতীয় শ্রেণীর। দুনিয়া জুড়ে বিক্রেতাদের বড়বাজার, কেনাবেচা করে সিন্ডিকেট, মুনাফা লোটে বেশুমার। শ চারেক গল্পে ঠাসা চিত্রসরিৎসাগর 'বোনান্‌যা', প্রতি সপ্তাহে পৃথিবীর চল্লিশ কোটি টিভি দর্শক। উত্তর আমেরিকার 'সিসেস স্ট্রীট'-এর লাতিন আমেরিকান সংস্করণ 'প্লাযা সিসমে' যাকে গোলডসনেন বলেছেন 'সাংস্কৃতিক আক্রমণ'। এই আক্রমণই দেখেছিলেন এডমন্ড কারপেনটার নিউ-গিনির গ্রামবাসীদের মধ্যে—যারা 'ফটো' কী বস্তু দুদিন আগেও জানত না, ফিলম দেখলে লাফ মেরে পালাত, তারাই হঠাৎ একদিন হ্যাটকোটনেকটাইয়ে ভব্যজ সাহেব বনে গেল, তাঁর ভাষায় "মিডিয়া যেন গিলে ফেলল ওদের" —'ও, হোয়াট এ ব্লো দ্যাট ফ্যানটম গেভ মী!'—বইয়ের নাম রেখেছিলেন জনদরদী কারপেনটার। ফ্যানটমের সহস্র বাহু এখন দুনিয়ার সহস্র দিকে বিস্তারিত ॥

পরিশিষ্ট

চলচ্চিত্রকে সর্বোত্তম হাতিয়ারের শিরোপা দিয়ে-ছিলেন লেনিন। বস্তুত, তাবৎ গণমাধ্যমই লড়াইয়ের হাতিয়ার, যে যেটা যেভাবে ব্যবহার করতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাধিক দেশে জাতিগঠনের মমত দিতে দেখেছি ব্যাটারি-রেডিওকে—খেতে, কারখানায়, বিদ্যায়তনে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ জ্ঞান সঞ্চয় করে, অর্জিত জ্ঞান পুনশ্চ প্রয়োগ করে বাস্তব জীবনে, লড়াই করে, জেতে। কৃতা-বিলাসের দাপট যতই থাকুক, আদিম মানব বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছে, তার মোকাবিলা করেছে রীতিমতো বস্তুজ্ঞানসহকারেই, যা ক্রমশ-বিকশিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ধারাবাহিক ইতিহাসে, ঐতিহ্যে। যার দৌলতে প্রজ্ঞা সর্বকালীন সর্বজনীন সর্বদেশী। জাতিসংঘের সনদে তাই মানবাধিকারবিষয়ক ঘোষণা : "পৃথিবীর যে-কোনো অঞ্চল বা প্রান্ত থেকে যে-কোনো তথ্য বা জ্ঞান ও ভাব আমদানির অধিকার প্রত্যেকের আছে।" ইউনেসকোর পাদটীকা : "তথ্যের অবাধ সঞ্চরণ, শিক্ষার বিস্তার, এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উপগ্রহ-যোগাযোগ-ব্যবস্থার ব্যবহার"। এক্ষেত্রে ইলেক-ট্রনিক প্রয়োগ-সংযোগ মাধ্যমের ভূমিকা বিরাট, মুখ্যতমই বলা যেতে পারে। তবে প্রধানতম কর্তব্য : তথ্যের, জ্ঞানের ঝুলিটি কেবলই ভরে দেওয়া। তার অনন্য লক্ষ্য : "টু হোল্ড অডিয়েন্স"—মানুষকে কাছে টানা, ধরে

রাখা। তার রীতিপদ্ধতি, তার সর্জনা, তার আনন্দ। মহৎ দায়িত্ব নিঃসন্দেহে। তবে দায়পালনের শ্রেণীভেদ আছে, গ্রহণ-বর্জনেরও। তা থেকে রূপভেদ স্তরভেদ প্রয়োগ এবং স্বাদভেদ। যেমন সব গণমাধ্যমের আর শিল্পেরই থাকে।

স্বত্বস্বামিত্বের বিচারে, ইলেকট্রনিকস গণমাধ্যম দু-শ্রেণীর : সরকারি আর বেসরকারি। প্রথমটি প্রশাসন-অনুগত, দ্বিতীয়টি ব্যবসায়-অনুগামী। বর্ণ বিভিন্ন, উভয়ের চলন-বলন-গঠনও। 'প্রেসার গ্রুপ', স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর চাপ দুটিতেই—সরকারি সংস্থায় শাসকদলের, বেসরকারি সংস্থায় বণিক-শিল্পপতির। এবং অবশ্যই বিজ্ঞাপনদাতাদের ; দুটোতেই এদের ছায়া কমবেশি। এ ছাড়া, বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরও ছায়া-কায়া লক্ষণীয়।

এতাদৃশ ভাগাভাগির অনিবার্য ফল : টাওয়ার অব ব্যাবেল! যথা : একই ঘটনা/বিষয় : ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়ায় বা একই মিডিয়ার বিভিন্ন সংস্করণে তার আলাদা আলাদা স্টোরি/ভাষ্য, উলটোপালটা পরস্পর-বিরোধী প্রচার। এতদ্দ্বারা একদিকে যেমন ব্যক্তিক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রমাণিত-প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যদিকে জনমন হয় বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত, দানা বাঁধতে পারে না সুবিদিত জনমত!

রেডিও ফিলম টেলিভিশন একপক্ষে গণমাধ্যম, অন্য-পক্ষে শিল্পমাধ্যম। বাণিজ্য এবং আর্ট। আর্টের রাজ্যে উচ্চচিত্ত সৃজন-লীলা, বাণিজ্যের বাজারে ফরমুলারই দর-আদর। আর্টিস্ট-পরিচালককে শিল্পসৃষ্টির শর্ত মেনে চলতে হয়, প্রয়োজনীয় অর্থ জোটাতে পারলেই যে-কেউ বেনিয়া-পরিচালক। গ্রহণের ক্ষেত্রেও একই ভাগাভাগি—পাঠ্যবই দাবি করে অন্তত কিছু পরিমাণ বিদ্যা (অবশ্য এরও স্তরভেদ আছে) ; সিনেমা-টিকিটের পয়সা পকেটে থাকলেই হল। দুনিয়াময় যেহেতু কমজোর-মগজই সংখ্যাগুরু, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্য প্রসার লাভ করে, আর্টকেও করে কাহিল।

আর-একটি শ্রেণীভেদ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের গণমাধ্যমগুলির মধ্যে। এই প্রসঙ্গে ইউনেসকোর রায় : "উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই মুহূর্তে প্রয়োজন—প্রতি একশোজনে দশটা করে খবরের কাগজ, পাঁচটা করে রেডিও, দুটো টিভি সেট, এবং দুটো করে সিনেমাসন।" বলা বাহুল্য, দশক পেরিয়ে গেছে এ-লক্ষ্যে এরা কেউই পৌঁছতে পারে নি—না কারিগরিতে, না অনুষ্ঠানশিল্পে। এই দুর্বলতা আর পশ্চাৎপদতার সুযোগ নিয়ে উন্নত দেশগুলি কিভাবে একচেটিয়া ব্যাবসা আর সংস্কৃতিকে গ্রাস করে, 'বহুজনশোষণায় চ' অধ্যায়ে তার উল্লেখ করেছি। এরই প্রতিরোধে ইউনেসকো অনেকদিন ধরেই রিপোর্ট মনোগ্রাফ বই ইত্যাদি প্রকাশ করে আসছে। ১৯৭৭ সালে বসল আন্তর্জাতিক কমিশন, সভাপতি নোবেল ও লেনিন পুরস্কারখ্যাত স্যাঁ ম্যাকব্রাইড। প্রত্যাশিত রায় বেরোল : 'তথ্যের অবাধ প্রবাহ দুদিক থেকেই অবাধ রাখতে হবে, এবং সমান ওজনের হতে হবে তাদের আনাগোনা।' রিপোর্টের শিরোনাম : মেনি ভয়েসেস ওয়ান ওয়ার্ল্ড : অনেক কণ্ঠ একটি পৃথিবী, আজ এবং আগামীকালের জন্যে। তিন বছর পরে পারিতে, তারপর বেলগ্রেডে প্রস্তাবকে সমর্থন করে দাবি জানানো হল তাকে কার্যকর করার। ভারতসহ পঁয়ত্রিশটি সদস্য-দেশ নিয়ে গড়ে উঠল অন্তর-জাতীয় কাউন্সিল। লক্ষ্য : 'তথ্য সরবরাহ-প্রচার-সঞ্চারের গণতন্ত্রীকরণ, বিশ্বব্যাপী।'

ইউনেসকোর উৎসাহে আর প্রেরণায় 'নাম' তথা নিজোট-সম্মেলন এক দশক আগে প্রথম মুখ খোলে, আলজিরীয় অধিবেশনে ; তিন বছর পরে দিল্লীতে, তার-পর কলম্বোয়—'নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা', তার পাশাপাশি 'নয়া অন্তরজাতিক তথ্যপ্রচারব্যবস্থা'র দাবি জানানো হল। সেই সঙ্গে 'নাম'-নিষ্ঠ নিজোট সংবাদ-সরবরাহ-সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি একের পর এক দেশে। শেষে, এই ১৯৮৩-র মার্চে পুনশ্চ নয়াদিল্লীতে এগুলিকে সুষ্ঠু সংহত রূপ দেবার যৌথ প্রয়াস। ডিসেম্বরে 'নামি-ডিয়া' সম্মেলনে সোচ্চার দাবি : 'প্রচার-সাম্রাজ্যবাদ চলবে না চলবে না।'...প্রচেষ্টাগুলি প্রশংসনীয়। কিন্তু যেটা চলবে, চলা উচিত—'প্রচার-সাম্যবাদ', তাকে চালাতে হলে যে-পরিমাণ রেস্ত, তাগদ, ইল্‌ম্‌ তথা সমাজ অর্থ-নীতি রাজনীতি শিক্ষা টেকনোলজিতে সার্বিক অগ্র-গতি দরকার, পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে যতদিন তা না জুটছে, জোটহীন নিউজ-পুলে খুশ্‌খবরও পয়দা হবে না ততদিন।

এই পিছিয়ে থাকার জন্যে তৃতীয় বিশ্বের আপন বিশ্বে একাধিক জটিল সমস্যা জমে উঠেছে। ঐতিহাসিক

কারণে, একদা-উপনিবেশ এবং নয়া-উপনিবেশ দেশে-দেশে ধনী-দরিদ্রের মতো, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের ভেদ-রেখাটিও বেশ মোটা দাগের। ফলে, নান্দনিকতা এবং বিনোদনের, গণমাধ্যমিক আর্ট এবং বাণিজ্যের মধ্যেও দুস্তর ব্যবধান। একদিকে ভদ্র প্রোগ্রাম আর সিরীয়াস ছবি, অন্যদিকে কমারশিয়াল প্রোগ্রাম আর নিম্নমানের ছবি। এপার আর ওপার। তেমনি, গণমাধ্যমগুলির বিকাশও এসব দেশে অসম—কোথাও রেডিও এগিয়ে আছে, কোথাও টেলিভিশন, ফিলম আধাআধি কোথাও-বা। তার অর্থ এই নয় যে মিডিয়ার সব বাহুকেই সমবাহু হতে হবে, আর তা সম্ভবও নয়। তবে সমানানুপাতিক হওয়া অবশ্যই জরুরি। যে-যার নিজের এলাকায় মজবুত হয়ে গড়ে উঠবে, পরস্পরকে মদত দেবে সর্বশক্তি নিয়ে, একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলবে, তবেই, বহু-র সহযোগে, বহুবচনাত্মক মাস-মিডিয়া যথার্থত হয়ে উঠবে মাসের মিডিয়াম, জনগণের মাধ্যম।

এ-আকাঙ্ক্ষা অবশ্য পরিপূর্ণতার, পারফেকশনের পর্যায়বাচী, যা সহজলভ্য নয়। এবং ভেদ-ব্যবধান উন্নত দেশেও আছে, রোগা-মোটা-সরু নানা দাগের। এবং তা থেকে আরেক ধরনের শ্রেণীভেদ—ইতির ও নেতির। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের নেতির দিক : ক্রাইম-সেকস-ভায়োলেনস, ছড়াছড়ি। তথ্যত, ভায়োলেনস সমাজেরই অবদান, অস্থির সমাজের। সেখান থেকে মাস-মিডিয়া তুলে নিয়ে আসে, আবার ছড়িয়ে দেয় বৃহত্তর জনসমাজে, সাহিত্য নাটক ছবি টিভির মারফত। এবং কমিকস : জাদু মীথ অপবিজ্ঞান ভূতপ্রেত দৈব জন্মান্তর কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ভবিষ্যকল্পনা মারদাঙ্গা ভাঁড়ামি যৌনতা নগ্নতা, সব মিলিয়ে এক অসম্ভব অবাস্তব অ-মূল জগতের জগাখিচুড়ি, যার নেশায় বুঁদ যুদ্ধভীত আশা-হত মারখাওয়া মানুষ, পুনশ্চ বাস্তবে ক্রাইম-প্রয়াসী যে-যার নিজের অভাব আর চাহিদা মতো। নির্ভেজাল গুড নিউজ ইংলন্ডেও চলে নি। পরিবেশ-দূষণের ওপর টিভি প্রোগ্রাম দর্শককে ক্ষিপ্ত করে, বিরক্ত করে বিবিসির জাতিবিদ্বেষ-বিরোধী অনুষ্ঠানসূচী, বিস্রস্ত করে মিডিয়াদের আপোসে লড়াই, যেমন করে একই দাম্ভিক কণ্ঠে পেশীর আস্ফালন আর শান্তির ললিত বাণীর যুগপৎ উচ্চারণ!

ইতির দিকেও পাল্লা ভারি—'এয়ারপোর্ট'-এর বিপ-রীতে 'স্পেস অডিসি', 'সেক্সপ্লয়টেশন'-এর বিপ্রতীপে ' হুসরে বেলথযার', 'ব্লাডি মনডে'র বিরোধিতায় কানাডা ব্রডকাস্টিংয়ের 'সানডে মর্নিং', 'ডিস্‌কো ড্যান্‌স্‌'-এর মোকাবিলায় বিবিসিরই 'থার্ড প্রোগ্রাম', 'দ্যাট্‌স্‌ এ ম্যাড্‌ ম্যাড্‌ ওয়ার্লড্‌'-এর জবাবে কেনেথ ক্লার্কের আর্ট ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর ধারাবাহিক টিভি সিরিজ। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম যেখানে শিল্প, সেখানে সে সমাজকে দেখায়, বিশ্লেষণ করে, বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে জনপ্রিয় আদর্শকে প্রিয়তর করে, হাত বাড়িয়ে দেয় সমস্যার মোকাবিলায়, ভায়োলেনস-দমনে, যুদ্ধের বিপক্ষ-চারিতায় : 'হিরোশিমা মন অ্যামুর, ওয়র গেম, ভিয়েৎ-নাম নিউজ রীল, দ্য ডে আফ্‌টার, নাযারিন'—অসংখ্য। লাতিন আমেরিকান চলচ্চিত্র জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার, আফ্রিকায় মাস মিডিয়া জীবনদর্শনের, প্রশান্ত মহা-সাগরের দ্বীপে-দ্বীপান্তরে জীবনরচনার।

আসলে, মানুষই স্রষ্টা-প্রয়োগকর্তা-উপভোক্তা। যে-কোনো হাতিয়ার বা মাধ্যমের মতো ইলেকট্রনিক মাধ্যমও তার বিনীত গোলাম। শিক্ষা প্রচার মনোরঞ্জন বিনোদন বিনিময় শিল্প—সকল ক্ষেত্রেই সভ্যতাকে সংস্কৃতিমান করে তোলার ক্ষমতা আর প্রতিজ্ঞা নিয়েই তার জন্ম-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণ। এবং জনকের হাতেই জাতকের ভবিষ্যৎ। একে দিয়ে সে বিশ্ববিধ্বংসের, আত্মহননের চিত্রনাট্য রচনা করবে, অথবা আত্মোন্নতির, নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার ফীচারাইয্‌ড্‌ প্রোগ্রাম, সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মানুষকেই। এবং এখনই ॥

মৃত্যুর আগে

অসীম রায়

'আজ আমি ডেকেছি আপনাদের'—এটুকু বলবার সঙ্গে সঙ্গেই সে নার্ভাস হয়ে পড়ে। কারণ এইরকম হার্ট কন্ডিশানে এত বড়ো প্রেস কনফারেনস ডাকা যায় না। তার চোখ দুটো এই সুদৃশ্য কাঠের প্যানেলে আঁটা প্লান্টার্স ক্লাবের নারসিংহোমের দশ নম্বর ঘরে চারদিকে ঘুরে আসে, যেন সে খানিকটা সোয়াস্তি চায়। কারণ তার খাটের সামনেই ঘোড়ার খুরের মতো টেবিল (এ টেবিলটা কখন এল?) আর সেই টেবিলের ওপাশে বেসব মুখ তাদের ছবি প্রায় রোজ দৈনিকের প্রথম পাতায় বেরোয়।

এবার সে গলা ঝাড়ে। গত রাতের বুকচাপা শ্লেষ্মার ভাব এখনও কাটে নি। 'আজ আমি ডেকেছি আপনাদের...'

এবার ঠিক তার উলটো দিকে বসা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তাকে সাহায্য করেন। চাঁছা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ বলুন, কেন ডেকেছেন আমাদের।' তারপর হাত ঘুরিয়ে তাঁর পুরুষালি ঘড়িটা এক ঝলক দেখে বললেন, 'একটু তাড়াতাড়ি করবেন, প্লিজ। ন্যামের ডেলিগেটরা নামছে। আমাকে এখনি পালামে দৌড়তে হবে। ফিডেল কাস্ট্রো আসছে।'

'আমি বলছি বলছি'—সে তার হাতখানা তুলে বললে। 'মানে পারসোনাল ব্যাপার কি না। তাই কিভাবে আরম্ভ করব ভাবছি।'

পাশ থেকে পশ্চিমবাঙলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বললেন, 'দেখুন, পারসোনাল প্রবলেম শোনবার আমাদের সময় নেই। আমাদের অনেক কাজ।'

'লেট হিম স্পীক জ্যোতি', প্রধানমন্ত্রী ভারি সুন্দর মিষ্টি হেসে বললেন।

এইবার সে প্রচণ্ড উল্লসিত হয়ে পড়ে। কারণ যাদের একবিন্দু ফুরসুত নেই, যারা বলতে গেলে সারা ভারতবর্ষ চালাচ্ছে তারা বাধ্য হয়েছে তার মতো এক হরিদাস পালের প্রেস কনফারেনসে আসতে। কারণ তার অবচেতনের মোহিনী শক্তি তাঁদের টেনে নিয়ে এসেছে তার কাছে এই দার্জিলিঙে নভেম্বর মাসে। এ শক্তির এমনই টান যে তাঁরা এখন কার্যত বন্দী। তার অনুমতি ছাড়া তাঁদের এ ঘর ছাড়ার ক্ষমতা নেই।

চাপা হাসি তার মুখে ফুটে ওঠে। গত রাত্তির নটায় তাদের গেস্ট হাউসে সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটে যাবার পর থেকে সকলকেই কিরকম নাবালক নাবালিকা লাগছে, তার সামনে যারা বসে আছে মানে ইন্দিরা গান্ধী, জ্যোতি বসু, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, অটলবিহারী বাজপাই, প্রণব মুখার্জি, চন্দ্রশেখর—সবাই এলেবেলে। সবাই মৃত্যুর দোলনায় দুলছে।

চট করে সে তার বক্তব্যে এসে পড়ে, 'কাল ঠিক রাত নটায় কাণ্ডটা ঘটল। সর্দিকাশি নিয়ে এসেছিলাম। সারা রাত নাক দিয়ে জল পড়ছে, এপাশ ওপাশ করছি গ্রি টায়ারে।'

ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি অসহিষ্ণুভাবে তাঁর পাইপটা নাড়াচাড়া করেন। একবার নিজের অজ্ঞাতে মুখে ঢুকিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বাচ্চা ছেলেদের মতো নামিয়ে নেন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে বলতে থাকে, 'ক্যাডেন্ডারের দোতলাটা আমার একটা প্রিয় জায়গা ছিল। ১৯৬২-তে গীতা আর বড়ো দুই ছেলেকে নিয়ে যখন এসেছিলাম তখন সেই দোতলার খোলা বারান্দায় কফি খেতে-খেতে চারপাশের ভিড় দেখতে খুব ভালো লাগত। বোধহয় সেই স্মৃতি মনের মধ্যে ছিল। কালও সন্ধের সময় ছেলেদের নিয়ে কফি খাচ্ছিলাম। আকাশ খুব পরিষ্কার। কাঞ্চনজঙ্ঘার নীচেটা অন্ধকার, কিন্তু ঝকঝক করছে সমস্ত দিকগুলো। আস্তে আস্তে নভেম্বরের ঠাণ্ডা নামছে বুঝতে পারছি। নীচে নেমে এলাম। রাস্তায় কারবাইডের আলোয় নেপালি মহিলারা জাপানি 'উইন্ড চিটার', উলের জামা বিক্রি করছে। আমি একটা দোকানের নীচে দাঁড়িয়ে এই নেপালি শহরটায় লোকজনের আনাগোনা দেখতে থাকি।'

'নেপালি শহর কেন বলছেন?' ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা অটলবিহারী বাজপাই বললেন। কাগজের ছবির চেয়েও আরো মোটা লাগছিল তাঁকে।

'হ্যাঁ', ছেলেবেলায় যখন আসতাম তখন সাহেবদের শহর মনে হত দার্জিলিঙ। এখন এটা নেপালিদের শহর, আর কিছু অবাঙালি কনট্রাক্টরদের শহর। পশ্চিমবাঙলার শহর বলে মনে হয় না।'

'আপনি কি আমরা-বাঙালী?' জ্যোতি বসু ফট করে প্রশ্ন করেন।

'আমরা-বাঙালী-তোমরা-বাঙালীর ব্যাপার না, যা ঘটনা তাই বলছি। রানীখেত-নৈনিতাল গেলে মনে হয় না এটা কেবল কুমায়ুনিদের শহর। দার্জিলিঙে এলে মনে হয় এটা নেপালের অংশ, বাঙালিরা ফরেনার।'

জ্যোতি বসু আবার কী বলতে চাইছিলেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি একটু তাড়াতাড়ি করুন। ফিডেল কাস্ট্রো আসছে। আমাকে যেতেই হবে এয়ারপোর্টে।'

আবার সেই চাপা উল্লাস তার মনের মধ্যে ফিরে আসে। কারণ এদের সকলের পা ক্লিপ দিয়ে আঁটা। বোতাম টিপে সে এঁটে দিয়েছে এদের পা। কোনো উপায় নেই, তার কথা এদের শুনতেই হবে।

'আসলে ভেবেছিলাম কলকাতায় ফিরে আমি একটা পেপার লিখব—মৃত্যুর আগে। আর সেটা টাইপ করে আপনাদের সবাইকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আপনাদের এত কাজ। তা ছাড়া আপনাদের সেক্রেটারি হয়তো সেটা ওয়েস্টপেপার বাসকেটে ফেলে দেবে। সেইজন্যে বাধ্য হয়ে—কিছু মনে করবেন না...'

'আরে বোলো বোলো', অটলবিহারী বললেন।

'একটা সস্তা উলের জামা নিয়ে তিন ছেলের সঙ্গে যখন ম্যালে ফিরলাম তখন ম্যাল প্রায় ফাঁকা। ভয়ানক ঠাণ্ডা লাগছিল। একটা ছোটো রামের বোতল কিনলাম।'

জ্যোতিবাবু বললেন, 'ও ব্যাপারটা আপনারও আছে?'

'আরে পিও পিও, কোই বাত নেঁহি', অটলবিহারী বললেন।

'ও ব্যাপারটা আপনার আমার সকলেরই একটু-আধটু আছে।'

ম্যাডাম জ্যোতি বসুর দিকে চেয়ে বললেন, 'লেট হিম স্পীক।'

'যে কথাটা আপনাদের বলি নি। আপনাদের মতো ফাইভস্টার হোটেলে থাকার সৌভাগ্য তো আমার নেই। অফিস যা পয়সা দেয় তাতে ছেলেপুলে নিয়ে লো বাজেটে বেড়ানো। কিন্তু এত চমৎকার গেস্ট হাউসের ঘর আমি কখনও পাই নি। যেন একটা ভাসন্ত কাঁচের ঘর, নীচে থাকে-থাকে বাগানবাড়ি, ওপরেও থাকে-থাকে বাড়ি গাছ পাহাড়। পাহাড়ে তখন আলো জ্বলছে। বোধহয় দেওয়ালি আসছে। পটকা বোমা ফুটছে, একটা ভ্যালির আওয়াজ আর-কটা ভ্যালিতে প্রতিধ্বনিত। দুপুরে সামনের বারান্দায় রোদ পোয়াতে-পোয়াতে এই

ভাসন্ত ঘরখানা থেকে চারপাশটা দেখতে চোখের খুব আরাম হচ্ছিল। কিন্তু এখন সন্ধেবেলা। চারদিকে প্রবল ঠান্ডা, কয়েকটা মাত্র পাতলা কম্বল। রান্নাবাড়ি না করে ক্যাভেন্ডার থেকে যে স্যালোমি আনা হয়েছিল তাই রুটি মাখন দিয়ে খেয়ে নেওয়া গেল। আর তার সঙ্গে এক পেগ নীট রাম খেলাম, কলে জল ছিল না।'

পাইপটা নাচিয়ে ভারতের অর্থমন্ত্রী বললেন, 'এত ডিটেলে কী দরকার? কাল সকালে আমাকে বেরোতে হবে, জাপানে ইনডিয়ান ডেলিগেশান লীড করতে যাচ্ছি। একটু হোমওয়ার্ক করা দরকার।'

'ওগুলো আপনার সেক্রেটারিরা করে দেবে। এখন যা বলছিলাম শুনুন...বিছানার লাগোয়া বিরাট কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যায় বাইরে অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে সারি-সারি আলো ফুটেছে, কিন্তু আমি ঠিক ঘুমোতে পারছিলাম না। বড়ো ছেলে ভদ্রলোক, কিন্তু মাঝে মাঝে সে একটু ফাজিল ইন্টেলেকচুয়াল হয়ে পড়ে। ঘুমোনোর আগে তার হেঁড়ে মাথাটা আমার দিকে নামিয়ে বললে, 'তুমি কি শিল্পসাহিত্যের ওপর কিছু বক্তব্য রাখবে?' তারপর পাতলা লাল কম্বলখানা মুড়ি দিয়ে ওপাশ ফিরে শোয়। ছোটো ছেলে তার বান্ধবীকে চিঠি লিখতে বসেছে। আর মেজো ছেলের খবরের কাগজের কাজ, নাইট ডিউটি দিয়ে ভোর রাত্তিরে বাড়ি ফেরে মাসের মধ্যে অন্তত পনেরো দিন, তার ঘুম আসছে না। সে একটা ফেল্ট পেন দিয়ে ইংরেজি দৈনিকের ভুল বাছে। এই প্রথম মনে হতে থাকে আমার শরীরের একটা আলাদা অস্তিত্ব, তা মন থেকে আলাদা। মনটা বসাবার জন্যে আমি ঘরে ঢুকেই সুটকেস খুলে গীতার যে ফটোখানা তাকের ওপর তুলে রেখেছিলাম সেদিকে চেয়ে থাকি। দু বছর আগে সাঁওতাল পরগনায় মধুপুরে সন্ধে সাতটার সময় গীতার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেই গীতা বললে, 'আমি আর বাঁচব না।' আর আমি হাবার মতো তার সামনে বসে আছি। অন্ধকারে লন্ঠনের আলো বাতাসে কাঁপছে। মেজো ছেলে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আমি তোমার খাটটা দেয়ালে লাগিয়ে দিচ্ছি।' আমার কথা না শুনেই সে খাটটা ঠেলে বালিশ পিঠে দিয়ে বসিয়ে দেয়। ইংরেজির পোকা বাছতে-বাছতে সে মাঝে-মাঝে আমার দিকে তাকায়। আর আমার মনে হতে থাকে একটা বড়ো কিছু আসছে। এবং মনে হওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই গলা বন্ধ হয়ে গেল। আমি নিঃশ্বাস নেবার জন্যে ঘাড় এদিক-ওদিক করি, কিন্তু কিছু হয় না। নিঃশ্বাস বন্ধ। পরে ভেবে দেখেছিলাম। আপনাদের হয়তো কলেজে-পড়া সেক্সপীয়র মনে নেই। মেশার ফর মেশারে ক্লডিও বলছে না—এক মুহূর্তের মধ্যেই মাটির ঢেলা হয়ে পড়ব—তার থেকে আরও জোরাল অনুভূতি স্পষ্ট বুঝতে পারি, মৃত্যু দৃঢ় আঙুলে আমার গলা টিপে ধরেছে, আমার শ্বাসনালী একেবারে বন্ধ। আমি দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার করি, 'জানলা খুলে দে, জানলা খুলে দে!' ভীত চকিত বড়ো ছেলে উঠে আর্তমুখে চেয়ে থাকে। ছোটো ছেলে পাজামা ছেড়ে প্যান্ট পরতে থাকে। মেজো ছেলে আমাকে দাঁড় করিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, 'মামণি, বুবাইকে বাঁচিয়ে দাও।' সে আমার বুকটা মালিশ করে। কিন্তু কিছু এসে যায় না। শ্বাসনালী তেমনি বন্ধ। আমি গীতার ফটোর দিকে চেয়ে থাকি। ১৯৬২ সালে দার্জিলিঙে বটানিকাল গার্ডেনের অরকিড হাউসে তোলা ছবি। সেই উদগ্রীব মুখখানার মাঝখানে আমি আশ্রয় খুঁজি, কিন্তু বটানিকাল গার্ডেনে অরকিড হাউসের বদলে আমি গীতাকে মধুপুরের সন্ধ্যায় লন্ঠনের আলোয় দেখতে পাই। খোলা জানলা দিয়ে প্রচন্ড ঠান্ডা আসে। কিন্তু তাতে কোনো আরাম নেই। আরাম মানে খাওয়া নয়, পান করা নয়, সংগম নয়, আরাম মানে নিঃশ্বাস—এই কথাটার প্রচন্ডতা মর্মে মর্মে অনুভব করি।'

সে যেন এতক্ষণ ঘুমের মধ্যে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল। এখন চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলে ডক্টর প্রেমবা। ডুয়ার্স অ্যান্ড দার্জিলিঙ নারসিংহোমের সুপারিনটেন্ডেন্ট, নেপালি এফ আর সি এস ডাক্তার।

'হাউ আর ইউ, মিস্টার রে?' লম্বা-চওড়া ফরসা হাসিখুশি-ভালোবাসি চেহারা। পাশে মোটাসোটা মেট্রন। এখন খেয়াল হয় কাল রাতে যখন মেডিকেল চেয়ারে করে তাকে ওপরে তোলা হল তখন এই নেপালি মহিলাটিই তাকে অকসিজেন দিয়েছে।

'এনি ফীলিং অব চোকিং?'

'নো।'

'ইউ নিউ ডেসমন্ড ডয়েগ? হি ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড।'

প্রেমবাকে সে বললে তিরিশ বছর আগে তার প্রথম ফীচারে ডেসমন্ড ছবি এঁকেছিল।

'ইজ দ্যাট সো?'

তার মাথার পেছনে যে ভাঁজকরা কাঠের বেডরেস্ট ছিল তা আরও নামিয়ে দেয় মেট্রন, তাতে সে আরাম বোধ করে।

'হ্যাড গুড স্লীপ?'

'ইয়েস।'

ডক্টর প্রেমবা হঠাৎ বললে, 'হাউ ওল্ড আর ইউ?'

'ফিফটি সিক্স।'

'নট ওল্ড ইয়েট।'

সে হেসে বললে, 'নট ইয়ং আইদার।'

কাঠের মেঝেতে খটখট ধ্বনি তুলে তারা বেরিয়ে যায় পাশের কেবিনে যেখানে এক রুগী সকাল থেকে ঢেঁকুর তুলে যাচ্ছে। রাজপুত্রের মতো দেখতে একটি নেপালি তরুণ ঘরে ঢোকে, ধবধবে সাদা পোশাক, মাথায় কালো টুপি। হিন্দিতে জানালে গোসল দেবে সে। কলাইয়ের বোলে গরম জলে সাদা তোয়ালে চুবিয়ে নিংড়ে তার ঘাড় মাথা পা স্পনজ করে যুবকটি। সে চোখ বুঁজে থাকে আরামে। এরপর নারসিংহোমের লম্বা ফুলকাটা রঙিন পানজাবি তাকে পরানো হয়। এই ঢোলা পোশাকটা তার বেশ পছন্দ হয়ে যায়। একটু ঝিম এসেছিল। হঠাৎ মুখে একটা কী ঠেকতেই দেখলে থারমোমিটার। হাই হিলে ঘুটঘুট আওয়াজ করে সাদা ফ্রকের ওপর নীল ফুলহাতা সোয়েটার-পরা নারসটি কখন এসেছে খেয়াল করে নি। থারমোমিটার দেখার পর ব্লাডপ্রেসার টেস্ট।

'তোমার নাম কী নার্স?' সে ইংরেজিতে আলাপ শুরু করে।

ঢ্যাঙা রোগা মহিলাটি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করে। 'ডিড ইউ পাস ইওর স্টুল?'

সে স্তম্ভিতভাবে চেয়ে থাকে। এইরকম খোলা জায়গায় যেখানে ঘরখানা পরদা দিয়ে দুভাগ করা সেখানে ওসব জিনিস হয় না তার, এটা ভাবলে বুঝিয়ে বলবে নারসকে। কিন্তু সে কাগজে ঘসঘস করে নোট করে বললে, 'ডু দ্যাট, ইউ উইল হ্যাভ স্টুল একজামিনেশান।'

ঘণ্টাখানেক ঝিম মেরে বসে সে তার অসমাপ্ত প্রেস কনফারেনসের কথা ভাবছিল। এমন সময় আবার সেই নেপালি রাজপুত্রের প্রবেশ। ট্রেতে ধূমায়িত চিকেন সুপ। তার জিভের আরামের সঙ্গে-সঙ্গে উদ্বিগ্নতা বাড়ে। নারসিংহোমের উপরি খরচ তো সে সঙ্গে আনে নি। ছেলেরা নিশ্চয় খিচুড়ি খেয়ে কাটাচ্ছে। খাবার পর বেশ একটা আরামের ঝিম নামে। আর সেই চটকা কেটে যায় ই এম এস নামবুদ্রিপাদের গলায়। প্রচন্ড তোতলামিতে আটকে যাচ্ছে কিন্তু তাঁর কথার এমন একটা সীরিয়াস ঝোঁক আছে যে শ্রোতারা শুনতে বাধ্য।

'আমারও একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে কোনো মেটাফিজিকাল চিন্তার অবকাশ নেই। আমার কাছে ডেথ ইমপর্টান্ট নয়, লাইফ ইমপর্টান্ট।'

সে এবার নড়েচড়ে বসে বললে, 'আমার কাছে কেন দুটোই ইমপর্টান্ট সেটাই বলবার জন্যে আপনাদের ডেকেছি। অনেক বছর আগে ইটালিতে একটা মাইন ডিসআস্টার হয়েছিল। তিনজন খনিশ্রমিক মারা গিয়েছিল। তিনজনই কমিউনিস্ট। আপনাদের পার্টির নেতা তগলিয়াত্তি সেই মৃতদের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিয়েছিল। বোধহয় ফরাসি জারনালে পড়েছিলাম সেই রিপোর্ট। তগলিয়াত্তি বলেছিল—কমরেড, উই আর সায়লেন্ট বিফোর দ্য ইটারন্যাল মিস্ট্রি অব ডেথ। আমি সেই ইটারনাল মিস্ট্রির কথাটা শোনাবার জন্যে আপনাদের ডেকেছি।'

'ইটারনাল নিয়ে আমরা ভাবি না।'

'কেন ভাবেন না? ভাবতে হবে।'

'লেট হিম প্রোসীড'—আবার মিষ্টি হেসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বললেন।

'আবার তাহলে শুরু করি যেখানে শেষ করেছি। আমার ছোটো ছেলে ফাঁকা ম্যালে দৌড়চ্ছে উদভ্রান্তভাবে ডাক্তারের সন্ধানে। কোথায় ডাক্তার তার কিছু জানা নেই। এমন সময় পুলিসের জিপের আলো তার মুখের ওপর এসে পড়ে। পুলিস অফিসার নেমে তাকে চ্যালেনজ করতেই সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ফাদার হ্যাড এ হার্ট অ্যাটাক। এনি হার্ট স্পেশালিস্ট?'

পুলিসের ওসি মিস্টার ছেত্রী বললে, 'গেট ইনটু দ্য জীপ। আই শ্যাল টেক ইউ।' হার্ট স্পেশালিস্ট বঙ্গসন্তান, ডক্টর পাল। ঢ্যাঙা লোকটা দরজা খুলেই বললে, 'আমার শরীর ভালো নেই। এত রাত্তিরে কোথায় যাব?' ছেলের মুখের ওপরেই দরজা বন্ধ করে দিলে। 'বাস্টার্ড!' ওসি গাল পাড়লে। তারপর বললে,

'ভেবো না, এখানে সবচেয়ে ভালো নারসিংহোমে তোমার বাবাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।'

'তাহলে দেখুন, বাঙালি-বাঙালি করে লাভ নেই', জ্যোতি বসু বললেন।

'একশোবার! কোনো লাভ নেই। আমি তো বলি না, আমার মুখে আপনি কথাটা বলাচ্ছেন।'

'বোলিয়ে বোলিয়ে', অটলবিহারী তাঁর মোটা থাবা-খানা নাড়ান।

'এদিকে আমার মনে হল আমার পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। একদম নড়তে পারছি না। 'সরবিট্রেট।' গলা দিয়ে চিঁ চিঁ আওয়াজ বেরোয়। বড়ো ছেলে আরও নার্ভাস। সে খুঁজতে গিয়ে তাকের ওপর থেকে ট্যালকাম পাউডার ফেলে দেয়। মেজো ছেলে সমানে কাঁদে হুহু করে। সে আবার কালীভক্ত। কাঁদতে-কাঁদতে চেঁচায়, 'মা কালী, বুবাইকে বাঁচিয়ে দাও।'

'আর একটু কার্ট শর্ট করুন,' ভারতের অর্থমন্ত্রী বললেন।

সেদিকে দৃকপাত না করে সে বলে, 'সর্বিট্রেট ট্যাবলেট মুখে দেবার সময় মনে আসে গীতাকেও এই ট্যাবলেট দিয়েছিলাম, দ্বিতীয় ট্যাবলেট জিভে লেগে-ছিল। আর এখন ভাবছিলাম ইতিমধ্যেই গীতার সঙ্গে মিলিত হতে চলেছি। আর ছেলেদের জন্যে ভয়ানক ভাবনা হচ্ছিল। দার্জিলিঙে শ্মশান অনেক দূরে। এই ঠান্ডায় এত উঁচুনীচু জায়গা দিয়ে আমার বডি কিভাবে নিয়ে যাবে শ্মশানে সেই ভাবনায় বিচলিত বোধ করি। এমন সময় মিসেস ঝা ঘরে ঢোকেন।'

'হু ইজ শী?' ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন করেন।

'মিসেস ঝা গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার। আর মিস্টার ঝা স্থানীয় বড়ো ব্যবসায়ী। মিসেস ঝাকে প্রথমে নেপালি ভেবেছিলাম, কারণ নেপালি মেয়েদের মধ্যে কিছু-কিছু চোখা নাক-চোখ মহিলা দেখা যায়। মিসেস ঝা গুজরাটের বাসিন্দে। এখানে সাহেবদের দুটো চাবাগান, ক্যাভেন্ডার, আরও দু-তিনটে প্রতিষ্ঠান ভদ্রমহিলার শ্বশুর মানে সীনিয়ার ঝা কিনে নিয়েছেন। আসা মাত্রই চাবি খুলে দিয়ে এই সুন্দরী তরুণীটি বলেছিলেন, ট্রেনের টাইমিঙ তিনি জানেন না কারণ তাঁরা প্লেন ছাড়া ট্রাভল করেন না। বাইরের ভাসন্ত বারান্দা যেটা কয়েকঘণ্টা আগে স্বর্গের মতো সুন্দর লাগছিল সেখানে ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাঁপাই মেজো ছেলের হাত ধরে।

মিসেস ঝা বললেন, 'কিছু ভেবো না, নারসিংহোমে ফোন করছি।' ইতিমধ্যে ছোটো ছেলে পুলিস অফিসার এবং আরও কিছু পুলিস কর্মচারী নিয়ে হাজির। এখন কিন্তু নড়বার ক্ষমতা নেই আমার। একটা চেয়ারে বসিয়ে ধরাধরি করে আমাকে জীপে তোলা হল। খাঁ খাঁ ম্যালের ওপর দিয়ে আসবার সময় অদ্ভুত চিন্তা আসে : এইখানে বাল্য আর যৌবনের রঙ্গভূমিতে বিসর্জনের নিঃশব্দ বাজনা বাজছে।

'নাউ হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু ড্রাইভ অ্যাট?' আর একজন লোক যে টেবিলের কোনায় বসে আছেন এতক্ষণ সে খেয়াল করে নি। জনতা পার্টির নেতা চন্দ্রশেখরের দাড়ির অর্ধেকভাগ সাদা হয়ে গেছে।

'আপনি ভালো বুঝবেন চন্দ্রশেখরজী। আপনি দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তরভারত পদযাত্রা করলেন। একটাই তো ব্যাপার দেখলেন—লোকে বেঁচে থাকতে চায়, এই তো?'

চন্দ্রশেখর ঘাড় নাড়লেন।

'আমি তো এই কথাটাই বলছি। দুটো পার্টি আছে—একটা জীবনের পার্টি, আর একটা মৃত্যুর পার্টি। অনেক পার্টির অনেক রকম নাম, অনেক রকম ফ্ল্যাগ। কিন্তু আসলে দুটো পার্টি। এই কথাটা বলবার জন্যেই আমি আপনাদের ডেকেছি।'

এবার সে ক্লান্ত বোধ করে, চোখের পাতা প্রায় বুঁজে আসে। আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা নীল পাখি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পুরো-হাতা-নীল-সোয়েটার-পরা একখানা হাতের চেটোয় অনেকগুলো বড়ি। একটার পর একটা সে খেয়ে যায়। গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে সে মাথা তোলে।

যদিও অনেকটা একইরকম দেখতে, এই নীল পাখিরা কিন্তু একটু আলাদা, চাপা হাসি ঠোঁটের দুপাশে। নাকে ছোট্ট রুপোর রুইতনের ফুল।

'তোমার নাম কী নারস?'

'ঊর্মিলা ছেত্রী।'

'বাঃ, বেশ সুন্দর নাম। বিয়ে করেছ?

'হ্যাঁ, দুবার। তোমার ছেলেরা আসে তোমাকে দেখতে। তোমার বউকে আনো নি?'

'কত বয়েস? এর মধ্যে দুবার বিয়ে?'

'হ্যাঁ, প্রথমটা গুড-ফর-নাথিং। দিনরাত মাল খেত, নোকরি করত না।'

'এখন তোমার স্বামী কী করেন?'

'অফিসার! পুলিশ অফিসার!' মেয়েটির চোখ চকচক করে ওঠে।

এবার সে ঊর্মিলা ছেত্রীর দিকে ভালো করে তাকায়, যাতে আর সকলের একরকম চেহারার মধ্যে সে হারিয়ে না যায়।

ঊর্মিলা তার বাঁ হাতখানায় রবারের পটি বেঁধে পাম্প করতে-করতে ব্লাডপ্রেশার দেখে। আস্তে আস্তে বলে, 'তোমার বউ আসে না?'

'বউ ওখানে।' সে আঙুল দিয়ে কাড়বরগার দিকে দেখায়।

'সরি! তা তুমি আবার বিয়ে কর না কেন? তুমি এখনো ইয়ং আছ।'

'কোনো জিনিস রিপিট করা যায় না।'

মেয়েটি মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'দূর!' তার পরবর্তী ইংরেজি বাক্যটায় জীবনদর্শনের গন্ধ ছিল, 'ইফ ইউ লাভ উওম্যান, ইউ লাভ লাইফ!'

'তোমার কত বয়েস ঊর্মিলা?'

'ঠিক তেইশ। আমি বয়েস ভাঁড়াই না।'

'তোমার বয়সে এমনভাবে আমার মনের কথা একজন অপরিচিত লোকের কাছে বলতে পারতাম না।'

'তুমি রেস্ট নাও, আর বেশি কথা বোলো না।'

ঊর্মিলা যেন হাওয়ায় উড়তে-উড়তে বেরিয়ে যায়। এই নারসিং হোমের সবকটা নারসই কমবয়সী, আর সবকটা নারসের চলনে অ্যাথলিটের ছাপ আছে। যে-কথাটা এসিয়াডে টিভিতে চীনা মহিলা অ্যাথলিটদের দেখে মনে হয়েছিল তার। আশ্চর্য মঙ্গোলীয় শরীরে নিম্নাংশের স্বচ্ছন্দতা, হালকা প্রজাপতির মতো। যেন হাঁটছে না, ভেসে যাচ্ছে।

এবার দুটি সুদর্শন যুবক একটা লম্বা হাতল-ওয়ালা নীচু চেয়ার নিয়ে আসে। তাকে নীচে নামতে হবে, চেস্ট এক্সরে। এই চেয়ারটায় সে ওপরে উঠেছিল। সেটা কবে? তাহলে তিনদিন হয়ে গেছে। মনে মনে তিনদিনের খরচের একটা হিসেব করে।

নীচে খোলা উঠোনে একঝলক নামতেই দেখলে ঝকঝকে রোদে বসে আছে কয়েকটি বৃদ্ধা। নীল আকাশে ঝলমল করছে কাঞ্চনজঙ্ঘা—এই পরিবেশে অন্যের ঘাড়ে চেপে যাতায়াত বড়োই বিসদৃশ।

ওপরে উঠতে না উঠতেই পোর্টেবল ইসিজি মেশিন নিয়ে বঙ্গসন্তান। ব্যাগের উপর নামটা দেখে সে চিনতে পারে ডাক্তারকে। তিনদিন আগে তার ছেলের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল এই বঙ্গসন্তান।

বুকের এদিক ওদিক রবারের নল সাঁটা হতে থাকে। গম্ভীর হয়ে চোখে চশমা লাগিয়ে ইসিজি রিপোর্ট পড়তে-পড়তে ডাক্তার বলে, 'দুটো দিকই ব্লক। আরও কমপ্লিকেশান আছে। আমার কি মনে হয় জানেন মিস্টার রায়, আর দু-তিন দিনের বেশি এখানে থাকবেন না। বুঝতেই পারছেন!'

ম্লানমুখে ছেলেরা আসে। 'আমরা খুব ভালো আছি। কোনো অসুবিধে নেই।' ছোটো ছেলের মুখে চোখে বীরত্ব ঝলকাচ্ছে।

'টাকার অবস্থা তো খুব সুবিধের নয় মনে হচ্ছে। কেবল খিচুড়িই খেয়ে যাচ্ছিস!'

'না না, ডিম খাচ্ছি।' ছেলে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে।

'একটা গগলস্ কিনেছি। জাপানি।'

'বাঃ, বেশ সুন্দর!' সে ভাঁজকরা চশমাটা তারিফ করে। 'আমি এখানে প্রোটেকটেড। তোরা এইবেলা যেখানে যা দেখবার দেখে নে। আর মরব না মনে হচ্ছে।'

সেদিন চমৎকার চিকেন রোস্ট দিলে। ডেসমন্ড ডয়গের বন্ধু বলায় তার খাতিরটা বেড়ে গেল নাকি? নার্সরা ঘনঘন আসছে। ডক্টর প্রেমবা দুবার করে আসছে। মেট্রন সন্ধে হতেই গরম জলের ব্যাগ পায়ের কাছে দিয়ে গেল। পেচ্ছাপ করার সঙ্গে-সঙ্গেই পেচ্ছাপ-পাত্র খালি, ঘন্টি দেবার দরকার নেই। ভোরবেলা বোধহয় সাড়ে পাঁচটায় নেপালি রাজপুত্র বিছানা ঝেড়ে পালটে দিলে নতুন চাদর, ফুলকাটা নীল নতুন ঢোলা পানজাবি পরিয়ে দিলে পুরনো জামা ছাড়িয়ে।

পরদিন নতুন জামা গায়ে সে ঘরের মধ্যে একটু হাঁটবার চেষ্টা করে। সেই পক্ষাঘাতের ভাবখানা কেটে যাচ্ছে। আর একদিন পরেই দেওয়ালি। সামনে নীচু জানলায় গিয়ে সে বসে। নীচ দিয়ে হিলকার্ট রোড। স্বচ্ছ নভেম্বরের আলোয় ঝলমলে সকাল। পুজোর

বাঙালি ক্রাউড একেবারেই নেই, বোধহয় একশোটা পথিকের মধ্যে একজন বঙ্গসন্তান। উলটো দিকে একটা লম্বা-সাদা ফেসটুনে মকাইবাড়ি টী এস্টেটের চায়ের বিজ্ঞাপন, বন্ধ দরজার সামনে কয়েকজন ক্রেতা জটলা করছে। একজন বৃদ্ধ নেপালি সামনের দোকানে টিনের ছাতে টুনি বাল্ব লাগাচ্ছে। খটখট করে কাঠের মেঝেতে জুতোর শব্দ আসে। ডক্টর প্রেমবা, অন্য দিনের চেয়ে হাসিখুশি ভাবখানা কম।

'তোমার ইসিজি রিপোর্ট দেখলাম, প্যানিকের কিছু নেই। তবে তোমার লং রেস্টের দরকার। এখানে তো সেটা সম্ভব হবে না। কাজেই কলকাতায় ফিরে যাও দু-একদিনের মধ্যে।'

'আমি পরশু ট্রেনের টিকিট রিজার্ভেশানের জন্যে বলেছি, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে।'

'আমি সাজেস্ট করছি তুমি প্লেনে যাও। প্লেনে যাতায়াতের হয়রানি কম।'

সে চুপ করে থাকে। নারসিং হোমের ছ-সাত দিনের খরচা মিটিয়ে হাতে বেশি থাকবে না। তা ছাড়া সে একলা যেতে পারবে না, দুটো প্লেনের টিকিট অসম্ভব।

ডক্টর প্রেমবা বললে, 'ঠিক আছে। যেমন ভালো বোঝ। খুব কেয়ারফুলভাবে যাবে। কোনো জিনিস টানবে না। শিলিগুড়িতে আমি ডক্টর বিশ্বাসকে চিঠি দিয়ে দেব। যদি শরীর খারাপ বোধ কর...'

'বোধহয় দরকার হবে না। অনেকটা সুস্থ বোধ করছি।'

'ইউ নেভার ক্যান টেল।' ডক্টর প্রেমবাব আপ্তবাক্য উচ্চারণ করলে। বার্নার্ড শর একটা নাটকের নাম না?

বিকেল পড়ে আসছে। এতক্ষণ সে চোখ বন্ধ করে তার শৈলাবাসে গত কয়েকদিনের কথা ভাবছিল। ইংরেজদের তৈরি এই কাঠের বাড়িটার সঙ্গে এক পরম আত্মীয়তা বোধ করছিল সে। চোখ খুলতেই অবাক। আবার সেই অসমাপ্ত প্রেস কনফারেনসে এসে পড়েছে।

'তাহলে তুমি কী বলতে চাও?' ইংরেজিতে বললেন ই এম এস নামবুদ্রিপাদ, 'হোয়াট আর ইউ ড্রাইভিং অ্যাট?'

সে আবার ধীরভাবে এই সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের দিকে তাকায়। তার কথাবার্তার সামান্য প্রভাব পড়ে নি কারো মুখে। প্রধানমন্ত্রী করুণার হাসি হাসছেন, কেউ কেউ নিস্পৃহ, কেউ অসহিষ্ণু।

'আমার যে ঘটনাটা ঘটেছিল—অর্থাৎ মৃত্যুর স্পর্শ—সেই গলার কাছে কুয়াশা বলুন বা গলা টিপে ধরার যে কষ্ট তা দেখুন আমাদের সকলেই এখানে যারা আছেন—আগামী দশ বছরের মধ্যে—বোধহয় সকলকেই ভোগ করতে হবে। একটু এদিক ওদিক, আর কী!'

'আমারও হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে', নামবুদ্রিপাদ বললেন।

'আমারও', অটলবিহারী জুড়ে দেন।

'তাহলে দেখুন!'

'কী দেখব? আপনি মিস্টার রায় কী বলতে চান একজ্যাক্টলি?' ভারতের প্রধানমন্ত্রী চোখা প্রশ্ন করেন।

'আমি বলতে চাই মৃত্যু যখন দাঁড়িয়ে আছে তখন... তখন যেসব মৃত্যু অ্যাভয়ডেবল সেগুলো বাদ দেওয়া যায় না? এই যেমন নিজেদের মধ্যে আপনারা লড়াই করেন—প্রচুর কর্মী মারা যায়—এগুলো আটকানো যায় না?'

'আপনি ভাবুক লোক। কিন্তু আপনি ঠিক পলিটিকাল এলিমেন্ট নন।' অটলবিহারী বললেন।

'দ্যাটস রাইট,' ভারতের প্রধানমন্ত্রী সায় দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট অকমিউনিস্ট সবাই মাথা নাড়লেন।

অটলবিহারী তাকে সান্ত্বনা দিলেন, 'ভার্তীয় শাস্ত্রমে সব লিখ দিয়া। আত্মা অবিনশ্বর! নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ—গীতামে লিখা নেহি?'

'আপনি গোলমাল করে দেবেন না। আত্মা-টাত্মা আমি ঠিক বুঝি না। আমাদের কলকাতায় তো প্রায়ই লোডশেডিং, স্ত্রী চলে যাবার পর একলা অন্ধকার ঘরে বসে-বসে ভাবতাম এখনই স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে—যেরকম সব ভৌতিক নাটকে লেখে। ওগুলোর আসলে কোনো মানে নেই। মৃত্যুটা এত পাওয়ারফুল যে তার সামনে কিছুই দাঁড়ায় না।'

চন্দ্রশেখর বললেন, 'তাহলে কি আমরা হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব?'

'ঠিক উলটো। তার জন্যে আপনাদের নতুনভাবে ভাবা দরকার। রাজনীতি একটা থিং-ইন-ইটসেল্ফ নয়, স্বয়ম্ভু ব্যাপার নয়। মানুষের মঙ্গল, মানুষের ভালোবাসার ওপর রাজনীতি দাঁড় করাতে হবে। পার্টির ওপরে মানুষ, মানুষের ওপরে পার্টি নয়। আমি জানি আপনারা এগুলো মানবেন না, তার ফলে কারচুপি-তঞ্চকতায় দেশ ভরে গেছে। বেশির-ভাগ সৎ বিবেকবান লোকেরা রাজনীতি থেকে সরে আসছে। আপনাদের পলিটিকাল এলিমেন্ট কারা—সৎ বিবেকবান মানুষ, না, যারা স্কাউন্ড্রেল?'

থমথমে ভাব নামে। সে নিজেও ক্লান্ত বোধ করে। আবার হার্ট অ্যাটাক না হয়! আস্তে আস্তে বলে, 'আপনাদের খুব কষ্ট দিলাম। মাপ করবেন। আমি জানি আমার কথা আপনাদের কানে পৌঁছবে না, এক কান দিয়ে শুনে আর-এক কান দিয়ে বার করে দেবেন। যাই হোক, আপনারা এই প্রেস কনফারেনসে এসেছেন বলে আন্তরিক ধন্যবাদ। কিছু খাওয়াতে পারলাম না। নারসিংহোমে ভিজিটারদের জন্যে সে ব্যবস্থা নেই।'

বোতাম টিপবার সঙ্গে-সঙ্গে পায়ের আংটা খোলার ধাতব শব্দ ওঠে। আর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে তার চোখের সামনে। ঠিক ফিল্ম আর ছবিতে মহাকাশযানের মধ্যে মহাকাশচারীদের শূন্যে প্রলম্বিত শরীরের মতো ভাসমান হয়ে ওঠে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের শরীর। সবচেয়ে লাবণ্যময়ী ভঙ্গিতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পাশ ফিরে হাতদুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে সেই খোলা নীচু জানলার আয়তক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে ভাসতে-ভাসতে বেরিয়ে যান। ভারতের অর্থমন্ত্রী তাঁর পেছনে যাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তার আগেই তাঁকে ঠেলে স্থান করে নেন পশ্চিমবাঙলার মুখ্যমন্ত্রী, ভাসন্ত তিমিমাছের মতো অটলবিহারী চিত হয়ে ভাসতে-ভাসতে বেরিয়ে যান। ঘর নির্জন হয়ে পড়ে।

গরম ভেজা তোয়ালের স্পর্শে সে ধড়মড় করে উঠে বসে।

'গোসল দেঁতা হ্যায় সাব,' নেপালি রাজপুত্র বললে।

'কটা বাজে।'

'পাঁচ।'

এত ভোরে আরাম করে একপট চা খেয়ে সে জানালায় গিয়ে বসে। মকাইবাড়ি টী এস্টেটের চায়ের খদ্দেররা ভিড় করছে। একটা দুটো সাহেব মেমসাহেবও দেখা যায়। জাফরানি আলখাল্লা পরে কয়েকজন নেড়ামাথা তিব্বতী লামা চলেছে, পেছনে দুই-ঝাঁকা-ভর্তি রঙবেরঙের ফুল চলেছে।

ছেলেরা এসে পড়ল। বেশ কিছু সওদা করেছে গরম জামা। ছোটো ছেলে জানালে, নারসিংহোমে পেমেন্ট চুকিয়ে দিয়েছ। দুপুরে ট্যাক্সি নিয়ে আসবে। আগামী কাল ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না সকালে। কারণ সেদিন ভাইটিকা, মাল খেয়ে সমস্ত ড্রাইভার চুর হয়ে থাকবে।

আবার ডক্টর প্রেমবা আর মেট্রন আসে। মেট্রন বললে, 'তোমাদের যাওয়ার আগে আমি তোমাদের জন্যে প্রার্থনা করব।'

ছেলেরা চলে যাবার পরও সে অনেকক্ষণ জানলা থেকে গলা বাড়িয়ে রৌদ্রঝলকিত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে। এই বোধহয় তার শৈলাবাস থেকে চিরবিদায়, কারণ হার্টের রুগীর পক্ষে আর পাহাড়ে আসা সম্ভব নয়।

খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করতে না-করতেই কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আসে। ছেলেদের সঙ্গে মেট্রন আর ঊর্মিলা।

মেট্রন তার চোখ বন্ধ করে প্রেয়ার শুরু করে : আজ কয়েকদিন আমাদের নার্সিং হোমে থাকার পর মিস্টার রায় তার তিন ছেলেদের নিয়ে নীচে নামছে। প্রভু, তুমি দেখো পথে যেন তাদের কোনো বিঘ্ন না হয়। তুমি তোমার সবল হাত দুখানা দিয়ে তাদের রক্ষা কোরো। আর তোমার করুণায় মিস্টার রায়ের তিন ছেলে যেন তার বাপের তিন স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত ব্যাপারে যেন তারা তাদের বাপকে রক্ষা করে। প্রভু যীশু, আমরা তো জানি তোমার করুণাই আমাদের সম্বল। আমেন।'

সে বলেছিল হেঁটে নামবে। কিন্তু মেট্রনের আদেশে মেডিকেল চেয়ার নিয়ে দুই যুবক হাজির। সন্ধের সময় শিলিগুড়ি—ট্রাক আর হোটেলের শহর। একটা পানজাবি হোটেলের একতলার একখানা ঘরে গিয়ে ওঠে। দূরে থেকে বঙ্গসন্তানদের কালীপুজো সাঙ্গ হবার মাইকে বাজে হিন্দি ফিল্মের গান।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের ওভারব্রিজটা সম্প্রতি রুপোলি পেন্টে ঝলকাচ্ছে রোদ্দুরে। রঙবেরঙের কার্ডিগান পরে বঙ্গললনারা ফিরছেন কলকাতায় স্বামী-

পত্র নিয়ে। তাদের মাঝখান দিয়ে মেডিকেল চেয়ারে চেপে আসতে বিব্রত বোধ করায় তার এক্সরে রিপোর্টটা দিয়ে সে মুখ ঢাকে।

পাশ থেকে হঠাৎ একটা চেনা গলা বেজে উঠল, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? পলিটিকসে আবার নীতি! আপনার নিজের কাজ করুন তো। আর কটা বছর সামনে আছে। নিজের কাজ করুন।'

রানা নয়? ল্যাগব্যাগ করতে-করতে লম্বা-লম্বা পা ফেলে লোকটা মিলিয়ে যাচ্ছে ভিড়ের মধ্যে। সে ডাকবার চেষ্টা করে। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হয়, রানা মারা গিয়েছে না মোটর অ্যাকসিডেন্টে গত বছর আগ্রা থেকে ফেরার পথে?

তবুও সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'রানা!'

কিন্তু লোকটা লম্বা ওভারব্রিজে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

শহর সংস্করণ

। খ ।

শংকর বসু

এক

শুয়ে-বসে-গড়িয়ে কেটে যাওয়ার দিন অমলের জীবনে খুব কমই এসেছে। এর ফলে, গড়ানো দিন ঝটিং এসে গেলে যে সুখটুকু সে পায়, তার আকস্মিকতা সয়ে এলে, প্রায় কিছুই করার না থাকলে, অমল ভেবে ফেলে, 'গেল, পুরো দিনটাই নষ্ট হল।'

প্রতিবেশীর অস্তিত্ব আজ বড়ো বেশি টের পেতে হচ্ছে। পাতলা, ভাঙা দরজাটি মোহিত দাশের থেকে অমলকে এমন কিছু ব্যবধানে নিয়ে যায় নি যাতে সে একা হতে পারে। জানলা গলে চলে যাওয়া যায় রাস্তার চাপাকলে ন্যাংটো শিশুদের শরীরের কাছাকাছি, ঝকমকে রোদের দিকে। সেখানে ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ির জন্য একটি জলাধার আজও টিঁকে আছে। রাস্তার দিকে তাকানো ভয়াবহ হয়ে ওঠে, কেবল ঐ চাপাকলের শিশুরা ছাড়া, জলের ফুলঝুরিটুকু ছাড়া। কারণ, একটি স্থির, অনড়, কালো রঙের রাস্তা বড়ো একঘেয়ে, এবং তার থেকেও ভয়ংকর ক্রমাগত মানুষের পা-তোলা আর পা-ফেলা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মানুষের হেঁটে যাওয়াটা কেমন ভৌতিক ছুটে চলা মনে হয়, বিশেষ যদি পায়ের দিকেই লক্ষ করা যায়। জানলাটি থেকে কেশব সেন স্ট্রীট এতখানি শ্রুতিগোচর যে পথচারীদের চোদ্দ-পনেরো ধরনের ভাষার সবটুকু কানে আসা সম্ভব।

দেখো, ভালোবাসা আগে ছিল না।

মানে?

আমাদের বাপঠাকুর্দা স্রেফ বিয়ে করতে জানত।

এই একটি অংশ, তাদের সমগ্র কথাবার্তা থেকে সামান্য একটি অংশ, জানলার নীচে ফেলে রেখে গেল এক প্রেমিকযুগল। আর তার কাছাকাছি এসে একজন কারিগর তার সঙ্গীকে বলে, 'কিছুই তো চাই নি, একটু সুখ, সামান্য শান্তি আর পেট ভরে খেতে চেয়েছিলাম।' তারাও চলে গেল। মাঝবয়সী দুজন পুরুষের মধ্যে একজন বলে উঠল তখন 'কেমন লাগল বলো, শহরটা তো ঘুরে দেখলে।' এভাবে একজন ভ্রমণবিলাসী, বনেদি নাগরিক, মজুর আর প্রেমিক-প্রেমিকার মতোই পিতা-মাতা-সন্তানরাও চলেছিল কথা বলতে-বলতে। যদিও এইসব কথাবার্তার আলাদা আর ছিটকে-আসা অংশগুলি ছিল কেমন যেন অদ্ভুত, যেন সেসবে মূর্ত কিছু নেই।

নির্ঘাত তাদের সামগ্রিক কথাবার্তার মধ্যে অংশগুলি প্রতিষ্ঠিত করলে অত্যন্ত মূর্ত, বিষয়ী কথাবার্তাই গড়ে উঠবে, তবু সেসবের মধ্যেও যে কিছুটা আশ্চর্য আত্মগোপন করে থাকে, অমল তা-ই লক্ষ করেছিল। ভাবছিল।

আজ হঠাৎই সে দেড়খানা ঘরের এই ভেজা পরিসরটুকু নিজের জন্য পেয়েছে, যদিও জানে সামরিক মাইকের চোঙ থেমে থাকলেও একটু পরেই শুরু হবে, 'আমিম তোমাকে ভালবাসি...'। ভবিষ্যদর্শনা এক কালীমূর্তির কাছে গিয়েছে অমলদের গোটা পরিবারটি, তবু শব্দ-বিস্ফোরণ আর চিৎকার ছুটে এসে দখল করে নেবে এই ভাঙা বাড়িটি, ইটগুলো কাঁপতে থাকবে, রাস্তায় পটকা ফাটানো হবে, আরও কত কী যে ঘটতে পারে! যেনবা, ক শহরটি উদ্‌ভ্রান্তের মতোই ভেসে যাবে আগুন-আলো, শব্দ-ঝংকার আর বীভৎস কোলাহলের এক উৎসবে। বেশি রাতে কোনো মাতালের চিৎকারও শোনা যেতে পারে, সে স্খলিত কণ্ঠে ক শহরের দেবীর নামে জয়ধ্বনি দেওয়ার চেষ্টা করবে : বোম কালী কলকাত্তাওয়ালী...অনুরূপ ঘটনা একই তীব্রতায় গোটা শহর জুড়ে ঘটে চলেছে এমন নয়, আমহার্স্ট স্ট্রীট আর কেশব সেন স্ট্রীটের সংগমক্ষেত্রটিই এ বিষয়ে সবচেয়ে যত্নবান। শহরের প্রখ্যাত কবি, পুলিশের বড়কর্তা আর একজন স্বনামধন্য চিত্র-পরিচালক আসবেন এই দেবীর আরাধনার সামাজিক তাৎপর্য বিষয়ে দু-চার কথা বলতে, পুলিশের বড়কর্তাটি ছাড়া আর সবাই নাস্তিক, তবু জিনিসটা এভাবেই ঘটবে। সুভদ্রা-ঊর্মিলা-বিধুবালা-বিমলবাবুরা গিয়েছেন মূলত ঐ নক্ষত্রলোকের টানে, বিধুবালা বিশ্বাসই করতে পারে নি এঁদের চোখের সামনে দেখতে পাওয়া সম্ভব, খুবই উত্তেজনায় ভুগছিল, যেজনা, চটি পরতে অবধি ভুলে যায়।

কাঠের সিঁড়িতে ভারি শরীরের শব্দ, বাড়িটিতে সেই শব্দ গমগম করে উঠলে, অমল মোহিত দাশের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল। তাহলে সে এতক্ষণ ভুল ভেবেছিল, পাশের ঘরটিতে আসলে এতক্ষণ বিড়ালের তান্ডব চলছিল। মোহিত দাশ উঠে আসতে বড়ো সময় নিচ্ছে, সে অমলের ঘরের ভিতর দিয়েই এগিয়ে যাবে নিজের দরজাটির দিকে। পাতলা কাঠের পার্টিশানের ওপাশে একজন অবিবাহিত মানুষ থাকায় ঊর্মিলা প্রতিটি ঘন মুহূর্ত শব্দহীনভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে চেয়েছে, যেন মোহিত দাশের চোখ কান মাঝরাতেও জেগে থাকত অদৃশ্য ছিদ্রের কাছে। ঊর্মিলা কোনো দিন ততখানি সহজ হতে পারে নি, যদিও এখন তারা এগিয়ে চলেছে একটি মানব-শিশু উপহার হিসাবে গ্রহণ করবে বলে। বিধুবালা অন্তত ডজন খানেক কাঁথায় ফুটিয়ে তুলেছে ময়ূর, হাতি আর 'দাদুভাই চালভাজা খাই'-গোছের কিছু শব্দ। অমল আর ঊর্মিলা কল্পনার ঢেউ ভেঙেছে। তারপর অপেক্ষা করছে, কল্পনা করছে, ভয় পাচ্ছে।

মোহিত দাশ কোনোদিন এইসব অনুভব করেছে কিনা সে জানে না। তবে অমলরা সকলে মিলে কোনো পারিবারিক আনন্দ বা গল্পের মুহূর্তে হেসে উঠলে, আনন্দিত হলে, মোহিত বড়ো বিস্ময় বোধ করত, সে দেখেছে। অমলের সামনে এখন মোহিতের বিশাল ছায়া, ছায়া একটু নড়তেই, অমল দেখল মোহিতের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, ডান দিক গোল হয়ে ভিজে আছে রক্তে। তার শরীরে ধুলোও ছিল, যেমন ছিল গাঢ় হতাশা। এই-সব মুহূর্তে শরীর দ্রুত ছুটে যায়, যেমন অমল নিজের অজান্তেই আগে তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল এবং তার-পর বলে ফেলল, 'কী হয়েছে, মোহিতদা!'

পরবর্তী ঘটনা সম্পূর্ণরূপে নাটকীয়তাবর্জিত। মোহিত দাশের মাথায় চোট লেগেছে একদিন আগে, এবং পায়ের তলা থেকে একটি রড সরে যাওয়ায় মোহিতকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়েছিল লেদ মেশিনের উপর। ড্রেশ করানোর কথা সন্ধ্যাবেলা, কিন্তু এই উৎসব-উল্লাসের মধ্যে কমপাউন্ডার হারিয়ে গিয়েছে বলে, সম্ভবত আজ আর ঐ কাঁচা ঘাটির কোনো পরিচর্যা সম্ভব নয়। একা মানুষ মোহিত দাশ এভাবে পাড়াটির উৎসব থেকেও সরে এসেছে অনেক দূরে, সামনে আছে এক বিপুল রাত। এই রাতটিও তাকে অতিক্রম করতে হবে গভীর ক্ষতের অস্তিত্ব সর্বক্ষণ অনুভব করে। হয়তো সারারাত রক্ত চোঁয়াবে।

'আপনি কত জায়গায় যান, কতরকম মানুষ দেখেন' —বলেছিল সেই আঘাত-পাওয়া মানুষটি। আর এমন-ভাবে বলল, যার মানে, অমল শুধু এই বাহাত্তর নম্বর বাড়িটি নয়, নিজের পরিবারটুকুই নয়, তার থেকে অনেক বড়ো এক ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে আছে।

দুবারের ঐ 'ক-ত' শব্দটি সে উচ্চারণ করেছিল প্রায় এইরকম এক বিস্ময়ে।

শহর ছেড়ে খুব একটা কখনও, কোথাও যাই নি।

শহরটা কি কম!

সে তো প্রায় একরকমই।

আর মানুষ?

মানুষ কোথায়? কোনো না কোনো অফিস কাছারি থেকেই আমাকে খবর জোগাড় করতে হয়।

বাজে কথা।

মোহিত দাশ প্রথমটায় বেশ অবাক হয়েছিল, অমলের ঐভাবে হঠাৎ উঠে এসে তাকে জড়িয়ে ধরা এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশের ঘটনাটিকে সে নিছক প্রতিবেশিসুলভ আচরণ বলে মেনে নিতে পারে নি। এই সামান্য ঘটনাটিতে সে ভিজে যেতে থাকে—যেন হঠাৎ সে অমলের অন্তর দেখতে পেল আর অবাক হয়ে গেল। আর তারই ফল যেমন এইসব কথাবার্তা, তেমনি সে চট করে নিজের ঘরটিতে ঢুকতে পারছিল না। অমল এখন একা এবং কোনো কাজে লিপ্ত নেই, সেও একা ফিরে এসেছে, এই-রকম অবস্থায় ছেদ টানা একটু কঠিন। আবার সে যেমন-যেমন ভেবেছিল কথাবার্তা মোটেই সেভাবে এগোচ্ছে না, অমলের কথা অনুসরণ করার প্রশ্নই ওঠে না, মোহিত দাশের ধারণা হয় অমল এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে ঠিক বুঝতে পারে না অমল কী এড়িয়ে যাচ্ছে আর কেনই বা এড়িয়ে যাচ্ছে। আর যদি সে মোহিত দাশকে এড়িয়েই যেতে চায় তাহলে ওভাবে সে ভালোবাসা প্রকাশ করেছিল কেন।

'এক কথায় বলা খুব কঠিন, মোহিতদা'. অমল বড়ো জোর এরকম একটি সিদ্ধান্তের দিকে মোহিতকে টানতে চেষ্টা করল। আর তখনই হুড়মুড় করে তিন-চারজনের কণ্ঠস্বর আর পায়ের শব্দ উঠে এল কাঠের সিঁড়ি কাঁপিয়ে। মোহিত দাশ শুধু বলল, 'যা-ই।'

দুই

কফি হাউসের টেবিলগুলো সম্পূর্ণ বদলে ফেলা হয়েছে, এমনকি সেই প্রশস্ত কাঠের চেয়ারগুলোও প্রায় নেই বললেই চলে, বদলে সিন্থেটিক তারে বোনা হালকা চেয়ারে ভরে গিয়েছে বিশাল হলঘরটি। এসব দিকে অমল নজর দিয়েছিল অনেক পরে, বরং সবুজে-কাঁচ-বসানো টেবিলটির অ্যাশট্রের মুখ যেভাবে আগুনের ফুণ্ডের মতো জ্বলছিল, সে প্রথমটায় সেই অ্যাশট্রেটির দিকেই তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।

একটু আগেই কেউ অ্যাশট্রেটিতে সিগারেট গুঁজে দিয়ে চলে গেছে। টেবিলে পরিত্যক্ত কফির কাপ এখনও, ওয়েটার তুলে নিয়ে যাওয়ারও সময় পায় নি। ইতিমধ্যে অমল এসে যায়। বহুদিন পরে সে এখানে এল, শহরের বয়স্ক মানুষের নস্বইভাগই যেখানে এলে স্মৃতিভারাতুর হয়ে পড়ে। কলেজ জীবনের দু-একটা গল্প করা তখন এত অবধারিত যে প্রায় কেউই তার বাইরে যেতে পারে না। ওয়েটারের মুখের ভাঁজও কিছু সাদা চুলের মধ্যে খুঁজতে থাকে স্মৃতি। হয়তো বা বলেও ফেলে, 'তুমি কতদিন আছ?' 'কী নাম বললে', 'দাঁড়া-দাঁড়াও', 'রামু, রা-মু, আরে কী বদলে গেছ'...। রামুর পক্ষে স্তম্ভিত হওয়াই অস্বাভাবিক, কারণ প্রতিদিন তাকে কেউ-না-কেউ বলছে, 'আরে, রা-মু।' ফলে সে নিজের বয়স সম্পর্কে হাসতে-হাসতেই সজাগ।

বাঁ দিকের দরজায় তার চোখ নিবদ্ধ, প্রায় জাল পেতে রেখেছে সে, দীপক আসা-মাত্র তাকে হাতের পানজা দেখাতে হবে। দীপক যে আসবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, বড়ো জোর একটু দেরি করতে পারে। অমলের সংশয় অন্যত্র। যদি ওদের এডিটর, যিনি মালিকও বটে, প্রস্তাবটিতে নৈতিবাচক কিছু বলে থাকেন, হয়তো বললেন, 'এমনিতেই আমরা ওভার-স্টাফড, তার ওপর'...। এইসব ভাবতে-ভাবতে একটি সুখের চাকরি, আরামদায়ক একটি প্রতিষ্ঠান অমলের মাথার মধ্যে রঙের ঢেউ এনে ফেলল। সে অনুভব করল এক ভয়ংকর অনাশ্রিতত্ব, যেন ওরকম কোনো সিদ্ধান্তের অর্থ দাঁড়াবে এই যে দীপক এসে দেখবে টেবিলটি শূন্য, আশ্রেটের মুখ থেকে উঠে আসছে ধোঁয়া।

দীপক এক তো খুবই আশাবাদী, তার উপর অমলের প্রায় তিরিশ উতরেও একটি পাকা চাকরি না-পাওয়া, না-থাকার ঘটনাটিতে কিছুটা বিব্রত বোধ করে। সত্যি, অমলের থেকে অনেক অযোগ্য লোক চাকরি-বাকরি করে খাচ্ছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে অর্বাচীন হলে মানষের খিদে-তেষ্টা, দায়-দায়িত্ব থাকে না—একথা অমলের, দীপক তখন তাকে পরামর্শ দেবে এ শহরে

কিছু করে-খেতে গেলে ইংরেজিটা মোক্ষম অস্ত্র, তুই যে একদম ইংরেজি জানিস না। শেষে তারা বেশ খানিকটা দুঃখ আর বিরক্তি জড়ো করার পর এরকম প্রস্তাব উঠতে পারে—চ, একটু বসি', অর্থাৎ পান করি চল।

দীপক এল যথাসময়েই, তার মুখে ছিল সেই দুর্লভ হাসি যা শুভ সংবাদের ইঙ্গিত বহন করে। তবু অমল আশ্বস্ত বোধ করে নি, দীপক বসা-মাত্র সে জিজ্ঞেস করে ফেলল 'বল।'

দাঁড়া, একটু জিরোই।

কফি বলি?

বল।

দীপক ফোলিও ব্যাগ থেকে ঝকঝকে একটি বই বের করল, বলল দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার পর বইটি আবার শহরে এসেছে। অবশ্য এখন যা দাম করেছে, এদিকে পেপার ব্যাক।

কফি জুড়িয়ে যাচ্ছে।

হুঁ।

তোকে অপছন্দ করে এমন লোকের সংখ্যা কম নয়।

হয় নি তো?

ধ্যাত।

তবে?

দেখ, এটা তোর নবযুগে নয়, ওয়ান অব দা বিগেস্ট মিডিয়া।

তো!

কথাটা বড়কর্তার কানে তুলেছি, একবাক্যে ইয়েস বলেছেন।

ফাইন।

না, সেটা বলা যাচ্ছে না, দু-তিন সপ্তাহের মধ্যে উনি সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন।

তাহলে?

আবার তোর নামটা তখন উচ্চারণ করতে হবে।

দীপক অতি জটিল একটি প্রক্রিয়া বর্ণনা করে চলেছিল অস্বাভাবিক উৎসাহের সঙ্গে। বোঝা সম্ভব যে, দীপক বড়কর্তার কাছ থেকে একটি চাকরি বাগানোর এই প্রয়াস—পরিকল্পনা, একের পর এক চাল, সব মিলে যে দুরূহ খেলা, তাতে রোমাঞ্চ বোধ করছে। হঠাৎই সে বলে বসল, 'কোনো তৈরি স্টোরি আছে হাতে?' 'আছে', বলেই অমল জানতে চাইল, 'কিন্তু অন্য কাগজে লিখলে এখানে আমার অসুবিধে হতে পারে, অযথা...।' দীপকের দুটি ভুরু আস্তে-আস্তে জুড়ে যায়, 'আর লেখা ছাপালে যদি চাকরির রাস্তা আরও পরিষ্কার হয়ে আসে, এমনও তো হতে পারে নবযুগ-ও তোকে আরেকটু গুরুত্বের সঙ্গে নিল।' 'দাঁড়া', বলে অমল সিগারেট আনতে নীচে গেল।

ফেমিন সম্পর্কে একটা কাজ...।

ফে-মি-ন!

হ্যাঁ।

কোথাকার?

সরি, ফেমিন না, ফুড সিস্টেম।

তাই বল।

অমল যে ফুড সিস্টেমকে ফেমিন বলে উল্লেখ করল তাতে দীপক প্রথমে স্তম্ভিত হলেও, পরে বুঝেছিল অমল আসলে খুবই অব্যবস্থিত আছে। আর এই দুজন মানুষের মধ্যে সম্পর্কের একটি অদ্ভুত ধরন কাজ করে চলেছে প্রথম আলাপের দিনটি থেকেই। মজার-মজার নিউজ করার ব্যাপারে অমলের জুড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন, যেমন একবার সে শহরের বৈদ্যুতিক তারে কাকের বাসার মোট সংখ্যা খুঁজে বের করেছিল। তারপর এ-ও জানা গেল অধিকাংশ শর্ট-সার্কিটের কারণ হল এই কাকের বাসা এবং বৈদ্যুতিক তারে কাকের বাসা বানানোর প্রবণতা এত দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছিল যে যুদ্ধকালীন নিষ্প্রদীপ শহরে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে ক শহরটি। ফলে কাগজের অফিস থেকে, জনসমাগমের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ ধরনের সংবাদ নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা থাকত, যে-কোনো মানুষ এ ধরনের টপিকে কিছু না কিছু সংযোজন করতে পারত বলে অমল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অমলের সঙ্গে দীপকের সম্পর্কে এই পূর্ব-ইতিহাস রচনা করেছিল সম্ভ্রম। আবার মানুষ খুব চট করেই সরে যেতে পারে প্রতিভার দিকে ; সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান আর কিছুটা শ্রমের নৈপুণ্য মিলে গুটিকয় তথাকে অমল যেভাবে একটি তীক্ষ্ণ নকশায় পৌঁছে দিত, দীপক ধরে নিয়েছিল এর মধ্যে প্রতিভা আছে।

অমলের দিক থেকে আত্মসন্তুষ্টির ঝোঁক যে একেবারেই ছিল না, একথা বললে ভুল বলা হবে। যোগ্যতা অনুসারে খাদ্য আর আরাম যে সে পাচ্ছে না, পায় নি, তার ফলে উত্তেজনা থেকে অভিমান সমস্তই অল্পবিস্তর

ছিল। তবে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে যোগ্যতা প্রমাণ করার রুদ্ধশ্বাস চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তাকে হতাশ আর ক্লান্ত হতে হয়েছে। অন্যদিকে নিজেরই এক-একটি কাজ, প্রতিদিনের নতুন-নতুন কাজে এতদূর সরে গিয়েছে, মলিন হয়েছে যে তার নিজের কাছেই সেসব তলিয়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির গহ্বরে। ধীরে-ধীরে এসে যাচ্ছিল মন্থর প্রত্যাখ্যান, একটু গুটিয়ে যাওয়া। আবার বাহাত্তর নম্বর কে. এস. স্ট্রীটের অন্ধকার দেড়খানা ঘর সবসময় তার বুকের মধ্যে জেগে থাকায়, অমল চাইছিল একটু বাবসা করে নিতে। নিজের আর্থিক অবস্থার একটু পরিবর্তনই ছিল তার কাছে একমাত্র আশু কর্তব্য। নবযুগ পত্রিকাটি ছাড়তে পারলে সে একরকম স্বাধীনতায় পৌঁছে যাবে, এই ছিল অমলের অনুভব। এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এ জিনিসটা অমলের কাছে প্রায় সংগ্রাম হয়ে উঠছিল, ঊর্মিলার সঙ্গে শুধু নয়, ইন্দ্র বা দীপকের সঙ্গেও এ নিয়ে কথাবার্তায় অমল আবেগ-সংক্ষোভের ঢেউয়ে উঠত, পড়ত।

দীপকের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি হল যে অমল-ই ওর অফিসে যাবে, বি. চৌধুরীর সঙ্গে অমলের আগে থেকেই আলাপ ছিল, তদুপরি শ্রীযুক্ত চৌধুরী অমলের কাজকর্ম সম্পর্কে শুধু ওয়াকিবহাল নন, একটু আশাবাদীও। যদিও শ্রীচৌধুরী নিজে আজ পর্যন্ত কোন প্রস্তাব পাঠান নি অমলের কাছে। আসলে এ জিনিসটা এখন ক শহর সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলেছে। উলটো দিক থেকে সরাসরি ও মানবিক যোগাযোগের একটি ঝোঁক এসেছে। অর্থাৎ অমলের হাসি, অমলের চোখ, অমলের ব্যবহার কিছুদিন লক্ষ করা হবে, কয়েকটি মাস বা বছর তার মন্ত্র হবে 'লেগে থাকো'।

না, না, সেসব ফেজ তুই পার করে দিয়েছিস।

বলছিস।

ন্যাকামি করিস না।

তাহলে পরশু?

হুঁ।

নীচে থাকিস।

ঠিক আছে।

দুজনই একসঙ্গে পকেটে হাত দিয়েছিল, যেমন রেওয়াজ, দীপকের উপার্জন বেশি বলেই সে অমলকে বিল মেটাতে দিল না। প্রতিবারই তাই হয়, আর প্রতিবারই অমল তখন স্বপ্ন দেখে একদিন সে ক শহরে বিল মেটানোর একটি অভিযান চালাবে, মুহূর্মুহু হাত তুলবে —'ট্যা-ক-সি।'

তিন

'বড্ডো রোগা হয়ে যাচ্ছিস'—বেশ জোরেই বলেছিল বিধুবালা, ঘরের অন্য তিনজনকেও কথাটি আনমনা থাকতে দিল না। তার হাতে দুধের গ্লাস, এই একগ্লাস দুধ সম্পর্কেই বিধুবালা যে উক্তিটি করেছে সন্দেহ নেই। দারিদ্র্যকে বিধুবালা এভাবে এত প্রচ্ছন্ন করে তুলতে চাইল যে অমলের পক্ষে তারপর বলা অসম্ভব—ঊর্মিলার গর্ভের খুদে মানুষটির প্রতিদিন গড়ে ওঠার জন্য এই গ্লাসটি কতখানি প্রয়োজনীয়। বা, সে এই কথাটি এমনিতেও বলতে পারত না, তাদের দেশীয় আসরে সন্তান-আগমনের ঘটনাটি বয়স্কদের কাছে সলজ্জ থাকতে শেখায়, অমল সেই শিক্ষা বা রীতির বাইরে যেতে পারত না। বরং বিধুবালাকেই সমস্ত দিক সামলাতে হবে, এই সামলানোরই একটি প্রকাশ বিধুবালার 'বড্ডো রোগা হয়ে যাচ্ছিস' কথাটি। এ একটি মাতৃতান্ত্রিক মুহূর্ত। অমল আশৈশব এরকম অনেক মুহূর্ত উপহার পেয়েছে, তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, যে কারণে সে বিধুবালাকে আলাদাভাবে খুব কমই অনুভব করেছে। সুভদ্রার টুকটাক করে দেওয়া কাজ, নিজের মাথায় ঊর্মিলার আঙুল বা বয়সের অনেকখানি ব্যবধান সমেত তার বাবা বিমলবাবুর উৎকণ্ঠা আর আশা, অমলের ক্ষেত্রে কেমন এক নিসর্গের মতো। এই নিসর্গে সে এতখানি প্রতিষ্ঠিত, শিকড়ের এত গভীর এক উপাখ্যান আছে যে অমলের প্রায় কোনো একাকিত্ব নেই।

সে প্রথমে ঊর্মিলাকে বলে সম্ভাব্য অফিস-বদল ও সৌভাগ্যের কথা। ঊর্মিলাই হয়তো সুভদ্রাকে বলে থাকবে, পরে তিনজন নারী আর বৃদ্ধ মানুষটি এ বিষয়ে ঠিক কী-কী কথা বলেছে, অমল জানে না। তবে রাত আড়াইটে পর্যন্ত জেগে স্টোরিটা লেখার পর আজ সকালে যখন ঊর্মিলা-সুভদ্রাকে পড়ে শোনায়, তখন দেড়খানা ঘর উৎকর্ণ হয়েছিল। যেন তারা ভয়ে আর বিস্ময়ে শুনে চলেছে নিজেদের সম্পর্কে অবধারিত এক ভবিষ্যৎ গণনারই বিবরণ। অমল আজ বেরিয়ে যাওয়ার

পর তাদের কান অসম্ভব সংবেদনশীল হয়ে যাবে, সিঁড়িতে সামান্য পদশব্দ রচনা করবে গভীর এক ছলনা, তারা আশা করবে সাফল্য নয় সুদিনের। অমলের ক্ষেত্রে এই সুদিন, এখনও, বারবারই সাফল্যের অবয়বে হানা দিয়ে যায়, যেন সাফল্য তাকে বাস্তিগতভাবে পৌঁছে দেবে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে। অমলের একটি মূর্তি খোদাই করা হয়ে যাবে আপাত-উদাসী ক শহরে, যে শহরের সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু আলগা এক অভ্যাস। সে এখান-কার রাস্তাঘাট চেনে, নিজের প্রয়োজনের কথা অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো ভাষা তার করায়ত্ত, এবং সে ততখানি অপরিচয়ে ডুবে নেই যাতে পথ-দুর্ঘটনার শিকার হলে বা ভুলক্রমে আইনগত বা প্রশাসনগত কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে হঠাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সর্বোপরি, শহরটির কয়েকটি জায়গায় একবার গিয়ে হাজির হলেই, দশজনের আড্ডার মধ্যে থাকার যে অযৌক্তিক নিরাপত্তা, সেসবও অমলের আছে। মোট কথা, বাহ্যত অমলের বেশ স্বাধীন-স্বাধীন লাগে। এখানে, সে, একদিন রাজসিংহাসন পাবে, তখন তার হাঁটা হয়ে উঠবে গাম্ভীর্যপূর্ণ, বিবেচনায় থাকবে ঠান্ডা নির-পেক্ষতা, যদিও অনামী-অখ্যাত পাড়া বেপাড়ার মানুষ-জনের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কটি এমন স্বাভাবিকতায় ছেয়ে থাকবে যে অমলকে ঘিরে বিস্ময় কোনো দিনই ফুরোবে না।

এইসব সাধারণ লক্ষণ সঙ্গে নিয়েই অমল চলে যায় কাচের দেওয়াল দিয়ে গড়ে তোলা বিশাল অফিসটিতে। দীপক নীচে আসে নি তখনও, অমল সম্ভবত একটু তাড়াতাড়িই এসে পড়েছে। কাচের দেওয়ালগুলির মধ্যে বিভিন্ন আকার আর আয়তনের স্পেশকে নিয়ে আসা হয়েছে একটি বাতানুকূল যন্ত্রের অধীনে। লিফট-থেকে-নেমে-আসা মানুষ আর লিফটে-উঠে-যাওয়া মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ক্রমাগত হাসি-বিনিময় করে যাচ্ছিল, তারা কথা বলছিল বেশ মৃদুভাবে, সকলের চোখেমুখে বিরাজ করছে এমন আশ্চর্য প্রীতি যে মোহাবিষ্ট হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অমল প্রায় ভুলে যাচ্ছিল যে বাতানুকূল পরিবেশটুকু কত সংক্ষিপ্ত, শহরের কত জায়গা, কত কম মানুষ নিয়ে গড়ে উঠছে। বরং তার হঠাৎ মনে হল 'হেডকোয়ার্টার' শব্দটি, বা, শব্দটির কাছা-কাছি কোনো ধারণায় সে পৌঁছে যেতে থাকে নিঃসাড়ে।

সুসজ্জিত একটি চেয়ারের সঙ্গে কথা বলার যে ভৌতিক অভ্যাস এ শহরের আছে, এতদিনে অমলের তাতে সড়গড় হয়ে যাওয়ার কথা। বি. চৌধুরী একটু কাত হয়ে অমলের লেখাটা পড়ে যাচ্ছিলেন, মাথাটি সেই আগেকার মতোই ছোটো এবং নিখুঁত বৃত্তই থেকে গিয়েছে, হাত দুটিও সেই আগের মতোই—দুটি সরু ডাল। কিন্তু বুকের একটু নীচ থেকে যে স্ফীতি শুরু হয়েছে তা যেন কোনোভাবেই চৌধুরীর নিজস্ব নয়, সুসজ্জিত এই চেয়ারটিই বরং তার ঐ অংশটি নিজস্ব করে ফেলেছে। অবিশ্বাস্য এক মানবশরীর গড়ে উঠেছে, যা রোগা বা মোটা নয়, শরীরের মধ্যভাগে অতিরিক্ত মাংসের ওজন সহ এক কিম্ভূত জীব। খানিকটা মাংস ছিটকে এসে লেগেছে গালে, যার ফলে চোখে প্রায় কোনো ভাবই লক্ষ করা যায় না, বাঁজে-আসা দুটি গর্ত থেকে উঠে আসছে দুটি কালো পোকা।

বি. চৌধুরী লেখাটা প্রায় শেষ করে, লেখা এবং চেয়ারটিতে ডুবে থেকে যখন বললেন, 'আভাসেই যে শেষ হয়ে যাচ্ছে' তখন অমল, বলা যায়, একটু বিপন্নই বোধ করছিল। অতি দ্রুত তাকে ভেবে ফেলতে হল একটু হাসা উচিত কিনা, লেখাটির বিষয়ে অতিসতর্কতা শেষ পর্যন্ত যে পলায়নীভাব এনেছে সেটা স্বীকার করাই সংগত হবে। না-কি সে বলবে—এর থেকে বেশি স্পষ্ট হতে গেলে কিছুটা ঝুঁকি এসে পড়ে। বি. চৌধুরী পিন-আপ-করা কাগজের পৃষ্ঠাগুলিতে এমনভাবে হাত বোলাচ্ছিলেন, নাড়ছিলেন, যে মনে হল ঐ পৃষ্ঠা কটি খুব জীবন্ত, যেন এক তৃতীয় ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বই অমলকে দ্বিধায় ছুঁড়ে দিল, এমন একটি ইস্যু উপস্থিত রয়েছে যার সামনে অমল কোনো রকম হ্যাংলামো প্রকাশ করতে পারে না, খুব একটা আড়ষ্ট হতে পারে না।

আসলে, দীপকই বলল তাড়াতাড়ি করে দিতে।

না, না, সেটা ঠিকই করেছেন, তবে, মনে হচ্ছে এ-বিষয়ে আপনার কাছে আরও তথ্য আছে।

হ্যাঁ।

তাহলে আপনার উচিত ছিল লেখাটির মধ্যে সব তথ্যকেই উপস্থিত করা।

ফুড ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারটা যদি প্রকিওরমেন্ট থেকে ধরি...

হ্যাঁ, এই সংকটের রূপটাই আরও স্পষ্ট করা দরকার। আ-চ্ছা।

সাংবাদিক কখনও শুধু সংশয় বা আন্দাজ থেকে কিছু লেখেন না। যা-ই লিখুন না কেন, একটা সিদ্ধান্তে আপনাকে পৌঁছতেই হবে। আমার যন্দুর মনে হচ্ছে, ভয়ংকর একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ফুড ডিস্ট্রিবিউ-শনের ব্যাপারে, স্টকও খুব খারাপ।

হ্যাঁ, ঠিকই।

তাহলে তো ফোমিনের ফুট স্টেপ ছাড়া...

আসলে আমি একটু দ্বিধায়...

না, না, ওসব কোনো কাজের কথা নয়, সংবাদপত্রের যুগে এটা, আপনাকে নির্ভীক হতে হবে।

কিছুক্ষণ শুধু কাগজ ওলটানোর শব্দ, একবার বোতাম টেপা হল, 'দু কাপ চা দিও সুকুমার, একটায় দুধ-চিনি দেবে।' এসবের মধ্যে মনে হল বি. চৌধুরীর শেষ শব্দটি—'নির্ভীক'। সংবাদপত্রটির মাথার উপরও সে প্রতিদিন ঐ শব্দটি ছাপা হতে দেখে আসছে, এখন কেমন প্রহেলিকা মনে হচ্ছে। বি. চৌধুরী হয়তো প্রতি-দিনই একটু-একটু করে নির্ভীক হয়েছেন, প্রতিদিন তাঁর শরীরেও ঠিক সেভাবেই এসেছে এক অলক্ষ্য, অদ্ভুত স্ফীতি। সমস্ত সংশয় থেকে তিনি সরে এসেছেন এক দৃঢ়তর বাবধানে, যেখানে শুধু সিদ্ধান্তরা হির হয়ে বসে থাকে, সেখান থেকে শুরু হয়ে যায় সংবাদ-পত্রের একটি যুগ।

'আপনি থাকেন কোথায়?'—এরকম ব্যক্তিগত প্রশ্ন সম্পূর্ণ অভাবিত, নামজাদা কোনো প্রতিষ্ঠানের মাথা এরকম প্রশ্ন করলে দুটি প্রতিক্রিয়া সম্ভব। এক—প্রতিষ্ঠানটি যাকে এই প্রশ্ন করছে সেই ব্যক্তির সামনে রয়েছে দরজা খুলে যাওয়ার একটি গল্প, দুই—মাথাটি সেই মুহূর্তে প্রতিষ্ঠান থেকে ছিটকে পড়ে, হয়ে গিয়েছে একজন ব্যক্তি। 'একটু টাচ রাখবেন।' বলা তো যায় না আমাদের ছুঁয়ে থাকুন, যোগাযোগ রক্ষা করে চলুন, তাই বলতে হয় 'টাচ' শব্দটি, আর এই পরিভাষায় ঘুচে যেতে পারে সমস্ত বিভ্রান্তি, চোখের সামনে তখন একটি রাস্তা দেখা সম্ভব। রাস্তাটি লুকিয়ে আছে বাতানুকূল সেই বিশাল বাড়িটির কাচের দেওয়ালের মধ্যেই, কাচের দেও-য়াল বলে ভ্রম হতে পারে এখানে সবই খোলামেলা, খুব স্বচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু বি. চৌধুরী জানেন সেইসব বুদ্ধি-মান মানুষের অস্তিত্ব যারা ইঙ্গিতের অর্থ সম্পর্কে পারঙ্গম।

চার

আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্টাপিসের এম. ও. পিওনের ফিরে আসতে-আসতে বেলা একটা বেজে গেল। ডেসপ্যাচ ক্লার্ক-এর কাছ থেকে শুধু এইটুকু জানা গেল যে বিপরীত টেউটি সম্পর্কে তারা আগে তেমন কিছু আঁচ করতে পারে নি। তবে মানি অর্ডারের সংখ্যা থেকে ডেসপ্যাচ ক্লার্কেরও ধারণা হয়েছে ক শহরে প্রতিদিন যত নবজাতকের জন্ম হচ্ছে, শহরটি থেকে প্রতিদিন দেশ-ত্যাগী মানুষের সংখ্যা হয়তো তার থেকে কম কিছু নয়। আর আগে প্রতিদিনই বিহার, ইউ. পি. উড়িষ্যায় মানি-অর্ডার করা হত শহরের প্রতিদিনের উপার্জনের এক-পঞ্চমাংশ টাকা। দপ্তরটি একাজের যোগ্যতাও অর্জন করেছিল ধীরে, এখন উলটো কাজটি করতে তাদের জিভ বেরিয়ে আসছে আরও; দু হাজার পিওনের জন্য বিজ্ঞাপন ইস্যু করা হয়েছে।

ডেসপ্যাচ ক্লার্ক ভদ্রলোক যথেষ্ট বিনয়ী আর নিজের কাজের ব্যাপারে তাঁর নিষ্ঠা প্রায় ধার্মিক মানুষের অর্চনার মতো। পর-পর তিনটি জাবদা খাতায়, এম. আর. ডি.-চিহ্নিত পৃষ্ঠায় ক্রমাগত টুকে চলেছেন মানিঅর্ডারের বিবরণ। এম. আর. ডি. ছাড়াও বহু অ্যাব্রিভিয়েশন রয়েছে, যেসব অমলের নজর এড়িয়ে গেল। স্ট্যাম্প-ক্লার্ক জানালেন, 'এরকম দু-চারজন মানুষ আজও বেঁচে আছে বলে সরকারি অফিসগুলো চলছে মশাই।' স্ট্যাম্প-ক্লার্কটি যে কী পরিমাণে আড্ডাবাজ তা বোঝা গেল পরবর্তী বাক্যটিতে—'জানেন, ওঁর ছেলের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অফিস করেছেন। আমরা তো বলি, মশাই, আপনি তো মৃত্যুর পরও অফিস ছাড়বেন না, দেখব ভূত হয়ে এসে টেনে নিয়েছেন ডেসপ্যাচের খাতা...।' এই পর্যন্ত বলে স্ট্যাম্প-ক্লার্কটি নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ফেললেন, অমলের স্বতঃস্ফূর্ত হাসি একেবারেই অনুপস্থিত তখন। কিন্তু কী করা যায়, সে চেষ্টা করল হাসতে।

ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক, স্ট্যাম্প-ক্লার্ক এবং পোস্টমাস্টারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এম. ও. পিওনটি এই একটি

এরিয়াতেই রয়েছে গত দশ বছর যাবৎ। 'এটা খুব একটা নরমাল ব্যাপার নয়, তবে বুঝতেই পারছেন, এখন পার্টিবাজির যুগ—লোকটা খুবই ভালো কিন্তু তাতে কী, নিয়ম মানলে বিট দূরের কথা, দশবছরে ওর অন্তত তিনটে প্রোস্টাপিসে বদলি হওয়ার কথা।'

অমলকে অফিসের ভেতরে এসে বসানো হয়েছে, সৌজন্যের কোনো অন্ত নেই, দু-কাপ চা আর চার-পাঁচটি সিগারেট দেওয়া হয়েছে তাকে। দু-একবার সে প্রাচীন কাঠের টেবিলে হাত রেখে একটু জুত করে বসার চেষ্টা করেছিল, প্রতিবারই তুঁতে-মাখানো আঠা এমন বিশ্রীভাবে লেগে যায় যে সে এই অফিসটিতে আর কোথাও হাত রাখতে স্বস্তি বোধ করছে না। বরং ভেবে ফেলেছে এখানে তো আঠার কোনো দস্তর দেখছি না, তাহলে আঠাটা আসছে কোত্থেকে? 'মিহিরবাবুও ঠিক এমনিধারা মানুষ ছিলেন, যেদিন রিটায়ার করলেন, ব্যাস, সেদিনই হার্ট ফেল।' স্ট্যাম্প-ক্লার্কটির থামার কোনো লক্ষণ নেই। এবং বেশ বোঝা যাচ্ছিল শুধু এই একটি-মাত্র পয়েন্টকে ঘিরেই, তার সংগ্রহে আছে সহস্র খণ্ড-কাহিনী।

এম. ও. পিওন ফিরে আসার আগেই, অমল তার সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলতে পারে—যেমন তার নাম কোনো একজন মণ্ডল, সে গ্র্যাজুয়েট, চাকরিটা পেয়েছে শিডিউলড কাস্ট কোটা থেকে। মণ্ডলের পরিবার বড়ো। ৬ নম্বর বিটে দোকান আর ব্যবসার একটা ঘাঁটি থাকায়, সেখান থেকে বছরে অন্তত হাজারখানেক টাকা বকশিশ পাওয়া যায়। বেচারা বার কয়েক ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় বসেছে কিন্তু কোনোবারই সুবিধে করে উঠতে পারে নি। ইউনিয়ন আর পার্টির জোরে মণ্ডল আঁকড়ে রাখতে পেরেছে ৬ নম্বর বিট।

মণ্ডল যখন এল, ততক্ষণে পাড়ার এই পোস্ট অফিসটি পেয়ে গিয়েছে ফাঁকা দুপুর, ডেসপ্যাচ-ক্লার্কটি ছাড়া কেউই আর নিয়মিত সিটে নেই, তারা একবার ক্যানটিন, একবার রিক্রিয়েশন ক্লাব—এই করে যাচ্ছিল। পোস্ট মাস্টারও খুলে ফেলেছে জনপ্রিয় উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ। ডেসপ্যাচ-ক্লার্কই আঙুল তুলে দেখাল 'ঐ এসে গেছে, মণ্ডল...।' মণ্ডল মুখটি না ঘুরিয়ে সোজা চলে গেল ক্যাশে, অমল তাকে অনুসরণ করে। ত্রিশভাগ মানিঅর্ডার ফেরত যাবে, প্রাপকরা অনুপস্থিত —এই কারণে। অনুপস্থিতির কারণ মৃত্যু, ব্যাধি আর শহরত্যাগ। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই ত্রিশভাগ মানুষ হয়ে পড়েছেন ঠিকানাহীন।

এতদিনে আপনি তো ৬ নম্বর বিটের...

মুখস্থ, বলুন না কী বলবেন।

বলছি, দেশ ছাড়ার ঘটনাটা কত দিনের?

খুব বেশি দিনের না হলেও, চলছিলই, এই ধরুন না একজন, দুজন করে গেল, চিঠি লিখল এইরকম ধারা, আবার জনাকতক গেল, তারপর তো সব পাঁড় কি মরি করে ছুটেছে।

কেন?

এখানে একজন মিস্তিরি কাজ যদি পায়ও তো বড়-জোর দশ টাকা রোজ, তা এক কিলো চালের দাম-ই হল পাঁচ টাকা। ওখানে মিস্তিরির রোজ হল দেড়শো টাকা।

এদের আত্মীয়স্বজনের কি হাল ফিরে গেছে তাহলে?

পাগল হয়েছেন, যা পাঠাচ্ছে তাতে চলে কখনও, ধুঁকতে শুরু করেছে সব।

কেন?

ওখানে একে তো আকারা, তার ওপর হোটেল-নাচ-ফুর্তি...

তবে যে এত মানি অর্ডার...

হ্যাঁ আসছে, সে যারা পাঠাচ্ছে, পেটে গামছা বেঁধে পাঠাচ্ছে, এই তো, মাস ছয়েক আগে চৌলারিং মিস্তিরি যদু সিং আরব থেকে ফিরল, প্যাকাটি হয়ে গেছে। বরং এখানে থাকতে একবেলা সবাই মিলে খেতে পেত। ওখানে ট্যাক্সও দিতে হচ্ছে। যদু সিং ফিরে যাওয়ার সময় প্যান্টলুন অব্দি খুলে বেচেছে।

ফিরেও গেছে।

তবে আর বলছি কী!

এখানেও তো জিনিসের দাম আগুন।

তা আর বলতে, বুঝলেন ওদের বৌ-ছেলের শুকনো মুখ দেখে বকশিশ পর্যন্ত নিতে পারি না, সব ধুঁকছে। ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছি আমাকে বদলি করে দিতে, এ জিনিস চোখে দেখা যায় না।

মণ্ডলের কথায় এত সব ভয়ের চিহ্ন ছড়িয়ে থাকলেও, সে ভয়কে নির্দিষ্ট করতে অপারগ, কার্য-কারণ বিষয়ে মণ্ডলের কোনো মনোযোগ নেই, বরং তার চোখ দুর্দশার চিত্রই বেশি দেখেছে। সে কেবল পারে ঐ দুর্দশার বর্ণনা দিতে। মণ্ডলের বর্ণনা থেকে মূলে যেসব বিষয় জানা গেল, তা হল এরকম : কারিগর মানুষই দেশত্যাগীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ক শহরে এদের মধ্যে কেউ-কেউ অনেক পুরুষ যাবৎ বেঁচে থাকলে এদের মধ্যে কেউ-কেউ অনেক পুরুষ যাবৎ বেঁচে থাকলেও অনেকের সঙ্গেই গ্রামের সম্পর্ক ছিল, যদিও সে সম্পর্ক বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি। ক শহরে তারা দলবদ্ধভাবে এক-একটি অঞ্চলে বসবাস করত। দাঙ্গার সময় যেমন শহরের এক-একটি অংশ মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল, দেশত্যাগের বন্যাতেও ঘটতে চলেছে সেই এক বৃত্তান্ত। দেশত্যাগের ফলে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে হয় দেশত্যাগীরা বাঁচবে অথবা তাদের পরিজনেরা। কিন্তু মৃত্যুর এই হিসাব তারা কেউই বুঝছে না, সকলে মিলে বাঁচার চেষ্টাটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে তা এখুনি অনুমান করা সম্ভব নয়।

[ক্রমশ

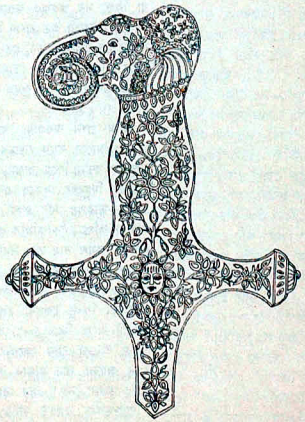

জাহাজী গল্প

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

ওয়ার্ডরুমটা যতটা পারা যায় আরামদায়ক করে তৈরি করা হয়—এটাই হল অফিসারদের থাওয়া-বসার জায়গা। নিজের নিজের ক্যাবিন বা কুঠুরিগুলোতে তো নড়ে বসবার জায়গা থাকে না। অনেক ঘরেই দুজনের শোয়ার ব্যবস্থা—একজন তলায় সাধারণ লোহার খাটের মতো, অন্যজন আরো চারফুট উপরে—রেলের কামরার বাংকের মতো।

নতুন জাহাজের ওয়ার্ডরুমের একটা বিশেষ গন্ধ আছে। তাকালেও চোখ জুড়োয়। চৌকাঠ পর্যন্ত মাপে-মাপে খাপে-খাপে বসানো রঙিন কারপেট, লোহার দেওয়াল-গুলোয় কাঠের প্যানেল সেঁটে লাগিয়ে চকচকে পালিশ করা, আরাম করে বসবার মতো চামড়ায় মোড়া কৌচ, পোর্টহোল বা কাঁচের জানালার চারপাশের পিতল থেকে টেবিলের উপর রাখা নুনগোলমরিচদান পর্যন্ত—ধাতব যা কিছু সব ঝকঝক করছে। ঘরের গরমে এসে টের পেলাম বাইরেটা কত ঠান্ডা ছিল। সে কথা কলিনস্কিকে বলতে সে বললে, "তবু তো বরফ পড়ছে না।" তারপর থেমে বললে, "ঠান্ডাকে তোমরা এত অপছন্দ কর, কিন্তু তারও একটা সৌন্দর্য আছে। সেটা তোমরা গরম দেশের মানুষ পাও না।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "যথা?" ও বললে, "কেন? উত্তরে আলো, যাকে তোমরা বল অরোরা—সে যে কী অপরূপ বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে পারব না। তারাভরা রাতে উত্তরের দিগন্তে দেখবে একটা ক্ষীণ আলোর আভাস প্রথমে—তারপর সেটা একটা আলোর ফিতের মতো হয়ে কাঁপতে-কাঁপতে ঝিকিমিকি করতে-করতে আকাশে উঠতে থাকবে। ক্রমশ প্রায় তার সমান্তরালভাবে আরো অনেক-গুলো ওইরকম নানারঙের রেখা উত্তর দিগন্ত থেকে উঠবে—তার কী সব অপূর্ব রঙ—নীলচে, সবুজ, বেগুনি। কিন্তু কোনো রঙটাই উগ্র নয়—সব স্নিগ্ধ সাদাটে আভা নিয়ে চওড়া হচ্ছে, সরু হচ্ছে আর তার থেকে আলো যেন থেকে-থেকে ঝরে পড়ছে। ক্রমশ যখন আলো প্রায় মাথার কাছে পৌঁছায়, তখন তার ছটার তুলনা নেই! এমন রোশনাই সারা সমুদ্রে!

ডান্ডেকার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে, "কলিনস্কি বুঝি তার দেশের মহিমা গাইছে?" কলিনস্কি বললে, "তুমি তো দেখেছ—বলো তো অরোরার সৌন্দর্য অপূর্ব কিনা।"

ডান্ডেকার বললে, "দেখতে যতই খপসুরত হোক, ঐ ভুতুড়ে আবহাওয়ায় মাথার ঠিক থাকে না।"

কলিনস্কি হেসে বললে, "ঠান্ডার কথা বলছ?"

ডান্ডেকার বললে, "না। ঠান্ডা তো মেরুর দেশের সাজ 'পারকা' পরলে আটকানো যায়। আমরা নাকাল হতাম উলটোপালটা রেডিও-সংকেতে। নিজেদেরই হোক, শত্রুরই হোক, এমন এলোপাথারিভাবে এইচ. এফ. ডি. এফ. (হাই ফ্রিকোয়েনসি ডিরেকশন ফাইনডার)-এ আওয়াজ আসত যে কোন দিক থেকে কত দূরে থেকে—কিছুই ঠিক পেতাম না। আর নিজের চোখে দেখা জিনিসও বিশ্বাস করা যেত না—কখনও মনে হত সামনের জাহাজগুলো জল থেকে উপরে উঠে চলেছে—যুধিষ্ঠিরের রথের মতো; কখন ঝাপসা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন দেখছি যে জাহাজগুলো ডিগবাজি খেয়ে মাস্তুল নীচুর দিকে করে উলটো হয়ে চলেছে; কখনও জাহাজগুলোয় খোল কাঠির মতো সরু হতে যেত! বাপ! সে যে কত রকমের আজব মরীচিকা, তার ঠিকানা নেই। তার উপর, ঝড় এলে তো সোনায় সোহাগা! দূর থেকে দেখলে—কালো মেঘের তলায় একটা সাদা পরদা ঝুলছে—তারপর সেই পরদাটাই যখন উড়তে-উড়তে এগিয়ে এল তখন টের পেলে ওটা তুষারঝড়।

একজন বাচ্চা সাব-লেফটানেন্ট কাছে এসে দাঁড়িয়ে-ছিল। সে ডান্ডেকারকে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আপনি তো ইংরেজের যুদ্ধজাহাজে রাশিয়া গেছেন— মানে, মহাযুদ্ধের সময় তো তখন দুই দেশে ভাই-ভাই ভাব। আচ্ছা স্যার, রুশ নৌসেনার সঙ্গে আপনাদের কী-রকম দোস্তি হত?"

ডান্ডেকার বললে "'আমাদের' বললে ভুল হবে। তুমি জানতে চাও, ইংরেজদের সঙ্গে ওদের পীরিত কেমন জমত। তা বিশেষ জমত না।

"যুদ্ধের সময় ছোটোখাটো বন্দরে দেখবার কীই-বা আছে? প্রথম দিন ছুটি পেয়ে ডক-ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে হয়তো কয়েকটা ইংরেজ আর রাশিয়ান নাবিকে দেখা হল, হাত পা নেড়ে কথা বলবার চেষ্টা হল, এরা বিলাতি বা আমেরিকান সিগারেট রুশদের দিল, রুশরাও তাদের সিগারেট এদের দিয়ে বললে—খেয়ে দ্যাখো, ভালো লাগে কিনা। তারপর পকেট থেকে ছেলে মেয়ে বৌ, নিদেনপক্ষে বান্ধবীর ছবি বের করে পরস্পরকে দেখাল। কিন্তু তারপর? পরস্পরের পিঠ-চাপড়ানো ছাড়া আর কিছু করবার থাকল না। ইংরেজ নাবিকদের মতে, বিলাতের মতো 'পাব' বা ভাটিখানা, যেখানে মদ-খাওয়া ছাড়াও গল্পগুজব করা যায়; নাচঘর, যেখানে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায়; সিনেমা, যেখানে পছন্দমতো ফিলম দেখা যায়, যেখানে সেসব নেই সেখানে জীবনটা নেহাতই বরবাদ। গান শুনতে বা থিয়েটার দেখতে মাঝে-মাঝে নেমন্তন্ন হত, কিন্তু ভাষা না বোঝায় দিলখোলা বিশেষ আনন্দ পেত না। অবসর সময়েরও অধিকাংশটা জাহাজেই সকলে কাটাত।"

"তার আসল কারণ", কলিনস্কি বলে উঠল, "ইংরেজ নাবিকদের না আছে পড়াশুনা, আর না বোঝে ভালো গানবাজনা।"

এধরনের আলোচনা আগেও বহুবার শুনেছি তাই একটু চোখ ফিরিয়ে দেখলাম—ঘরের অন্য কোণে কমল গাঙ্গী কতকগুলো ছোকরা অফিসারদের মধ্যে জমিয়ে বসেছে।

কমলের নামটা এমনই এদেশী যে, খুঁচিয়ে জিগ্যেস করে তার পরিচয় জানতে পেরেছিলাম। তার বাবা করিম ছিল কাজাকস্তানের কোন গণ্ডগ্রামের এক রাখাল। তার পালের একটা গোরু একদিন দলছুট হয়ে চলে গিয়েছিল অনেকদূরে। তার পিছনে ধাওয়া করে প্রায় ধরে ফেলেছে, এমন সময় এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটল। করিম দেখল, বিকট আওয়াজ করতে-করতে একটা ডানাওয়ালা দৈত্য উড়তে-উড়তে চলে গেল। সেটা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় —আজ থেকে সত্তর বছর আগেকার কথা। যতক্ষণ দেখা গেল সেইদিকে তাকিয়ে যখন মাটির দিকে চোখ ফেরাল তখন গোরুর পাত্তা নেই। করিমের আর নিজের গাঁয়ে ফিরে যাওয়া হল না। দৈত্যই হোক বা যন্ত্রই হোক, ঐটা যেদিকে গিয়েছিল সে সেইদিকেই চলতে আরম্ভ করল। কিছুদূর গিয়ে দেখলে, যন্ত্রটা সৈন্যদের একটা ঘাঁটির পাশে মাঠে বসে রয়েছে। কী যে হল করিমের সে-ই জানে। করিম সেই ঘাঁটিতেই কাজ জোগাড় করে ফেলল —তারপর সৈন্যদের সঙ্গেই দক্ষিণে গিয়ে তার প্রথম সাগরদর্শন হল। সেই থেকে তার প্রাণের শখ দাঁড়াল খোলা সমুদ্রে মাস্তুলের কাছ থেকে জগৎটাকে দেখবে। মওকা পেয়ে গেল যখন বলশেভিকদের জয় হয়। তখন

নৌবহরে লোকের দরকার—করিম সেখানে নাম লেখাল। তার একনিষ্ঠ কাজ দেখে তাকে অফিসারদের ইস্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তখনও সে ভালোভাবে রুশভাষা জানে না, তাড়াতাড়ি লিখতে পারে না—ধরে-ধরে লেখে। তারপর নিজের অধ্যবসায় আর সকলের সাহায্যে সেই অর্ধশিক্ষিত লোকটা একদিন যুদ্ধজাহাজের ক্যাপটেন হয়েছিল। সেদিন কমল খুব জাঁক করে বলেছিল, "এমনটা কি অন্য কোনো দেশে সম্ভব হত?" রুশরা যে সব বিষয়ে সবচেয়ে ভালো, এটা কমলের ছিল বদ্ধমূল ধারণা—যদিও মুখ ফুটে সেটা বলত না।

সেদিন ওদের কাছে গিয়ে শুনলাম কমল বলছে, "কনভয়টায় নানাদেশের ছত্রিশটা মালজাহাজ ছিল। তাদের ঘিরে নিয়ে যাচ্ছিল একুশটা ছোটোখাটো যুদ্ধজাহাজ ; তা ছাড়া কাছেপিঠে ছিল একটা বিমানবাহী জাহাজ, দুটো অতিকায় ব্যাটলশিপ আর ছটা ক্রুজার। তার মধ্যে তোমাদের 'মাইশোর'-ও ছিল— অবশ্য তখন তার নাম অন্য ছিল। মেভেজি স্বীপ থেকে আমরা কনভয়টাকে ঘিরে নিয়ে আসতে তৈরি ছিলাম। সেইজন্য আমাদের প্রথামতো আগে থেকেই অনেক দূরে দূরে সাবমেরিন পাঠানো হয়েছিল—শত্রুর যুদ্ধজাহাজ যাতে কাছে না ঘেঁষতে পারে।

"ষষ্ঠী জুলাই ১৯৪২ সারাদিন ধরে জারমানরা বিমান আক্রমণ করেও মাত্র চারটে জাহাজকে জখম করে। তার মধ্যে তিনটে থেকে লোকদের সরিয়ে নিয়ে কনভয়ের কর্তারাই ডুবিয়ে দেন যাতে খোঁড়া জাহাজের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে কনভয়ের গতি না কমে যায়। চতুর্থটা ছিল 'আজরবৈজান' নামে একটা রুশ জাহাজ। তার নাবিকেরা জাহাজের আগুন নিবিয়ে জলঢোকা বন্ধ করে খোঁড়াতে-খোঁড়াতেও চলতে থাকে—সাবমেরিন আর উড়োজাহাজ—দুয়েরই ভয় তুচ্ছ করে।

"এদিকে লন্ডন থেকে খবর আসে যে জারমানদের কয়েকটা বড়ো যুদ্ধজাহাজ এদিকে আসছে। শুনেই ইংরেজ কর্তারা মালজাহাজগুলোকে তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বিমানবাহী জাহাজটাকে ঘিরে রাখবার জন্য কনভয়ের চারপাশের সব যুদ্ধজাহাজগুলোকে পাঠিয়ে দিলে। ইংরেজরা যে ভীষণ ভয় পেয়েছিল তা বোঝাই যায়। তার আগের বছর জারমান যুদ্ধজাহাজ 'বিসমার্ক'-কে একা পেয়ে সেটাকে ডুবিয়েছিল বটে, কিন্তু তার জন্য মাশুল বড়ো কম দেয় নি। তাদের 'হুড' জাহাজটা তো দু মিনিটেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

"যুদ্ধ ব্যাপারটা! আমাদের এলাকায় পৌঁছবার আগেই মালজাহাজগুলোকে যেমন করে পারো নিজেরা যাও' বলে ছেড়ে দিলে, আর আমাদের একবার জানালেও না যে এইরকম হুকুম হল—এতই বাঁর আর সাহসী ব্রিটিশ নৌবহর। নয়ত আমরা চেষ্টা করতাম যতগুলো সম্ভব জাহাজকে আগলে নিয়ে যেতে। ফল যা হল তা মুখে আনা যায় না। তেইশটা জাহাজ জারমানরা ডুবিয়ে দিয়েছিল।

"এদিকে আমাদের একটা বড়ো সাবমেরিন কাটিউষা ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ দেখলে জারমানদের বেশ কটা ছোটোছোটো যুদ্ধজাহাজ দুটো বড়ো জাহাজকে ঘিরে নিয়ে চলেছে। এরকম বড়ো শিকার আমাদের ভাগ্যে তার আগে কখনো জোটে নি। ছোটো জাহাজগুলোর পাশ কাটিয়ে সবচেয়ে বড়ো জাহাজটাকে কী করে টর্পেডো মারা যায়—সেই হল লক্ষ্য। অবশ্য তা হলেও জাহাজটা যে ডুবে যাবে এ আশা সাবমেরিনের লোকদের ছিল না—কিন্তু নিজেদের জীবনের বদলে যদি জাহাজটাকে ভালোরকম জখম করতে পারে যাতে সারাতে অনেকদিন লাগে—তো সেটাও কম কথা নয়।

"জাহাজগুলো টর্পেডো আক্রমণ এড়াবার জন্য এঁকে-বেঁকে চলছিল। যে-কোনো মুহূর্তে জাহাজ থেকে শত্রু রা পেরিস্কোপ দেখে ফেললেই সর্বনাশ! তা জানা সত্ত্বেও কয়বার শত্রু তুলে দেখে-দেখে সাবমেরিনটা ঐ জাহাজগুলোর পিছু ধাওয়া করল। তারপর সুবিধা বুঝে টর্পেডো ছুঁড়তে তৈরি হচ্ছে, ঠিক তখনই এক-বার শত্রু তুলতে চোখে পড়ল যে বড়ো জাহাজটায় নানা নিশান উড়িয়েছে। কাটিউষার তৃতীয় ক্যাপটেন বুঝলে, তার মানে সব জাহাজকে বড়ো জাহাজটা কিছু জানাচ্ছে —আর সেটা কী হতে পারে? সব কটা জাহাজ হয়তো একসঙ্গে নতুন কোনো দিকে যাবে বা কসরত দেখাবে। সে দেখতে-দেখতেই লক্ষ করল যে জাহাজগুলো দিক বদলাচ্ছে। তখন সামনাসামনি আক্রমণের আশা নেই বুঝে সাবমেরিনটাকে তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে পিছন থেকে দাগলে চারটে টর্পেডো, আর তারপর বোঁ করে ঘুরে, অন্যদিকে ঘুরে দৌড়।

"জারমানরা তাঁকে খুঁজেই পেল না।

"ইংরেজরা এতগুলো জাহাজ নিয়ে যা করতে চায় নি বা সাহস পায় নি, আমাদের কাটিউষা একা তাই করেছে ; নয়তো ঐ কনভয়ের একটা জাহাজও হয়তো বন্দরে পৌঁছত না।"

"আমি ওকে একটু চটিয়ে দেবার জন্য বললাম, 'ওটা তো তোমাদের কথা। তোমরা আর ইংরেজরা ছাড়াও তো একটা দল ছিল—জারমানরা—তারা কী বলে?'"

খোঁচা খেয়ে কমল মহা খাপ্পা. "হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি—ঐ আডর্ডমরাল তো হিটলারেরই নৌসেনাপতি—সে কি সত্যি কথা বলবে নাকি? হাড় মিথ্যেবাদী ব্যাটা লিখেছে যে ইংরেজদের বিমানবাহী জাহাজটাকে খুঁজে বের করতে না পারলে হিটলার লড়তে বারণ করেছিল, তাই জারমান জাহাজগুলো ফিরে আসে।"

তারপর সগর্বে বললে, "জান, ঐ কাটিউষার ক্যাপ-টেনের স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে দেওয়া হয়েছে।"

রাশিয়ায় স্মৃতিস্তম্ভ আর যুদ্ধ-স্মারক বা ওয়ার মেমোরিয়ালগুলোর বেশির-ভাগই খুব প্রাণবন্ত—তার কারণ জানতে পেরেছিলাম কলিনস্কির কথায়। সে বলে-ছিল, যুদ্ধের সময়েও ভাস্কর্য শিক্ষায়তন বা স্কুল অব স্কাল্পচার্স থেকে লোক পাঠানো হয়েছে জাহাজে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে—সরেজমিনে ছবি এঁকে আনতে, মূর্তি গড়তে। তার থেকেই গড়া হয়েছে রাশিয়ার যুদ্ধ-স্মারকগুলো।

তখন ভেবে দেখি নি, এখন মনে হয়—আমাদের বুদ্ধি-জীবী আর সেনাবাহিনীর মধ্যে ইংরেজ যে আড়াল গড়ে দিয়েছিল—আজও তা সরে নি। দেশের লেখক, ভাস্কর, চিত্রকর—এরা কেউ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ে কোনো আদর্শগত অস্ত্র (আইডিওলজিকাল ওয়েপন) গড়ে তুলতে কোনো চেষ্টা করে নি। ইউরোপ-আমে-রিকায় সেনাবাহিনী নিয়ে গত মহাযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত কত হাজার বই লেখা হয়েছে, ছবি আঁকা হয়েছে, আর আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারেও স্বাধীন ভারতের সশস্ত্রবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কটা বই পাওয়া যায়?

এই সম্পর্কে আরেকটা দিনের কথা মনে আসে। তখন আমাদের প্রশিক্ষণ চলছে রাশিয়ার উত্তর দিকের একটা ছোটো বন্দরে। বন্ধু আইভান এসে বললে, "চলো একটু বেড়িয়ে আসি। বাতাসে বসন্তের আমেজ এসেছে।" আইভানকে দেখলেই আমার ভাল্লুকের কথা মনে হত। লম্বাচওড়া কাটখোট্টা মানুষ—মুখটা সর্বদাই গোমরা, মোটা-মোটা ভুরু দুটো কুঁচকে কাজ করত—যেন চার-পাশের কারবার তার মোটেই পছন্দসই নয়। আর আমি হলাম সাধারণ বাঙালি—লম্বায় ওর চেয়ে ফুটখানেক বেঁটে আর চওড়াতে বোধহয় অর্ধেক। তবু কেমন করে যেন আলাপ জমে গিয়েছিল। সেদিন হাতে ডবল দস্তানা আর গায়ে পেঁজা তুলোর জামার উপর লোম-দেওয়া কোট পরে, তার কথামতো আমি যখন বাইরে বের হলাম তখন কোথাও তো প্রচণ্ড শীতের কমতি দেখলাম না। সে কোত্থেকে বসন্তের আগমনবার্তা পেল জিগেস করতে বলল, "কেন? থার্মোমিটার শূন্য ডিগ্রীতে উঠে এসেছে। এর পর তো চড়চড় করে চড়বে।" গরম দেশের লোক আমি—হাসব কি কাঁদব ভেবে পাই না। রাস্তার মোড়ে দেখলাম এক বৃদ্ধ পানসে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। আমাদের দেশে পাহাড়পর্বতের উপরেও রোদ্দুর এরকম নিষ্প্রভ নয়। সূর্য যেন পোড়ামাটি রঙের একটি ফিকে ঢ্যাবলা, ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে—আর তার আলোতেই পথের ধারের জমা বরফ-গুলো চিক চিক করছে। কাছে যেতে আইভান বৃদ্ধটির সঙ্গে কথা বললে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে —বৃদ্ধ একসময়ে নৌবাহিনীতে ছিলেন। তিনি বললেন, "এইখানটায় এলে সর্বদাই একবার থামি—মনে হয় পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে এসে পড়েছি। তাদের সঙ্গেই পা ফেলে চলেছি।" কথাটা আমার ঠিক বোধগম্য হল না বুঝে তিনি বললেন, "এই চৌমাথার সব-কটা রাস্তার নামই গত মহাযুদ্ধে সফলতার জন্য সম্মানিত ক্যাপ-টেনদের নামে। আমিও তাদের সঙ্গেই ছিলাম। তোমার দেশেও এরকম অনেক মোড় আছে নিশ্চয়ই—যেখানে গেলেই পুরোনো যোদ্ধাদের স্মৃতি জেগে ওঠে।" আমি কলকাতার ছেলে—চৌক গিলে বললাম, "হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির প্রায় পাশের রাস্তাটাই তো কর্নেল বিশ্বাস রোড।" কিন্তু মনে-মনে লজ্জা পেলাম। কারণ কলকাতা ভরে রাজনীতিক থেকে ব্যবসায়ী, সন্ন্যাসী থেকে জাদু-কর—বিভিন্ন পেশার মানুষের নামে রাস্তা হয়েছে, কিন্তু কজন বীর সৈনিকের নামে রাস্তা হয়েছে? সুরেশ বিশ্বাস বহু বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার সেনাদলে আর ইন্দ্র রায় ইংলন্ডের বায়ুসেনায় সম্মানিত হয়ে-ছিলেন—তাই দেখেশুনে আমরাও একটা রাস্তার নাম তাঁদের নামে করেছি। তখন না হয় দেশ পরাধীন ছিল,

কিন্তু স্বাধীন হবার পরেও দেশের হয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে এরকম বাঙালির সংখ্যাও তো কম নয়। এই গত বিশ বছরের মধ্যেই তো পর্তুগীজদের সঙ্গে যুদ্ধে আনজেদিভ দ্বীপ অধিকার করতে গিয়ে যে কজন মারা যায় তার প্রায় অর্ধেক তো ছিল বাঙালি নাবিক—তারা প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় ঐ ঝুঁকি নিয়েছিল—কিন্তু তাদের মনে রাখবার কোনো চেষ্টার কথা তো শুনি নি।

আমি কলকাতার লোক শুনে বৃদ্ধ বললেন, "আমি ওখানে গিয়েছি। তখন দেখেছি কী সুন্দর সব সামরিক বোদ্ধাদের মূর্তি—কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে।"—বুঝলাম বুড়ো সব গুলিয়ে ফেলেছেন। বললাম, "ওগুলোর বেশির-ভাগই ইংরেজদের—সেগুলো সব আমরা সরিয়ে দিয়েছি।" বৃদ্ধ ভুলের জন্য লজ্জা পেলেন বোধহয়—বললেন, "তা হতে পারে, ভাষা তো পড়তে পারি নি ; কিন্তু পা মুড়ে প্রাচ্য কায়দায় খোলা তলোয়ার হাতে মূর্তিও যেন দেখেছি মনে হয়।" তারপর থেমে জিগ্যেস করলেন, "কিন্তু ওগুলো সরালে কেন? বেশ তো ছিল। ইতিহাসকে অস্বীকার করে লাভ নেই—দেখেছ তো লেনিনগ্রাডেই এখনও রাজা পিটারের গোটা আষ্টেক মূর্তি, খুব নজরে পড়ে এমন সব জায়গায় রয়েছে।"

মুখের ওপর বলতে ইচ্ছে করছিল—'রাজা পিটারের নজীর দিচ্ছ কিন্তু লেনিনগ্রাদ কুপোকাত করেছিলেন যে নায়ক তাঁর নাম ইতিহাস থেকে মুছে দিয়েছ কেন তোমরা?' কিন্তু বলা হল না। কী হবে!

এখন এই অবসর-পাওয়া দিনে মনে হয় যে আমাদের সমাজ রাজনীতি সর্বত্র যে গোলমাল বেধেছে তা ঐ অতীতকে অস্বীকার করার চেষ্টাতেই। অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা প্রায় একশ বছর আগেকার একটা প্রবন্ধ মনে আসে। তিনি বলেছেন,

"এখনকার নবাবহলে 'চাই নূতন,—চাই নূতন' 'কই নূতন—কই নূতন', 'এই নূতন—এই নূতন' বলিয়া এক তুমুল রব উঠিয়াছে,—জানেন না যে, পুরাতনকে ঠেস না দিলে নূতন একমুহূর্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। গোড়া না থাকিলে কি আগা থাকিতে পারে? ইতিহাসে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে, পুরাতন ভিত্তি-ভূমি সমূলে উন্মূলন করিয়া 'নূতন' যখনই ভূস করিয়া মাথা তুলিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই তাহা টুস করিয়া জলগর্ভে বিলীন হইয়াছে।"

জাহাজী জীবনে তো এমন কতই দেখলাম!

বুড়োর কাছে যখন জলযুদ্ধের বর্ণনা শুনেছিলাম, কোনো জ্যোতিষী যদি তখন বলত যে আমিও একদিন জলযুদ্ধে যোগ দেব, তবু তা বিশ্বাস করতাম না—সেটা ছিল তখন কল্পনার এতই বাইরে। অবশ্য সেইকালের গোছানো বা বাঁধাধরা দিনগুলোর যা কল্পনার বাইরে ছিল তেমন অনেক কিছুই পরে ঘটতে দেখলাম। এখন পিছন দিকে চাইলে বরং এক-এক সময়ে মনে হয় যে তখন যা ছিল প্রত্যাশিত বা সাধারণ সেটাই আজ অবিশ্বাস্য।

আমাদের পুরো জেনেরেশানটাই এই অঘটনপ্রবণতায় ভুগেছে, তবে আমার বেলা ভাগ্য যেন একটু বেশি রসিকতা করে খোঁপা-আটকানো কাঁটার মতো একদিকে চালাতে-চালাতে প্রায় পুরো উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে।

এই পলটনে যোগ দেওয়ার ব্যাপারটা ধরা যাক না কেন। খুব ছোটোবেলা থেকেই পলটনের সঙ্গে আমার ছিল নফরত। ঝি বলত, দুধ না খেলে পলটনরা ধরে নিয়ে কেল্লায় একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে দেবে। ইডেন গার্ডেনে যখন বেড়াতে যেতুম তখন সাহেবদের জন্য মার্কা-করা বেঞ্চিতে বসলে গোরা পলটন যে বেত মারবে তা সাথের দরোয়ানজী অনেকবার বলেছে। তা ছাড়া ছোটোবেলার যেটা সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল—ফুটবল খেলা—তাতে প্রত্যেক বছরেই বাঙালি দল (তখন বাঙালি দল বলতে বুঝতাম মোহবাগান) পলটনদের কাছে হেরে যেত। মোহনবাগান তখন খেলত খালি পায়ে আর পলটনরা বুট পরে। যেদিন মোহনবাগান জিতত সেদিন পৃথিবীটাকে সুন্দর মনে হত। মনের ভিতর যেন পাখি গান করত, আর তার পরেই যখন আরেক গোরাদলের কাছে হেরে যেত তখন সন্ধেটা হয়ে যেত বিস্বাদ, ইস্কুলের পড়া বা গল্পের বই—কোনোটাতেই মন বসত না।

হ্যাঁ, একবার পলটনকে একটু ভালো মনে হয়েছিল—সেটা হল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়। তখন আমি আছি মামার বাড়িতে। কতগুলো মুসলমান সিংহী-

বাজারের হিন্দুস্থানীদের তাড়া খেয়ে মামার বাড়ির বাগানে ঢুকে পড়েছিল। আনজুমান-ই-ইসলামের লরি ডেকে তাদের পার করে দেওয়া হয়। তাতে চারপাশের বস্তির গুন্ডারা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে দেওয়ালের বাইরে হল্লা করতে থাকে। হল্লা থেমে গেলে দেখা গেল দুটো কাবুলিওয়ালা রয়ে গেছে। তারা তাড়া খেয়ে চাকরদের পায়খানায় ঢুকে এক কোণে লুকিয়েছিল। তাদের কী করে পার করা যায়, এ হল ভাবনা। এমন সময়ে গলির মোড়ে দুজন গোরা পলটনকে দেখতে পেয়ে তাদের খাতির করে ডেকে এনে চা-বিস্কুট খাইয়ে অনুরোধ করা হল যে ঐ দুটো কাবুলিকে ভালোভাবে তাদের ডেরায় পৌঁছে দিতে। আমরা থাকতে এদের গায়ে কেউ হাত দেবে না' বলে তারা বুক ফুলিয়ে কাবুলিদের নিয়ে চলে গেল। তার কদিন বাদে কর্তাদের মধ্যে আলোচনা শুনলাম যে কোনো কাগজে নাকি বার হয়েছে যে ঠাকুর-বাড়ির লোকেরা অনেকগুলি মুসলমানকে আটকে রেখে-ছিল। খোদাতাল্লার কৃপায় আর গোরা পলটনের সাহায্যে তাদের অনেক কষ্টে উদ্ধার করা হয়েছে।

বহু বৎসর বাদে সৌম্যমামা (সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)-র সঙ্গে বসে এক দিন কথাপ্রসঙ্গে যাচাই করেছিলাম সেই শৈশবস্মৃতির কতটা সত্য। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, ওটা 'হানিফী'তে ছাপা হয়। 'হানিফী'র সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় ছিল। পরে দেখা হতেই জিজ্ঞেস করলুম তাঁকে যে খবরটা কোথা থেকে জোগাড় হল! তিনি হেসে বললেন, আনজুমান খবর দিল আপনি অনেক কটি মুসলমানকে বাঁচিয়েছেন। অবিশ্যি সঙ্গে-সঙ্গে বলেও দিল যে খবরটিকে বিকৃত করে ছাপতে। তাই করেছি ব্যাবসার খাতিরে। অবাক হয়ে শুনলুম তাঁর কথা। ব্যাবসার খাতিরে মিথ্যে কথা পরিবেশন করা হল হাজার হাজার লোককে, তাদের মনে ঢেলে দেওয়া হল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ, সব শুধু ব্যাবসার খাতিরে! কি চমৎকার সমাজব্যবস্থায় আমাদের বাস!"

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে পলটনে এতই যদি বিতৃষ্ণা তো শেষ পর্যন্ত তাতেই জুটলাম কেন, আর কী করে। বোঝাতে হলে ব্যাপারটা একটু বিশদভাবেই বলতে হয়।

তখন ডাক্তারি পাশ করে হাউস সার্জেনগিরিও শেষ করেছি। আমার এক বন্ধু তখন ডাক্তারিতে গুছিয়ে বসেছে—সে তার চেম্বারে বসে পরখ করে দেখতে বললে কিছু পসার জমাতে পারি কি না। ঘরটা ছিল কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়—রকমারি লোক, উদারীমান বা কমবয়সী কবি লেখক তার্কিক, অনেকেই সময় কাটাতে আসে। ফলে চেম্বারে লোকের ভিড় লেগে থাকে। সাহিত্য, শিল্প, কলা—আরো অনেক কিছুই জোর আলোচনা হয়। চা আসে পাশের দোকান থেকে দফে-দফে, কিন্তু রোজগার বিশেষ হয় না। এখানেই এক সংগীতজ্ঞ বন্ধু জানালেন যে গোয়ালিয়রে তানসেনের 'উর'টা শোনবার মতো। কিন্তু সে তো খরচা অনেক। দিল্লী পর্যন্ত যাওয়া-আসার রাহাখরচটা কেউ বহন করলে ব্যাপারটা অনেক সহজসাধ্য হয়। সেই থেকেই বুদ্ধিটা আসে যে পলটনে ডাক্তার হবার দরখাস্ত দিলে যদি তারা ইন্টার-ভিউয়ে ডাকে তো যাতায়াতের বড়ো অংশ সরকারি পয়সায় হয়। চাকরি সম্বন্ধে খুব আশা বা উৎসাহ ছিল না—কারণ জুটবে যে না, সে বিষয়ে অনেক দফায় নিশ্চিন্ত ছিলাম। প্রথমত, যে বয়সে সাধারণত লোকে পলটনে ঢোকে তার থেকে আমার বয়স বেশি। দ্বিতীয়ত, বাঙলার সন্তান, প্যাংলা চেহারা। তৃতীয় আর সবচেয়ে বড়ো কারণ, পুলিসের নথিপত্রে আমার যে ইংরাজ আমলের অপকর্মের ফিরিস্তি আছে তাতে কোনো উচ্চ স্তরের সরকারি কাজে নিতে কেউ সাহস পাবে না ; আর এ তো একেবারে খাস দরবারের পয়লা শ্রেণীর চাকরি—সাহেবদের সময়ে যাকে বলত 'ইম্পিরিয়াল সার্ভিস'—বহাল করবার বিধিটা সই করতেন স্বয়ং ইংলন্ডেশ্বরব।

চিকিৎসা ব্যবসায়, যাকে প্রাইভেট প্রাকটিস বলে, সেটাও যে আমার পক্ষে সহজে হবে না তাও তখন আমার কাছে পরিষ্কার। ঐ সময়েই আমার শুভানুধ্যায়ী লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক আমাকে উপদেশ দিলেন যে কেবল রোগী দেখবে না, তার পকেটটাও দেখবে। যার ট্যাঁক খালি তাকে নিয়ে মাতামাতি করে লাভ নেই—তারও না, তোমারও না। দেখবে এতে আখেরে ভালো হবে।

রুগীর কাছ থেকে পয়সা নিতে কিন্তু আমার বরাবর সংকোচ লাগত। ডাক্তারিটাকে ব্যবসায় হিসাবে নিতে আজও ঠিক পারি নে।

ঐ সময়েই চেম্বারে এক ভদ্রলোক এলেন—বৃদ্ধ, শীর্ণকায়, তবে জামাকাপড় পরিষ্কার। ইস্তিরি-করা। তাঁকে পরীক্ষা করে মনে হল রোগ বিশেষ কিছু নেই, দুর্বলতা আর বার্ধক্যটাই আসল। সেইমতো তাঁকে

আমি পুষ্টিকর কী কী খাওয়া উচিত বাতলে দিলাম। সবকিছু তিনি স্থিরভাবে শুনে বললেন, তার চেয়ে বরং আপনি ওষুধ-টষুধ যদি কিছু থাকে তো লিখে দিন। আমি দেখুন কোর্টে সামান্য কাজ করি, ঘরভাড়া দিয়ে ছেলেমেয়েগুলোর দুধের আর পড়ার খরচ জুগিয়ে আমার পক্ষে ফলমাছমাংসের যে লিস্ট দিলেন সেই-মতো খেতে ধারও কেউ দেবে না। লিখে দিলাম ওষুধ, কিন্তু এই দারিদ্রের স্বীকারোক্তির পর লজ্জায় আর ফি চাইতে পারলাম না।

তার পরদিন আমার ডাক্তার-বন্ধুটি খোঁজ করলেন, "তোমার কাছে কাল এক বুড়ো এসেছিল। তার কাছে পয়সা নাও নি?" বললাম, "না, গরিব মানুষ বেচারী।" বন্ধু হাসতে লাগল—বললে, সে ভদ্রলোক হাওড়া কোর্টের ভালো উকিল। আমার বন্ধু বলেছেন, তোমার ঐ বন্ধুর কোনোকালে পসার হবে না, কেমন ভালো মানুষটির মতো বিদিনপয়সায় ওষুধ লিখে দিল।"

এসব থেকে বুঝে ফেলেছিলাম যে চিকিৎসাব্যবসায় আমার নয়। ঠিক করলাম চাকরিই নেব। এমন সময় মিলিটারি থেকে ডাক এল। ইন্টারভিউ দিতে যেতে। বেরিয়ে পড়লাম—অবশ্য মিলিটারির চাকরি যে আমার জুটবে না, সে ধারণা তখনও বদ্ধমূল। তবু, রাজস্থানটা ঘুরে তো আসা যাক।

দিল্লী গিয়ে বন্দুকধারী শান্ত্রীদের কাছে কাগজ দেখিয়ে ছাড়পত্র নিয়ে যথাস্থানে উপস্থিত হলাম। বাইরে থেকে লাগে টালির ঘর—ভিতরে রঙকরা দেওয়াল, পুরু কার্পেট, পালিশ-করা চেয়ার-টেবিল। অন্য যারা আমার মতো অপেক্ষা করছে, তাদের মধ্যে কলেজের পরিচিত কয়েকজন ছিল, বাকি নানা প্রদেশের অপরি-চিত মুখ। অধিকাংশেরই দেখলাম বাপদাদা কেউ মিলিটারিতে আছে বা ছিল। তারা মিলিটারির অনেক কিছু জানে। বেশ কয়েকজন 'ক্যাচ'ও দিয়েছে। অবশ্য তাতে ঘাবড়াই নি, কারণ চাকরি যে জুটবে না, তা তো আগে থেকেই ধরে নিয়েছি। নাম ডাকতে ঘরে ঢুকে দেখলাম মস্ত বড়ো টেবিলের একপ্রান্তে আমি, বাকি টেবিলটা ঘিরে অনেকগুলো সবুজ মিলিটারি উর্দিপরা লোক—কাঁধে পেতলের তারা আর অশোকস্তম্ভের ছড়াছড়ি আর সকলেরই বুকভরা রঙবেরঙের ফিতে—যেন রঙের দোকানের রঙ পছন্দ করার চার্ট এক-একটা।

প্রথমেই একজন জিগেস করলেন, কেন মিলিটারিতে যোগ দিতে চাই। বললাম, লড়াইয়ের সময় তো সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে আসতে হবে, তাই শান্তির সময় যখন মাইনে একই কিন্তু কাজ কম, তখন যোগ দেওয়াই তো ভালো। আরেকজন জিগেস করলেন, 'কাজ কম জানলে কী করে?' আমি উত্তর দিলাম, 'পলটনরা তো বেশ স্বাস্থ্যবান, তাই।'

ওপাশ থেকে একজন প্রশ্ন ছুঁড়লেন, "রোজগারই যদি উদ্দেশ্য তো প্রাইভেট প্র্যাকটিসে আপত্তি কী?"

ততক্ষণে আমি একটু চটতে আরম্ভ করেছি। বললাম, "পসার জমাবার জন্য কী কী করতে হয় সেটা কলেজে শেখায় নি, বাড়িতেও অন্য কেউ ডাক্তার নেই, তাই শিখে নেবার সুযোগ পাচ্ছি না।"

আরেকজন জিগেস করলেন, তবে গোড়াতে ডাক্তারিতে ঢুকলাম কেন? বললাম, ইচ্ছে ছিল দেশবাসীর সেবা করব, কিন্তু এখন দেখছি তার জন্য বাপের সম্পত্তি থাকা দরকার—সেটা আমার নেই।

আমার ঠিক সামনে, টেবিলের উলটো দিকের মধ্য-খানের চেয়ারটা এতক্ষণ খালি ছিল। সেখানে এসে বসতে-বসতে একজন প্রশ্ন করলেন, "পলটনের কাজ তো বনে জঙ্গলে পাহাড়ে—সেখানে বেঁচে থাকবার জন্যই যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। তখন দেশবাসীর সেবার কথা মাথায় চড়বে না?"

"না, যদি দেখি তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু রোগ আছে তো কিছুটা সময় নিশ্চয়ই দিতে পারব।"

"তাতে স্থানীয় ডাক্তাররা চটবে না? ওটা করা কি উচিত হবে?"

আমি ততক্ষণে প্রশ্নবাণে বিরক্ত। আমার উদ্দেশ্য ছিল রাজস্থান ঘোরার খরচ বাঁচানো, সে ব্যবস্থা তো হয়েই গেছে। বললাম "মশাই, আমি যাদের চিকিৎসা করব তাদের ডাক্তারকে দেবার পয়সা থাকবে না বলে ডাক্তাররা তাদের চিনবেও না।"

ভদ্রলোক একগাল হেসে বললেন, "ঠিক বলেছ।" তখন লক্ষ্য করে দেখি যে ইনিই সেই ভদ্রলোক যাঁর সঙ্গে অনেকদিন আগে কলকাতায় তর্ক করেছিলাম। তারপর আর কেউ কিছু জিগোস করল না।—ডাক্তারি-সংক্রান্ত কোনো প্রশ্নই না। বেরিয়ে আসতে বলে দিলে, ওবেলা 'মেডিকেল'—দুটোর সময় জড়ো হতে।

খিদেয় তখন পেটে যেন ছুঁচোয় ডন মারছে কিন্তু খেতে যাই কোথায়? চারিদিকে আফিসঘর—সামনে খশখশের পরদা টাঙানো—কাঁধে-তারা-লাগানো অফি-সাররা গটমট করে ঢুকছে বেরুচ্ছে। উর্দিপরা চাপরাশি বেয়ারারা ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। শেষ পর্যন্ত গেটের কাছে দরোয়ান-গোছের এক সাদা-গোঁফওয়ালা বুড়োকে সবিনয়ে জিগেস করলাম এখানে খেতে কোথায় পাওয়া যায়। সে 'চলো' বলে আমায় সঙ্গে নিয়ে কয়েক-সারি টালির ঘর পার হয়ে একটা ক্যানটিনে হাজির করল। দেখে মনে হল, সব কেরানি আর বেয়ারার ভিড়। খাবার নেবার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হাসিঠাট্টা চলছে। মনে হল, যেন সাধারণ জীবনে ফিরে এলাম এতক্ষণ বাদে। আমার দিকে দু-একজন একটু আড়চোখে তাকাল। আমার পথপ্রদর্শক ঐ বুড়োর সঙ্গে ভাব জমালাম। সে যখন শুনলে ডাক্তারির খোঁজে এসেছি তখন উপদেশ দিল একটা কাউকে মুরুব্বি জোগাড় করতে। বুড়ো বললে, সে এখানকার পার্মেন্ট লোক, অনেক বছর কাজ করে ঘাঁতঘোঁত সব জানে। সে-ই বাতলালে যে ঐসব মিলিটারি-সাজ-পরা যারা ঘোরাঘুরি করছে তারা সব টেম্পুরিয়া—অর্থাৎ দু-তিন বছরের মেয়াদে এখানে এসেছে—তা সে বড়সাহেবই হোক আর চুনোপুঁটিই হোক। সে বলে চলে, "এরকম কত এল গেল—আমরা দেখলাম। আর ঐ যে বাঙালি কিরন (কেরানি) বাবু, কাশীর মুন্সিজী কি মাদ্রেজী আস্টন (অ্যাসিস্ট্যান্ট) বাবু দেখছ—এরাও কিন্তু পার্মেন্ট নয়। দিল্লীতে থাকলেও পাঁচ সাত বছর বাদ দপ্তর বদলায়। কেবল আমরাই হলাম বিলকুল পাকা পার্মেন্টো। টেম্পুরিয়া সাহেবরা আগে ছিল গোরা—দিলদরিয়া মেজাজ, কাম না করলে লাথি মারত জরুর কিন্তু বক-শিশও দিত জেব থেকে পাঁচ-দশের নোট বের করে। এখনকার কালো সাহেবরা মক্ষিচুষ—ডেকে গালি দিতেও সাহস নেই। কেবল দপ্তরে আর বাড়ি যাবার সময় আমাদেরই মতন সবজিবাজারে ঢোকে—দেখে আমারই শরম লাগে। হ্যাঁ, সেকালের গোরা সাহেবরা সাহেব ছিল বটে, বাজার কোন্‌দিকে টিনতই না। খুব জোর আমাকে ডেকে বলত, 'তাম্বাকু খতম হো গিয়া, ছোঁদলাল, লিয়াও জলদি' আর পাঁচ-দশ রুপেয়ার নোট হাতে দিত। পড়ি কি মরি করে সাইকেলে গিয়ে এনে দিতাম। কোনদিন পয়সা ফেরত কেউ কখনও চায় নি।"

তখন ঠিক বুঝতে পারি নি লোকটা কী কাজ করে—পরে জেনেছিলাম ছোঁদলাল—ঐখানকার ঝাড়ুদার।

রুটি-ডাল আর ঝাল তরকারি খেয়ে হেঁচকি তুলতে তুলতে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য হাজির হলাম যথাসময়ে।

চার-পাঁচ জন ডাক্তার পরীক্ষা করছে—কেউ রক্তচাপ দেখছে, কেউ চোখ পরীক্ষা করছে, কেউ কানে যন্ত্র লাগাচ্ছে। তারপর এলো দুজন—উচ্চতা আর ছাতির মাপ নিতে। এইখানেই হল মুশকিল—যতই জোরে নিঃশ্বেস নিই, ছাতি যতটা বাড়া উচিত তা নাকি বাড়ছে না। বলে 'পুরা নেহি হুয়া'। বার দুই-তিন চেষ্টা করে লোকটা কোথায় চলে গেল। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জামাটা পরে ফেলব কি না ভাবছি, এমন সময় চশমা-পরা, কাঁধে-অনেক-তারা-লাগানো, লম্বাচওড়া একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এল—বুঝলাম কোনো উপর-ওয়ালা। তিনি দেখিয়ে দিলেন কেমন করে ছাতিটা সবচেয়ে বেশি ফোলানো যায়। সেইমতো করতে, ফিতে-ধারী বললে, "হা, আভি হুয়া।" অফিসারটি মুচকি হেসে বললেন, "হতেই হবে। সকালবেলা যার জবাবে সকলে এত খুশি, বিকালে কি তাকে ফেল করিয়ে দেবে?"

কথাটা শুনলাম কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করলাম না। কারণ যতটা দেখেছিলাম একজন ছাড়া কারুর মুখের ভাবেই তো বদল দেখি নি—সব কটার মুখ ছিল চীনেমাটির বুদ্ধমূর্তির মতো নির্লিপ্ত।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর, 'বাড়িতে চিঠি যাবে' বলে ছেড়ে দিল। আমি বেরিয়ে গুটিগুটি করে চায়ের সন্ধানে সেই ক্যানটিনে উপস্থিত হলাম।

ক্যানটিনে দেখি ছোদিলাল বসে চা খাচ্ছে, সঙ্গে এক-জন শেরওয়ানিপরা ভদ্রলোক—কুচকুচে কালো রঙ, নেয়াপাতি ভুঁড়ি, একদিনের-না-কামানো দাড়ি, থোঁচা-খোঁচা গোঁফ, গালে টেবলো-করা পান। আমাকে বুড়ো সাদরে ডেকে নিলে। সঙ্গের লোকটির সঙ্গে চেনা করিয়ে বললে, "ইনি হলেন গুপ্তাজি, খুব কাজের লোক, চাকরি জোগাড় করে দিতে সিদ্ধহস্ত। চাকরি পেতে আপনাকে খুব সাহায্য করতে পারে।"

ভাবলাম বলি, চাকরি আমার দরকার নেই, আমি

ডাক্তার। তারপর মনে হল অনেক তো আমার বন্ধু আছে যারা সরকারি কেরানিগিরি পেলেও বেঁচে যায়—তাদের তরফেই না-হয় কিছু খোঁজখবর করি।

গুপ্তাজী জিগ্যেস করল এখানে কাকে 'মিলতে' এসেছিলাম। চিনি তো না কাউকেই—যিনি আমাদের ইন্টারভিউয়ের চিঠি সই করেছিলেন তাঁর নামটা করে দিলাম—কর্নেল লাল।

সামনাসামনি বসে কথা বলতে যেটা সবচেয়ে চোখে পড়ল সেটা হল গুপ্তাজীর খুদে-খুদে জ্বলজ্বলে চোখ দুটো।

উঠে বারান্দায় গিয়ে পানের পিক ফেলে ফিরে এসে বসে বললে, "কর্নেল লাল কিছু করতে পারবে না। মেডিকেলের লোক, বড়ো ভালোমানুষ। তবে হাঁ, একবার উনি ফোন তুলে বলে দিলে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় বাতিল হবার সম্ভাবনা থাকবে না কিন্তু তার আগে তো চাকরির খবর চাই।" বলে লাল-কালো ছোপধরা দাঁত বের করে একটু হেসে নিলে। তারপর লখনউ হিন্দিতে জানতে চাইল, লিখাই পড়াই কতদূর? নাম কী? নিজের নামটাই বলে দিলাম।

শুনে গুপ্তাজী একটু যেন দমে গেল। বললে, "এক্সচেনজে খরচ বেশি পড়বে—এস নেই।" বুঝতে পারছি না দেখে অনুকম্পাভরে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিল—

এমপ্লয়মেনট এক্সচেনজে নাম না থাকলে তো দরখাস্ত করা যায় না। এই ধরুন আমার নাম রামশংকর গুপ্তা। ওরফে আর এস গুপ্তা বা গুপ্তা আর এস—এখন দিল্লীতে নাম তো অধিকাংশই সর্দারজিদের—সব 'সিং' আছে। এক্সচেনজের দপ্তরে খুঁজলে একটা জি আর সিং পাওয়া শক্ত নয়। তখন একটা দরখাস্ত আর তদ্বির করতে হবে যে আদাক্ষরগুলো ঠিক থাকলেও নামটা লেখায় 'কেরানির ভুল' হয়েছে। তখন সেটাকে ঠিক করিয়ে নিয়ে চাকরির উমেদারি করো। এখন তোমার এ এম নিয়ে বড়ো মুশকিল। তবে ফিকর্ করার কিছু নেই, দু-একশো বেশি লাগবে হয়তো।" বলে হাতের চেটোয় রাখা চুনের একটা ছোট অংশ ডান হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে মুখে পুরে বললে, "মালিক, মালেক, মল্লিক গোছের কিছু খুঁজে বের করতে হবে আর কী।"

আমি মুখটা একটু কাঁচুমাচু-গোছের করে জিগ্যেস করলাম, ছোটোখাটো চাকরির জন্য কত দিতে হবে। গুপ্তাজী হাতদুটো মেলে দিয়ে বললে, "সে কি বলা যায়? সবই নসিব। আসল কথা হল একটা চাকরি খালি পাওয়া, আর সেখানে ঢুকে পড়া—কেরানি হোক, দপ্তরি হোক, টেলিফোন কোম্পানির ঠেলাওয়ালার সাকরেদ বা সি পি ডব্লিউ ডির সরকার—তাতে কোন বাত নেই—তারপর নসিব আর মেহনত। হাঁ, মেহনত করতে হয় বইকি—আমি আপার ডিভিশন কেরানি—আমাকে কেউ কিছু হুকুম করে না, তবু আজ অ্যাসিসটান্ট ডিরেক্টার সাহেবের বাড়ি যাব—সে আজ নতুন কোয়ার্টারে যাচ্ছে। গোলমার্কেট থেকে একটা ছোট রুই-মাছ হাতে নিয়ে যাব, সাহেব মেমসাহেব দুজনেই খুশি হবে। সাহেব দাম দিতে চাইলে তাও নেব, কেন নেব না? আমি কেরানি, চারশো টাকা মাইনে পাই, সরকারি ফ্ল্যাট একটা অনেক তদ্বির করে পেয়েছি—তার কেরায়া চল্লিশ রুপোয়া, তারপর পাঁচটা ছেলেমেয়ের ইস্কুলের খরচ, খাবার—দুধই লাগে মাসে ষাট টাকা—কাপড়জামা, আফিসের টিফিন, রাহা খরচ—সব চালাতে হয়। হাঁ, ফ্ল্যাটের একটা ঘর ভাড়া দিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়ার চল্লিশ টাকাটা উঠে আসে—আরো এদিক ওদিক রোজগার করতেই হয়।" তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "পাঁচটা বাজে। এবার তো দপ্তরে গিয়ে একবার চেয়ারে বসা দরকার?"

পরের দিন সন্ধ্যায় তার বাড়িতে বাকি আলোচনা হবে ঠিক করে বিদায় নিলাম। সেই ঠিকানা-লেখা কাগজটা কোনো দরকারে লাগবে না বলে, পরদিন আগ্রার বাসে ওঠবার সময়, পকেট ঝেড়ে ফেলে দিলাম।

[ক্রমশ

গুরুজীর সঙ্গে চীনে

শ্যামাদাস চক্রবর্তী

ভোজসভার ভোজ্য আর পরিবেশন প্রসঙ্গে কিছু বলি।

একটা বিশাল গোলটেবিলের চারপাশে অতিথিরা বসেছেন। গুরুজী, লালু আর আমার আলাদা-আলাদা টেবিল। প্রত্যেকেই যে-যার টেবিলে প্রধান অতিথি, তাঁকে ঘিরে সকলে সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলছে দোভাষী মারফত। প্রত্যেক টেবিলের উপরে একটু উঁচুতে আর-একটি ছোটো গোলটেবিল—সেটি আস্তে-আস্তে ঘোরে। বড়ো টেবিলটা স্থির—তার উপর ডিশ রেখে খেতে হবে। ঘুরন্ত টেবিলটায় এক-একটা করে পদ সাজিয়ে দেওয়া হয়—সেখান থেকে টানো আর তুলে নাও।

মেনুবোর্ডে লেখা রয়েছে কোন দফায় কী পদ আসছে, কিন্তু চীনা ভাষায়। এক-এক দফা আসছে আর দোভাষিণী লি চেনকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিচ্ছি—এবার কী এল। পনেরো দফায় প্রায় শ দেড়েক পদ পরিবেশন করা হল। এই দেড়শ খাবার আনতে আর খেতে আড়াই ঘন্টার মতো সময় চলে গেল। আমি তো যত দেরি করে পারি, যতক্ষণ ধরে পারি, এক-একটা আইটেম খেয়ে যাচ্ছি যাতে যতদূর সম্ভব কম পরিমাণে খাদ্য গলাধঃকরণ করতে হয়। কিন্তু নমো-নমো করে সারলেও অতগুলি পদ খেতে গিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত।

গুরুজী খাদ্যরসিক। ওদের একটি খাবার ওঁর খুব ভালো লেগে যায় অপূর্ব স্বাদের গুণে। নাম তার তোফু। সয়াবীনে তৈরি। পিষে বরফির আকারে কাটা, ঝোলে দিয়ে রান্না। দেখতে কতকটা আমাদের ধোঁকার ডালনার মতো। আর তাঁর মুখে খুব ভালো লেগেছিল বাঁশের কোঁড়ের তরকারি। প্রথম যখন পদটি সামনে এনে দিল—চেহারা দেখে অবাক! পাজামণ্ডপে যেমন কাঠের চিরুনি দেওয়া হয় নৈবেদ্যর থালায়—দেখতে অবিকল সেইরকম। একটি পাত্রে অনেকটা ঝোল, তার মধ্যে ওই-রকম চিরুনি। পরে ভালো করে দেখে বুঝলাম—বাঁশের কোঁড়টা ফেটেছেই অমনি করে।

আসলে, প্রত্যেক রান্নাটাই ওদের কাছে একটা সুকুমার শিল্প। পরিবেশনটাও তাই। চীনা রান্নার জগৎজোড়া সুখ্যাতির কথা তো জানাই ছিল। ওদেশে গিয়ে নিজের চোখে দেখলাম এ ব্যাপারে ওদের কী নিষ্ঠা, যত্ন আর সাধনা। রন্ধনকর্মকে ওরা সত্যিই এক পরিশীলিত কলার স্তরে উন্নীত করেছে—নিছক রসনাতৃপ্তির

সাধনমাত্র করে রেখে দেয় নি। ওরা চায় : পরিবেশিত অন্ন যেন শুধু ঘ্রাণ আর স্বাদের দিক দিয়েই তৃপ্তিকর না হয়ে, শোভন রূপের কল্যাণে যেন দৃষ্টিনন্দনও হয়ে ওঠে। একটি উদাহরণ দিই : ওরা যখন ডিমের ওমলেট পরিবেশন করবে তখন এমন সুন্দর করে সাজিয়ে দেবে যে মনে হবে—যেন একটি সুন্দর পাপড়ি-মেলে-দেওয়া ফুটন্ত ফুল। আহার ওদের কাছে জঠরানলনিবৃত্তি নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই-সঙ্গে শিল্পসুষমার উপভোগও বটে।

আজ অগস্ট ২৯, ১৯৮৩—পেইচিঙে তথা চীনে গুরুজীর প্রথম শিল্পানুষ্ঠান। প্রাতরাশ সেরেই গুরুজী সব যন্ত্রপাতি নিয়ে আমাদের দুজনের সঙ্গে চললেন পীপলস থিয়েটার অডিটোরিয়ামে। উদ্দেশ্য—স্টেজের ব্যবস্থা, আলোর আয়োজন, মাইক্রোফোনের স্বরপ্রসারণ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেখা : সব-কিছু বাঞ্ছিত মানে পৌঁছেছে কিনা। কোনো নিষ্ঠাবান শিল্পীই মঞ্চব্যবস্থা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকতে পারেন না—গুরুজীও নন। এককালে উনি ওঁর অগ্রজ উদয়শঙ্করের নৃত্যগোষ্ঠীতে ছিলেন। যে উন্নত মানের মঞ্চব্যবস্থাকে আশ্রয় করে ওঁদের অনুষ্ঠান আয়োজিত হত, গুরুজীর মনে তা একটি আদর্শ রচনা করে রেখেছে।

চীনে আমরা যেভাবে মঞ্চসজ্জা করতাম তার প্রকরণ ছিল এইরকম :

এক। সেতার কনসার্টের জন্য স্টেজটির প্ল্যাটফরম যেন স্টেজের ফ্লোর থেকে অন্তত দেড় ফুট উঁচু হয়।

দুই। প্ল্যাটফরমটি লাল কাপড়ে ঢাকা থাকবে।

তিন। মাইক্রোফোন থাকবে চারটি, আর তার শব্দক্ষেপণক্ষমতা হবে এইরকম : পণ্ডিতজীর জন্য দুটি, শতকরা-একশভাগ-ক্ষমতাযুক্ত। তবলার জন্য একটি, তার ক্ষমতা হবে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ। তানপুরার জন্য একটি, তার ক্ষমতা হবে শতকরা পঁচিশ ভাগ।

চার। ধূপের ছাই যাতে চারপাশে ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য ধূপদানিটি বসানো থাকবে একটি বড়ো ডিশের উপর।

পাঁচ। মঞ্চে পিছন দিক থেকে যেন কোনো আলো এসে না পড়ে। আলো আসবে সামনের দিক থেকে, আর তার রঙ হবে অ্যামবার (হরিদ্রাভ)।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিই :

অনুষ্ঠানে কী কী রাগ বাজাবেন, গুরুজী আগেই তা ঠিক করে রাখেন। যাঁরা ঘোষণা করবেন, চীনা ভাষায় তরজমা করবেন, তাঁরা যাতে রিহারসালের জন্যে যথেষ্ট সময় পান সেই উদ্দেশ্যে প্রোগ্রামের একটি বিবরণ আগে থেকেই দেওয়া থাকত। কারণ, ভারতীয় শব্দ যথাযথ উচ্চারণ করার ব্যাপারও ছিল। রাগগুলি তিনি নিজেই নির্বাচন করতেন, করে কোনো কোনো সময় বলতেন—কী রকম হবে বলো। চীনে ঐতিহ্যগতভাবে পেনটাটোনিক সুরের বহুলতার দরুনই বোধহয় গুরুজীর নির্বাচিত রাগের মধ্যে ঔড়ব-ঔড়ব অর্থাৎ পাঁচসুরের রাগই ছিল প্রধান। তবে অন্যান্য রাগও বেশ কিছু বাজিয়েছেন।

সব-কটি অনুষ্ঠানেই উনি মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করতেন। ঘণ্টা তিনেকের একটি অনুষ্ঠানকে উনি দুটি অংশে ভাগ করে নিতেন। প্রথমার্ধে থাকত পরপর দুটি রাগে মাঝারি আয়তনের অনুষ্ঠান। তাতে অতিসংক্ষিপ্ত আলাপের সাহায্যে রাগের চেহারাটি একটু দেখিয়ে দিয়েই গুরুজী মধ্যলয়ে, অথবা প্রথমে বিলম্বিতে, পরে মধ্যলয়ে গত ধরতেন। প্রথমার্ধে দুটি রাগ এইভাবে বাজানোর পরে, মিনিট পনেরোর বিরতি। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই থাকত আসরের মুখ্যতম অনুষ্ঠান—একটি বড়ো রাগে আলাপ, জোড় আর ঝালা। এটি চলত প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে। অনুষ্ঠান শেষ হত ঠুংরী বা ধুনজাতীয় ঈষৎ লঘুচালের বাজনা দিয়ে, কখনো বা রাগমালাও বাজাতেন। এই অংশে তবলার সওয়াল-জবাব, এমনকি লহরাবাদনের সুযোগও করে দিতেন।

পীপলস থিয়েটার অডিটোরিয়ামে ২৯ অগস্টের অনুষ্ঠানটি যখন শুরু হল তখন সন্ধ্যা সাতটা বেজে পনেরো মিনিট। শ্রোতার সংখ্যা ১২০০। কোন্ রাগ কীভাবে কোন্ তালে বাজাবেন এবং তার বিভাগ কী কী, সব-কিছুই শুরুতে বলে দিলেন গুরুজী। দোভাষিণী শ্রীমতী লাও আবার সেটা চীনা ভাষায় তরজমা করে শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিলেন।

পণ্ডিতজী চীনে কেমন বাজান, কী দিয়ে শুরু করেন, কেমন করে ধীরে-ধীরে রাগের রূপটি ফুটিয়ে তোলেন—এসব নিয়ে এক বিপুল কৌতূহল আমারও ছিল। এই সুদূর চীনে—যেখানে ভারতীয় মার্গসংগীত

শোনার অভ্যাস কারো নেই বললেই চলে, সেখানে অনভিজ্ঞ শ্রোতাদের সামনে কীভাবে উনি রাগসংগীত পরিবেশন করেন, আমার কাছে সেটা বিশেষ শিক্ষণীয় ব্যাপার বলে মনে হয়েছে। শুনেছিলাম, চীনের সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী রীতিমতো সংগীতজ্ঞ। কিন্তু তাঁদের মতো মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে বাকি শ্রোতাদের ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত সম্বন্ধে তেমন জ্ঞান নেই বলেই মনে হয়। এহেন শ্রোতৃকুলের সামনে প্রথাবদ্ধ শাস্ত্রসম্মত সংগীত পরিবেশন না করে চটুল, অসতর্ক বা স্বেচ্ছাচারদুষ্ট সুললিত বাদনে জনমনোরঞ্জন করা গুরুজীর পক্ষে আদৌ কঠিন ছিল না। অপরপক্ষে, রাগসংগীত পরিবেশনের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখে গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠান করলেই বা চীনাদের অনভ্যস্ত শ্রবণে তা কতকটা গ্রহণযোগ্য হবে, এ নিয়েও শিল্পীর মনে সংশয় থাকা বিচিত্র নয়। এইসব মিলিয়ে আমার খুব কৌতূহল ছিল এইটা দেখার যে গুরুজী শেষ পর্যন্ত কী করেন। বিশেষত একশ্রেণীর সমালোচকরা বিদেশে ওঁর জনপ্রিয়তার নিরিখে ওঁর বাদনের শাস্ত্রীয় শুদ্ধতা আর গাম্ভীর্য নিয়ে যেরকম কটাক্ষ করে থাকেন।

কিন্তু বলব কী—আমি দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলাম (নিরপেক্ষভাবেই বলছি)—সারা সফরে গুরুজী অত্যন্ত সীরিয়াস হয়ে রাগের পূর্ণ বিশুদ্ধি রজায় রেখে সংগীত পরিবেশন করে গেলেন, যেন যাঁদের সামনে তিনি বাজাচ্ছেন তাঁরা ঐ সংগীতের পূর্ণ সমঝদার আর কদরদান ব্যক্তি। মনে হত, যেন ভারতেরই উৎসাহী শ্রোতায় পরিপূর্ণ কোনো সংগীতের আসরে বসে বাজাচ্ছেন। শুধু প্রথম আসরেই নয় ; যেখানেই যখন যে রাগ বাজিয়েছেন, অতীব নিবিষ্টচিত্তে তন্ময় হয়ে খানদানি ঢঙে রাগের গভীরে প্রবেশ করে বাজাতে প্রয়াসী হয়েছেন। রাগের বিশুদ্ধি বা শাস্ত্রসম্মত বাদনপদ্ধতি হতে এইটুকু বিচ্যুতি ঘটাতে কিংবা অবোধজ্ঞানে শ্রোতাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অবহেলা প্রদর্শন করতে তাঁকে দেখি নি। শ্রোতারা বুঝল বা না বুঝল, যথার্থ কদর করল কি না করল—সেসব নিয়ে যেন তাঁর মোটেই মাথাব্যথা নেই। কখনো যদি-বা দর্শকদের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়ার পরিবর্তে অস্থিরতার চিহ্ন তাঁর চোখে পড়ে থাকে, তখন ঈশ্বরলাল আর আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়াটি খুঁজছেন, কেননা 'একাকী গায়কের নহে তো গান'। অবশ্য এটাও ঠিক যে স্বল্পপরিসরে একাধিক রাগের পরিবেশন করতে গিয়ে বা দর্শকদের মেজাজ অনুসারে ওঁকে স্থানবিশেষে রাগপরিবেশনে আনুপাতিক মাপজোকের ঈষৎ তারতম্য ঘটাতে হয়েছে। কিন্তু যেটুকুই বাজান না কেন, তা হয়েছে পুরোপুরি শাস্ত্রসম্মত, শৈথিল্য বা বিচ্যুতি হতে সর্বথা মুক্ত।

ঐ দিনের অনুষ্ঠান গুরুজী শুরু করেন ভূপালী রাগ দিয়ে। পাঁচসুরের রাগ। এই ধরনের স্বরসমাহারের সঙ্গে চীনাদের খানিকটা পরিচয় আছে বলেই বোধহয় প্রথম অনুষ্ঠানের জন্য এই রাগটি বেছে নিয়েছিলেন। তবে বাজাচ্ছেন তো এমন সব শ্রোতাদের সামনে যারা ভারতীয় মার্গসংগীত এবং সেতার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। উনি হয়তো ভেবে থাকবেন—বেশিক্ষণ আলাপ করলে ওরা হয়তো ধরতে না পেরে চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। তাই আরোহণ-অবরোহণের সঙ্গে যতটুকু সুরের কাজ করা একান্ত প্রয়োজন তাই দিয়ে ভূপালীর আলাপটি খুবই সংক্ষেপে সারলেন। তারপর একেবারে চলে গেলেন মধ্যলয় তিনতালের গতে। এটি গতপ্রধান বাদন হলেও এতে খুব মজা ছিল। ভূপালী গত শেষ হতে প্রায় আধঘণ্টা লাগল। অনুষ্ঠানটি খুবই সংহত আর উপভোগ্য হয়।

গুরুজীর প্রোগ্রাম শুরু করার কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি বা শৈলী আছে। আমরা সাধারণত যেভাবে বাজনা আরম্ভ করি, তার থেকে ওঁর কায়দাটি স্বতন্ত্র। আমরা যেমন সেতার, তবলা, তানপুরা ইত্যাদি অনেকক্ষণ ধরে বাঁধছি তো বাঁধছি, শেষে বাঁধা হয়ে গেলে বাজাতে গিয়ে বলি—তাহলে এবার শুরু করি?—এইরকম একটা ঢিলেঢালা ভাব সাধারণত থাকে। অপরপক্ষে, গুরুজী সেই কথাটা মুখে না বলে কাজে বুঝিয়ে দেন। যারা ওঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকে তারা এটা জানে বা লক্ষ করে থাকে।

জিনিসটা এইভাবে হয়—উনি যন্ত্র বাঁধলেন, তানপুরা বাঁধা হল, তবলা বাঁধা হল। সব ঠিক হল। তানপুরা ছাড়ছি। উনি সেতারে টোকা দিয়ে দেখলেন আওয়াজ ঠিক আছে, সব যন্ত্র সুরে বাঁধা হয়েছে, সব ঠিক আছে। এইবার হঠাৎ দুটো হাত প্রসারিত করে ইঙ্গিতে সব বন্ধ

করে দেন। এই বন্ধ করাটাই হচ্ছে একটা নীরব উচ্চারণ যে এবার তোমরা চুপ করো। যত অবোধ, নির্বোধ বা অধীর শ্রোতাই হোক না কেন, তখন চুপ করে যায়। এই চুপ করতেই উনি শুরু করেন। এতে করে যেন উনি সমস্ত শ্রোতাদের মনোযোগ নিঃশেষে কেড়ে নেন। এটা একটা দেখবার মতো জিনিস। যন্ত্রপাতি সব বাজছিল, মাইক গমগম করছিল ফুল ভল্যুমে, হঠাৎ ঘরে নেমে এল পূর্ণ নিস্তব্ধতা। এই আকস্মিক নিঃস্পন্দ নীরবতার আবির্ভাবমাত্রই শ্রোতাদের গুঞ্জনও আপনি স্তব্ধ হয়ে যায়। এই সুযোগে উনি তখন বাজনাটি ধরেন।

চীনের প্রথম আসরের প্রথম বাজনার শুরুও এইভাবেই হয়েছিল। ভূপালীর আলাপ আরম্ভ হতেই ওরা বুঝতে পারল যে এই শুরু হচ্ছে। তার পূর্বমুহূর্তেই যত কলগুঞ্জন আপনা হতেই থেমে গেছিল। শুরুটা ধরতে পারলেও শেষটা কিন্তু ওরা প্রথম প্রথম বুঝতে পারে নি। ওদের পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভবও নয়। দ্রুত বাজনার বিভিন্ন পর্যায়ে উত্তরোত্তর লয় বাড়িয়ে, নানা ধরনের কাজ, লয়কারি, ঝালা, সওয়াল-জবাব, তেহাই প্রভৃতি দিয়ে সমে এসে শেষ করার প্রচলিত রীতি ওদের কাছে একান্ত অপরিচিত। কাজেই ওরা কিভাবে বুঝবে যে এটা শেষ হল না কী হল? কিন্তু গুরুজী শেষ করলেন এমন অভিনব কৌশলে যে ওরাও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল যে বাদনের এই পর্বটি এখানেই শেষ। পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলিতে প্রচলিত কায়দায় তেহাই দিয়ে শেষ করলেও প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে তেহাই দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। তেহাইয়ের পরে ভূপালীতে যে কটি পর্দা লাগে সেগুলি খুব আস্তে-আস্তে উত্তরোত্তর মিহি করতে-করতে মুদারার পঞ্চমে এসে আস্তে করে সুরে দাঁড়িয়ে, হাতটা সেতার থেকে তুলে রেখে দিলেন। অবোধ শ্রোতাদেরও বুঝতে অসুবিধা হল না যে আওয়াজটা মোটা থেকে ক্রমশ পাতলা হয়ে মিলিয়ে গেল। যেন কী একটা ছিল, আর নেই। ঐখানে গুরুজী দাঁড়িয়ে গেলেন। আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। ঘরে আবার আগেকার নিস্তব্ধতা নেমে আসতেই ওরা বুঝতে পারল —এবার শেষ। তখন শুরু হল হাততালি। আর তা চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

তারপর হাততালিটা যখন খানিকটা থেমেছে তখন গুরুজী ঘোষণা করলেন—এবার উনি বাজাবেন খাম্বাজ, বিলম্বিত তিনতালে এবং দ্রুত একতালে। আরো বললেন যে, ঐ বাজনার পর মিনিট পনেরোর জন্য অনুষ্ঠানের বিরতি। দোভাষিণী ওঁর কথা তরজমা করে বুঝিয়ে দিলেন।

খাম্বাজ রাগে বাজনা শুরু হল। মুখপাত করলেন তিনি পূর্বানুরূপ সংক্ষিপ্ত আলাপ দিয়ে। তারপরই চলে গেলেন বিলম্বিত গতে। ভূপালীর তুলনায় খাম্বাজ বাজিয়েছিলেন আরো বেশিক্ষণ ধরে। এই অনুষ্ঠানটিও খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

খাম্বাজবাদন শেষ হতেই শ্রোতাদের অভিনন্দন শুরু হল। হলের পিছন দিকে যারা বসেছিল তাদের প্রতিক্রিয়া অন্ধকারে ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও ফুটলাইটের আলোয় দেখতে পেলাম—সামনের কিছু লোক প্রথমে আসনে বসে হাততালি দিতে লাগল, পরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল, এবং শেষে স্টেজের দিকে এগিয়ে এল হাততালি দিতে-দিতে। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডাতেও আমি শ্রোতাদের এই রীতি অনুসরণ করতে দেখেছি। জানি না, চীনারাও তাদের কাছ থেকেই এটা নিয়েছে কিনা। তবে শুনেছিলাম, এইভাবে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় অবস্থান করতে-করতে তালি দিয়ে যাওয়ার অর্থ হল এইটা ব্যক্ত করা যে আমরা কলাকারের সংগীতপরিবেশনে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছি।

বিরতির পর পরদা উঠতে গুরুজী প্রথমে আসরের প্রত্যেকটি যন্ত্রের সঙ্গে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন —সব আসরেই উনি এই পদ্ধতি গ্রহণ করতেন। কোন্ যন্ত্রের নির্দিষ্ট ব্যবহার কী, সেটি উদাহরণসহযোগে বুঝিয়ে দিলেন। আগে বোঝালেন, সেতারের ব্যবহার কী। তারপরে তবলা, সবশেষে তানপুরা। তবলার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন বোল উনি মুখে-মুখে আউড়ে গেলেন, আর ঈশ্বরলাল সেগুলি বাজিয়ে দেখিয়ে দিল। গুরুজী সহশিল্পীদের পরিচিতিও দিলেন। ঈশ্বরলালকে দেখিয়ে বললেন, ভারতের একজন বিশিষ্ট তবলচি বা ড্রামপ্লেয়ার। তারপর আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, শ্যামাদাস, আমার সেতারের প্রিয় ছাত্র। ও এখন তানপুরা বা ড্রোন বাজাচ্ছে।

যাই হোক, আসরের কথায় আবার ফিরে আসি। এরপর গুরুজী ধরলেন ঐ সন্ধ্যার মুখ্যতম অনুষ্ঠান—মালকোষ রাগে আলাপ, জোড় আর ঝালা। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে রাগটি বাজালেন, তবে গত বাজান নি। আগেই বলেছি, উনি এই সফরে যে ছকটি অনুসরণ করতেন তাতে মুখ্য রাগটিতে গত অঙ্গটি বাজত না; শুধু আলাপ, জোড় আর ঝালাই বাজত।

মালকোষ রাগের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন—গাম্ভীর্যে মহিমায় পরিপূর্ণ, বীররস এবং ভক্তিরসের আধার এই প্রাচীন রাগটি পাঁচটি মাত্র সুরকে আশ্রয় করে রচিত হলেও ব্যাপ্তি আর গভীরতা এতই বিশাল যে এই ঔড়ব-ঔড়ব রাগটি বড়ো রাগের পর্যায়েই পড়ে, এবং বড়ো করে বাজালেই যেন এর প্রতি সুবিচার করা হয়। আমি তাই ভাবছিলাম—দ্বিতীয়ার্ধে গুরুজীর হাতে আর তো মাত্র ঘণ্টা দেড়েকের মতো সময় আছে; এর মধ্যে মালকোষের রূপটি পূর্ণভাবে ফোটানো, এবং তারপরে আবার আর-একটি রাগে গত বাজানো—এত সব করার সময় উনি কোথা থেকে পারেন? কিন্তু দেখলাম—ঐ পুরো সময়টাকে উনি দুই-তৃতীয়াংশ আর এক-তৃতীয়াংশ, এই অনুপাতে ভাগ করে নিলেন। দুই-তৃতীয়াংশ সময়টি দিলেন মালকোষের জন্য, এবং ঐ পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে ঘণ্টাখানেকের মতো সময়ে মালকোষ রাগে যা বাজালেন তা এককথায় অসাধারণ। যুগপৎ পরিমিতিবোধ এবং রসনিপুণ রাগরূপপরিস্ফুটনের এক বিরল উদাহরণ। ঐটুকু সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ আলাপ জোড় ঝালা বলতে যা বোঝায়—সব বাজিয়ে শোনালেন। সে একটা কমপ্যাক্ট বস্তু—মনে হল একটা জমাট জিনিস যেন। যেন অনেকক্ষণ ধরে বাজিয়ে রাগটিকে আগে থেকে পুরোদস্তুর জমিয়ে নিয়ে শ্রোতাদের সামনে পরিবেশন করছেন। ঠিক যেন আগে থেকে তৈরি করে বাজানো।

আর আলাপের কোয়ালিটি যা হয়েছিল তা আর কী বলব! সেখানেও এক উদারার ধৈবতের উপর আঙুল রাখতেই গোটা স্টেজ মালকোষের সৌরভে একেবারে ভরপুর হয়ে গেল। দু-তিনটে পরদা দিয়ে কীভাবে যে চট করে সুর জমিয়ে দেওয়া যায়, তা যে না শুনেছে সে ভাবতে পারবে না। প্রথম মুদারার সা ধরেই উনি খাদের ধৈবতে চলে গেলেন, আর তারপর ধা থেকে মীড় টেনে মুদু নিষাদ স্পর্শ করে এক মীড়ের ধাক্কায় পৌঁছে গেলেন মুদারার সুরে। ঐ এক ঐন্দ্রজালিক মীড়ের টানেই মালকোষ জমে গিয়েছিল। অন্তত আমার কাছে। ধা থেকে সা যে দোলাতে উনি গেলেন তাতে আমরা যারা একটু-আধটু গানবাজনা করি তাদের কাছে একঝলকে রাগের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেল। রাগের ঘোষণা যদি বা শোনা নাও যায়, ঐটুকু শোনা গেলেই বোঝা যাবে যে উনি মালকোষেই যাচ্ছেন। এই একমীড়েই এভাবে সুর জমিয়ে দেওয়া—এ এক অসীম ক্ষমতা দেখলাম গুরুজীর।

আলাপ, জোড়, ঝালা হয়ে যাবার পর মালকোষবাদন তো শেষ হল। তারপর আসরে কয়েক সেকেন্ড থমথমে নিস্তব্ধতা। মনে হল, শ্রোতারা বোধহয় বুঝতে পারে নি যে অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। কিছুক্ষণ পরই তুমুল উচ্ছ্বাসে-তোলপাড় হাততালি শুরু হল, আর তা চলল প্রায় মিনিট খানেক ধরে। তারপর মনে হল, মালকোষ শেষ হলেও তার রেশটি বেশ কিছুক্ষণ রয়ে গেল।

মালকোষের পর গুরুজী ধরলেন মিশ্রগারা। এটি ছিল মধ্যমসেগারাতে ঈষৎ হালকা মেজাজের বাজনা। আমাদের এখানে যেমন ঘণ্টা আড়াইয়ের প্রোগ্রামের পর একটা ধুন বাজান, সেদিনের বাজনাতেও ঐ মুডটা ছিল আর কী। চাঁচর তালে শুরু করে পরে দ্রুত তিনতালে চলে গেলেন। শেষের দিকে মিনিট দশেক ঈশ্বরভাইকে একক তবলাবাদনের সুযোগ করে দিলেন। অর্থাৎ সেতারটি নামিয়ে রেখে গুরুজী হাতে তাল দিয়ে গেলেন, আর ঈশ্বরলাল লহরা বাজিয়ে গেল। শেষে আবার সেতার আর তবলা একযোগে বাজতে লাগল। অপূর্ব সুন্দর বাজনা বাজিয়েছিল লালুভাই। প্রচুর হাততালি পড়তে লাগল। তারপর শুরু হল সওয়াল-জবাব, সেতার আর তবলার তাৎক্ষণিক ছান্দসিক বাগ্‌বিনিময়। তত এবং আনদ্ধের যৌথ আমন্ত্রণে যেন অধরা মাধুরী ছন্দোবন্ধনে ধরা দিয়েছে। সুর আর ছন্দের এই লীলায় শ্রোতৃকুলের সাড়া জাগল অচিরেই। মুহুর্মুহু আনন্দে ফেটে পড়ল তারা। তারপর অতিদ্রুত ঝালা আর তেহাই দিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ। সান্ধ্য অধিবেশনেরও সমাপ্তি।

[ক্রমশ

আ লো চ না

দেশে বিদেশে

তব্ গণতন্ত্র

ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রী এম এইচ বেগ সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে এদেশে গণতন্ত্র এবং সংসদীয় শাসনব্যবস্থার উপযোগিতা সম্পর্কে দু-একটি মন্তব্য করেছেন। এখন তিনি ভারত-সরকার-নিয়োজিত সংখ্যালঘু কমিশনের সভাপতি। সেই কমিশনের চতুর্থ রিপোর্টের ব্যাখ্যা করতে গিয়েই তিনি কয়েকটি মন্তব্য করেন। শ্রী বেগের বক্তব্যের পূর্ণ বয়ান আমরা পাই নি। সংবাদপত্রে তাঁর সাংবাদিক বৈঠকের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নজরে এসেছে। কিন্তু যেটুকু হাতে এসেছে গুরুত্বের দিক থেকে তাও নেহাত কম নয়।

বিচারপতি বেগ বলেছেন, সাম্প্রদায়িক শক্তিসমূহকে দমন করবার জন্যে এবং যারা ধর্মান্ধতা প্রচার করছে এবং লোকের ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির মূলোচ্ছেদ করছে, তাদের বাগে আনার জন্যে আরও শক্তিশালী সরকার এদেশের প্রয়োজন।

সরকারের শক্তিবৃদ্ধি কী উপায়ে সম্ভব সে বিষয়েও শ্রী বেগ বক্তব্য অস্পষ্ট রাখেন নি ; তিনি বলেছেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সংসদীয় সরকার এইসব অশুভ শক্তিকে কড়া হাতে দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব, তাঁর মতে, দেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জায়গায় এমন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন আশু প্রয়োজন যার হাতে আরও বেশি ক্ষমতা থাকবে।

প্রকাশিত বিবরণ পড়ে মনে হয়, এই কথার পর সাংবাদিকরা কেউ সম্ভবত শ্রী বেগকে প্রশ্ন করে থাকবেন—বর্তমান শাসনব্যবস্থার বদলে অধিকতর-ক্ষমতাসম্পন্ন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন। সে ব্যাখ্যা তিনি দেন নি। তবে এ কথাও বলেছেন, তিনি ডিকটেটরশিপ চান না ; পাকিস্তানের মতো সামরিক শাসন—তাও চান না। তবে কী চান? বার কয়েক নাকি তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর উল্লেখ করেছেন এই নামে—'ডিসিপ্লিনড ডেমোক্রেসি'।

অনেকে ছোটো একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্মরণ করবেন—কোনো এক অতীত যুগে যার ইচ্ছে সে নির্ভয়ে বলতে পারত, আমি গণতন্ত্র পছন্দ করি না। এখন গণতন্ত্রের নামে আচমকা না করে কোনো দেবতারই পুজো দেবার রীতি নেই। তাই 'ডিসিপ্লিনড ডেমোক্রেসি' জাতীয় এমন বস্তুর কল্পনা করতে হয়, যা (ইংরেজি বাগ্‌ধারা অনুসরণ করে বলা যায়) না মাছ, না মাংস, না উত্তম লাল হেরিং।

জরুরি অবস্থার একটি শ্রুতিসুখকর নাম বিনোবা ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন—অনুশাসনপর্ব। শ্রী বেগের কল্পিত শৃঙ্খলাপরায়ণ গণতন্ত্রে যাবার সেইটাই রাস্তা কিনা কে জানে। সংবিধান সংশোধনের, সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি-প্রধান ব্যবস্থার প্রবর্তনের প্রস্তাব কোনো কোনো অতি উচ্চ মহল থেকে অবশ্য শোনা যাচ্ছে, কিন্তু ডিসিপ্লিনড ডেমোক্রেসির প্রস্তাব এমন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে এই প্রথম শোনা গেল। শ্রী বেগ যদিও সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার প্রসঙ্গেই 'ডেমোক্রেটিক সিসটেম' এবং 'পার্লামেন্টারি গভর্নমেন্টে'র অক্ষমতার কথা বলেছেন, তবু ধরে নেওয়া যায়, সাধারণভাবেও তিনি অন্য কোনো ধরনের শাসনব্যবস্থার পক্ষপাতী।

সাধারণভাবে গণতন্ত্রের নানারকম অসুবিধাজনক দিক নানা সময়ে প্রকট হয়ে ওঠে—আপৎকালে তো বটেই। শ্রীমতী গান্ধী নিজেও লন্ডনের 'সানডে টাইমস' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গত ১০ জুন বলেছেন, গণতন্ত্রে রেষারেষি এত প্রবল আকার ধারণ করে যে জনসমর্থন লাভের জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তার ফলে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, ভাষা, ধর্ম এবং জাতি-গত সংকীর্ণতা আশকারা পায়। সেই কারণে, সনাতনপন্থী ধর্মান্ধতা যে বর্তমানে দেশের পক্ষে আপেক্ষার চেয়ে বড়ো বিপদ হয়ে উঠেছে, তার জন্যে তিনি গণতন্ত্রকেই দায়ী করেছেন। ('ডেমোক্রেসি হ্যাজ এনকারেজড অল দিস।')

অবশ্য, শ্রীমতী গান্ধী একথা বলেছেন বলেই ধরে নেওয়া উচিত নয় যে তিনি গণতন্ত্রের পক্ষপাতী নন। যাঁরা একমাত্র গণতন্ত্রকেই মানুষের মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা সংরক্ষণে সক্ষম বলে মনে করেন, তাঁরা একথাও মানেন, শাসনপরিচালনার নানা ক্ষেত্রে অনেক সময়ে গণতন্ত্র, অন্তত সাময়িক-ভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদেরও নানারকম সুযোগ করে দেয় গণতন্ত্র। যেমন অর্থের লোভ, তেমনি ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষাও মানুষকে বড়ো হীন করে তোলে। সেই হীনতা প্রতিনিয়ত গণতন্ত্রের গায়ে কালি মাখিয়ে দিচ্ছে।

এ তো গেল সাধারণভাবে গণতন্ত্রের দোষের কথা। তা ছাড়া আবার, পাশ্চাত্য জগতে এমন অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন প্রকৃত গণতন্ত্র তাঁদেরই নিজস্ব ঐতিহাসিক ধারা থেকে উদ্ভূত, তাঁদেরই সামাজিক বিবর্তনের পরিণতি। প্রাচ্যভূমিতে গণতন্ত্র কখনোই শিকড় গেড়ে বসতে পারে না, কেন না, আমাদের ইতিহাস এবং সমাজ-বিবর্তন অন্য রাস্তা ধরেছে। রোমান ল'ইন, মধ্যযুগীয় গিল্ডসমূহ, প্রটেস্টান্ট চার্চ-সমূহ—এসব আমাদের কোনো দিন ছিল না ; তা ছাড়া ক্রীশ্চান ও ইহুদি ধর্মের নৈতিক চেতনা, ইউরোপীয় 'এনলাইটনমেন্ট' ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত নীতিবোধ, এসবও আমাদের নিজস্ব জিনিস নয়। অথচ, এইসবের মধ্যেই নিহিত আছে গণতন্ত্রের শিকড়। তা হলে আমরা কী করে আশা করতে পারি এই ধার-করা গণতন্ত্রের রীতি-নীতি আমাদের প্রয়োজন মেটাবে?

কেউ কেউ ঠাট্টা করে বলে থাকেন, মারকিন সরকার স্বদেশে গণতন্ত্র ভালোবাসে, বিদেশে বাসে না ; আর ভারত সরকার বিদেশে গণতন্ত্র ভালোবাসে, স্বদেশে বাসে না। একথা পুরোপুরি সত্য নয়, আবার সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। ক্ষমতাসীন কোনো সরকারই নিজের দেশে গণতন্ত্র খুব বেশি ভালোবাসে না, কেননা গণতন্ত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, সরকারের ক্ষমতাকে তা মাত্রাতিরিক্ত বাড়তে দেয় না।

বিচারপতি বেগ যদি পূর্বে উল্লিখিত মতই সমর্থন করেন, অর্থাৎ মনে করেন, গণতন্ত্র এদেশের উপযোগী নয়, তা হলে আলাদা কথা। কিন্তু গণতন্ত্র ছাড়া আমাদেরও গত্যন্তর নেই, যদি তিনি মানেন, তাহলে সরকারি ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট সীমা প্রয়োজন, তাও তাঁকে মানতে হবে। গণতন্ত্রের সমর্থকমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে, কতকগুলি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে গণতন্ত্র অর্থহীন, যথা (১) নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতা লাভ, (২) ক্ষমতাসীন দলের মতো বিরোধী দলেরও জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করার অধিকার, এবং সেই উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে প্রচার, সভাসমিতি সংগঠন, বাক্‌স্বাধীনতার প্রয়োগ ইত্যাদি খর্ব না করা, (৩) নির্বাচনে পরাজিত সরকারের বাধ্যতামূলক পদত্যাগ, (৪) নির্বাচিত সরকারের স্বারাই শাসনক্ষমতা পরিচালনা, তাদের নাম করে অন্য কারো দ্বারা নয়।

এদেশে সবাই যে মনে করেন গণতন্ত্র আমাদের পক্ষেও অপরিহার্য—তা কিন্তু নয়। যে-কোনো বড়ো ধরনের জাতীয় সমস্যার কথা উঠলেই অনেককে বলতে শোনা যায়—ডিকটেটরি শাসনই এর একমাত্র ওষুধ। বলা বাহুল্য, তাঁরা কল্যাণধর্মী একনায়কতন্ত্রই চান। কিন্তু সে এক অলীক কল্পনা। সার জেমস ফ্রেজারের মহাগ্রন্থ 'দ্য গোল্ডেন বাও'-এর সূত্রপাতেই এক উপজাতীয় 'রাজা'র কথা আছে। সে রাজা অহোরাত্র তরবারি হাতে একটি গাছের চার দিকে পাক দিচ্ছে। তার চোখে ঘুম নেই, কেননা সেই মহামূল্যবান গাছের একটি পাতা যদি কেউ খসিয়ে নিতে পারে, সে-ই রাজা হবে।

একনায়কতন্ত্রের শাসক সেই উপজাতীয় 'রাজা'। তাঁর হাতে মানুষের ধনসম্পত্তি, মানুষের জীবন—কিছুই নিরাপদ নয়। আর, মানবিক মর্যাদা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার—এসবের কথা তো বলাই বাহুল্য। কোন দিক থেকে বিপদ আসবে, তিনি জানেন না। কাজেই, দেশসুদ্ধ লোককে হাতকড়ি দিয়ে রাখতে পারলে তিনি নিশ্চিন্ত হন। তা যখন সম্ভব নয়, তখন তাঁর চেষ্টা মানুষকে সব দিক থেকে কত খর্ব, কত পঙ্গু করে রাখা যায়। একমাত্র গণতন্ত্রই মানুষকে তার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহস করে।

শ্রী বেগ অবশ্য একনায়কতন্ত্র চান না, কিন্তু তিনি যা চান তাকে গণতন্ত্র আখ্যা দিলে, ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দেবার পরও 'হ্যামলেট' নাটককে 'হ্যামলেট' বলতে হয়। ঠিক কী ধরনের শৃঙ্খলা তিনি আনতে চাইছেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে স্পষ্ট করে বলেন নি, কিন্তু কিছু-কিছু প্রশ্ন স্বতই মনে জাগে। যথা, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডিউ প্রসেস', অর্থাৎ দেশের আইন অনুযায়ী উপযুক্ত বিচার ব্যতিরেকে কাউকে শাস্তি দেওয়া চলবে না, এই আশ্বাস তাঁর 'ডিসিপ্লিনড ডেমোক্রেসি'তে থাকবে কি? বাক্‌স্বাধীনতা কি বজায় থাকবে? ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন করবার অধিকার কি অক্ষুণ্ন থাকবে? বিচার-ব্যবস্থা স্বাধীন থাকবে?

দেশের উচ্চতম বিচারালয়ে যিনি প্রধান বিচারপতি ছিলেন তিনি নিশ্চয় জানেন—দেশের সরকারের হাতে দেশের অধিবাসীদের ভাগ্য চোখ বুজে সমর্পণ করে দেওয়া কত বিপজ্জনক, নাগরিকের রক্ষাকবচ কত প্রয়োজন। এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু শিক্ষা তিনি নিশ্চয়ই নিতে পারেন। ডিসিপ্লিনড ডেমোক্রেসি, কিংবা গাইডেড ডেমোক্রেসি, কিংবা এইজাতীয় কোনো 'ঘর করব, হোঁসেলে ঢুকতে দেব না'-গোছের ডেমোক্রেসির ঠাট শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে না।

সমূহ বিপদ

গত বছর গ্রীষ্মকালে আমেরিকার 'ফরেন অ্যাফেয়ারস' পত্রিকায় আল্দ্রেই সাখারভের একটি খোলা চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ওই বিশ্ববিখ্যাত নোবেল প্রাইজ-বিজয়ী রুশ পদার্থ-বিজ্ঞানী তাপ-পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা, এবং সেরকম যুদ্ধে মনুষ্য-অধ্যুষিত এই ক্ষুদ্র গ্রহটির কতদূর ক্ষতি করতে পারে, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করেছেন। তার পরে বংসরাধিক কাল অতিবাহিত হয়েছে, সেই প্রলয়ংকর যুদ্ধের সম্ভাবনা কমা দূরে থাক, বরং ভাব-গতিক দেখে মনে হয়, আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্রের ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হয়েছে, এবং রাষ্ট্র দুটির মধ্যে শত্রুতার ভাব আরও বেড়েছে।

গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সোভি-

য়েত রাশিয়া ঘোষণা করেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাঝারি পাল্লার অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র পশ্চিম ইউরোপে স্থাপনের জবাবে রাশিয়া তাদের অনুরূপ ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যাও বাড়াবে।

কার অস্ত্রাগারে কত পারমাণবিক অস্ত্র মজুত আছে, সেগুলি কত রকমের, তার এক-একটির ধ্বংসক্ষমতা কত, তার একটা মোটামুটি হিসেব সাধারণ দিয়েছিলেন। সেই জটিল তথ্যপঞ্জীর মধ্যে প্রবেশ না করে বরং আমরা সাধারণের সিদ্ধান্তটা স্মরণ করতে পারি, "বহুৎ পারমাণবিক যুদ্ধের আকার এবং ভয়াবহতার সঙ্গে সুদূরতম সাদৃশ্য আছে, এমন কিছুর সঙ্গে মানবজাতির কখনও পরিচয় হয় নি।"

সেইজন্যই সাধারণ পারমাণবিক যুদ্ধের ফল কী দাঁড়াতে পারে তার একটা আন্দাজ দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, জীবন এবং সম্পত্তির ধ্বংস যা হবার তা তো হবেই, তা ছাড়া এর পরোক্ষ এবং দীর্ঘমেয়াদি ফলও প্রায় আমাদের কল্পনার অতীত বললেই চলে। ক্রমাগত দাবানলে ভূপৃষ্ঠের অরণ্যানীর অধিকাংশ পোড়াকাঠে পরিণত হবে, সেই দাবানল থেকে উত্থিত ধূমরাশি বায়ুস্তরের স্বচ্ছতা হরণ করবে, দীর্ঘকালের জন্য রাতের অন্ধকার নেমে আসবে, বাতাসে অক্সিজেনের অভাব ঘটবে।

ওজোন গ্যাসের যে স্তর উর্ধ্বাকাশে থেকে সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে, আকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে তা বিনষ্ট হবে।

আরও আছে। যানবাহন এবং যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়বে এবং আমাদের বর্তমান জটিল জীবনযাত্রার ওপর তার ফল কী হবে, সহজেই অনুমেয়। খাদ্যের উৎপাদন এবং বণ্টন, জল-সরবরাহ, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বিপর্যস্ত হবে। বিপন্ন হবে বন্য এবং ওষুধের যোগান। এ সবই ঘটবে সমগ্র মহাদেশ জুড়ে। সর্বব্যাপী খাদ্যাভাব এবং মহামারীর দিকে তাকিয়ে থাকবে অসহায় মানুষ।

তারপরেও আছে। অবাধ অরাজকতা সমাজকে ছারখার করে দেবে। দলবদ্ধ হয়ে দুর্বৃত্তরা চতুর্দিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেবে। আইন-শৃঙ্খলা, মানুষের নিরাপত্তা বলতে কিছু থাকবে না।

কাজেই, এযুদ্ধে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন অবান্তর, কার্থেজ বিজয়ের পর রোমকরা যেমন দেখেছিল—সেখানে শুধুই ধ্বংসস্তূপ—ভূমিমণ্ডল ছাড়া দখল করবার এবং ভোগ করবার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই, পারমাণবিক যুদ্ধের পরও বিশ্বব্যাপী সেই দৃশ্যেরই অবতারণা হবে। বরং আরও বেশি কিছু হবে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর এমন প্রভাব পড়বে যে শেষ পর্যন্ত মনুষ্য বলে কোনো জীব ধরাধামে টিঁকে থাকবে কিনা সন্দেহ।

তবু কেন মানবজাতি এই মহতী বিনষ্টির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগছে না, আর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে? আসল কথা—ভয়। সাধারণ লিখেছেন, "এখন অধিকতর বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যাবে, যদি পারমাণবিক এবং সাধারণ অস্ত্রের পরিমাণ কমিয়ে আনা হয়, এবং ক্রমে পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। কিন্তু বিশ্ব এখন ভয় এবং অবিশ্বাসে বিষাক্ত; পশ্চিমের দেশগুলিতে সোভিয়েত রাশিয়ার আক্রমণের ভয়, সোভিয়েত রাশিয়াতে ভয় পশ্চিমী এবং চীনা আক্রমণের। কোনো মৌখিক আশ্বাস, কোনো চুক্তি এই আশঙ্কা দূর করতে পারছে না। এখন কি সম্ভব অস্ত্রহ্রাস এবং পারমাণবিক অস্ত্রলোপ?

সাধারণ ব্যাখ্যা করেছেন—পশ্চিমের দেশগুলি কেন সাধারণ অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নির্ভর করতে পারছে না। তার একটা কারণ দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক, সামরিক এবং অর্থনৈতিক ঐক্যের অভাব। আরেকটি কারণ, শান্তির সময়ে দেশের সমাজ, অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণ যুদ্ধমুখী করে তোলাতে আপত্তি। তৃতীয় কারণ, এইসব দেশের সামরিক বাহিনীর অঙ্কার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। অপরপক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সামরিক বাহিনী আয়তনে বিপুল এবং তাদের সমরসজ্জায় অর্থব্যয়ও বিপুল। কাজেই, পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার হ্রাস করার সিদ্ধান্ত পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে বিপজ্জনক হঠকারিতা মনে হতে পারে। এই যখন অবস্থা, তখন, সাধারণের মতে, সাধারণ অস্ত্রসজ্জাতেও পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির পূর্ব ইউরোপের সঙ্গে সমতা অর্জন করা দরকার।

মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি বিশেষ অসুবিধা আছে। পশ্চিমী শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র আমেরিকাতেই অস্ত্র-হ্রাস চুক্তির জন্যে সেনেটের সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন। তার ফলে, সেনেট-সদস্যদের একটি সংখ্যালঘু অংশও ইচ্ছে করলে চুক্তির অনুমোদন আটকে দিতে পারে। এই বাধা যদি না থাকত, আমেরিকার পক্ষে অস্ত্র-হ্রাস বা অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ চুক্তিতে পৌঁছনোর পথ অনেক সুগম হত।

১৯৬০ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের পশ্চিমী উদ্যোগ প্রতিরোধ করে এসেছে, কারণ তখন পর্যন্ত তাদের অস্ত্রসজ্জাতে পশ্চিমের তুলনায় ঘাটতি ছিল। সেই অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ জারি হলে তাদের সেই ঘাটতিই স্থায়ী হয়ে থাকত। অবশ্য মুখে তারা বলে নি—আমরা আমাদের অস্ত্রসম্ভার বাড়াতে চাই। তারা এমন প্রস্তাব দেয় যাতে আমেরিকার পক্ষে সম্মত হওয়া সম্ভব ছিল না। তারা বলেছিল, অস্ত্র সম্পূর্ণ বর্জন করা হোক। বলেছিল, আগে অস্ত্র নিষিদ্ধ করো, তারপর কে অস্ত্র বর্জন করল, না করল, তার যাচাইয়ের ব্যবস্থা পরে দেখা যাবে। এই প্রস্তাবে রাজি হওয়া আর অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা।

১৯৯৯-৬০এ অবশ্য কতকগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, যথা, দক্ষিণমেরুর অঞ্চলে এবং মহাকাশে পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপন নিষেধ, বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক পরীক্ষা নিষেধ এবং পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ।

তারপর আরও চুক্তি হয়েছে। কিন্তু এইসব বোঝাপড়ার অগ্রগতি এমন জায়গায় এসে আটকে গিয়েছে যে সেখান থেকে তাকে আর নড়ানো যাচ্ছে না। একটা জিনিস পরিষ্কার—বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের সম্পর্কে সন্দেহ আর অবিশ্বাস না কমলে আলোচনা বেশি দূর এগোতে পারবে না, এবং মাঝে মাঝে এমন গাড্ডায় পড়বে যে মনে হবে সেখান থেকে তাকে তোলা শিবেরও অসাধ্য। যেমন এখন পড়েছে।

বর্তমান মুহূর্তে রুশ-মার্কিন সম্পর্ক যত খারাপ, তত এর আগে বার তিনেক মাত্র হয়েছিল। তার প্রত্যেকটিই ছিল সংকটকাল। কিউবাতে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে যে সংকট দেখা দিয়েছিল, এখন তেমন অশনি যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা না দিলেও, বিশ্বের আবহাওয়া যে বারুদগর্ভ, তা বাতাসের গন্ধ শুঁকেই টের পাওয়া যাচ্ছে।

ভরসার কথা এইমাত্র—আবহাওয়া সহজ করে আনবার, কথাবার্তা আরম্ভ করবার দিকে একটা চাপও গড়ে উঠছে। প্রেসিডেন্ট রেগান সাম্প্রতিক শীর্ষসম্মেলন থেকে তার খানিকটা আঁচ নিয়ে গেলেন।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সংগীত

প্রাচীন হিন্দু সংগীতে কয়েকটি মৌলিক প্রসঙ্গ

ভারতীয় সংগীতে শ্রুতি, গ্রাম এবং মূর্ছনা বিষয়টি শুধু সুপ্রাচীন নয়, যেমন জটিল তেমনি বিতর্কিত। সংগীতে উৎসাহী সাধারণ পাঠকদের জন্য অল্পপরিসরে তিনটি বিষয় আলোচনা করাছি (বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়)। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষে কয়েকটি প্রশ্ন রাখছি যা আমাকে দীর্ঘদিন ভাবিয়েছে।

হিন্দু সংগীতে ৭ স্বর এবং ২২ শ্রুতির উল্লেখ বৈদিকোত্তর কাল থেকে প্রচলিত আছে। ভরত নাট্যশাস্ত্রে সংগীতবিষয়ক যে-কটি অধ্যায় লিখেছেন, তাতে তিনিও শ্রুতিসংখ্যা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। মধ্যমগ্রাম এবং ষড়্‌জগ্রামের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে অচলবীণা এবং চলবীণার সাহায্যে 'সারণা চতুষ্টয়ী' পরীক্ষার প্রয়োগ ইত্যাদি থেকেও জানা যায় যে, তৎকালে শ্রুতি-বিষয়ে নিয়ে পণ্ডিতগণ কত গভীর চিন্তা-ভাবনা করেছেন। 'শ্রূয়তে ইতি শ্রুতিঃ'। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে বলেছেন, দার্শনিক বিচারে শ্রুতিসংখ্যা অনন্ত। সংগীত প্রসঙ্গে শ্রুতি আলোচনা করার সময় অবশ্য আমরা ২২টি শ্রুতিসংখ্যা মানি। ২২টি শ্রুতি ৭টি মূলস্বরকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে আছে। শ্রুতিবিভাজনব্যবস্থা আমরা স্বরস্থান নির্ণয় করতে পারি। শ্রুতিবিভাজনব্যবস্থাই গান্ধারগ্রাম, মধ্যমগ্রাম এবং ষড়্‌জগ্রামের পার্থক্য নির্ণীত হয়েছে। স্বর স্থির এবং অচঞ্চল, কিন্তু শ্রুতি গতিশীল—এমন কথাই বলেছেন সংগীতশাস্ত্রিগণ। স্বর যখন শ্রুতির মাধ্যমে অন্যস্বরে প্রবেশ করে, তখনই স্বর গতিলাভ করে; তা না হলে স্বর অচঞ্চল এবং স্থির। কিন্তু শ্রুতি গতিশীল—একথা জানিয়েছেন পুণ্ডরীক বিট্টল।

ভারতীয় সংগীতের আধুনিক পর্যায়ে এসে আমরা ব্যবহারিক সংগীতে যদিও শ্রুতির বিশদ ব্যবহার পাই, এবং ঘরানা সংগীতে, বিশেষ করে গুরুমুখী শিক্ষার দ্বারা শ্রুতিকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করি, তথাপি পণ্ডিত ভাতখণ্ডে শ্রুতির অন্তর্গত ১২টি স্বরকে প্রাধান্য দেওয়ায় শ্রুতিকেন্দ্রিক রাগসংগীতে কিছুটা অবিনাম্ভ ভাব দেখা গেছে। অবশ্য ভাতখণ্ডেজী রাগরাগিণীর প্রয়োগকৌশল বোঝাতে গিয়ে সব সময়েই স্বরগুলির কোথাও কোথাও অতিকোমল, কোথাও-বা অতিতীব্র স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পণ্ডিতজীও ভারতীয় রাগসংগীতে শ্রুতি ব্যবহারের গুরুত্ব সম্বন্ধে অতান্তই সচেতন ছিলেন। বলাই বাহুল্য, রাগরাগিণীর আন্তর সৌন্দর্য শুধুমাত্র স্বরের উপর নির্ভরশীল নয়, শ্রুতির যথাযথ ব্যবহার তথা প্রয়োগকৌশলের মধ্য দিয়ে রাগের প্রাণরূপ বিকশিত হয়ে ওঠে। ভৈরব রাগের আরোহী বর্ণে কোমলঋষভ, পুরবীর অবরোহী গতিতে কোমলঋষভ স্বরের ব্যবহার দুটি রাগের ভাবসম্পদের পার্থক্যকে মাধ্যমিকের মধ্য দিয়ে পৃথক করেছে। আবার দেশীয় কোমলগান্ধার এবং দরবারী কানাড়ার আন্দোলিত কোমলগান্ধারে শ্রুতিমনস্তায় পার্থক্য আমাদের বিস্মিত করে।

ভারতীয় প্রাচীন সংগীতে ভরতপূর্ব যুগে তিনটি গ্রামের কথা জানা যায়—ষড়্‌জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম, গান্ধারগ্রাম। দণ্ডিল তাঁর গ্রন্থে গান্ধর্ব এবং মার্গসংগীত আলোচনাপ্রসঙ্গে গান্ধার গ্রামের আলোচনা করেছেন। শিক্ষাকার নারদ তাঁর গ্রন্থেও তিনটি গ্রামের উল্লেখ করেছেন। তাঁর শ্লোকে পাই 'সপ্ত স্বরাস্তয়োগ্রামাঃ ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য এই তিনটি গ্রাম হচ্ছে পূর্বোক্ত তিনটি গ্রাম। নারদ যে উনপঞ্চাশ তানের কথা বলেছেন, তাও তিনটি গ্রামে বিধৃত—

যথা, মধ্যমগ্রামে ২০টি, ষড়্‌জগ্রামে ১৪টি এবং গান্ধারগ্রামে ১৫টি। ভরত-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনটি গ্রামের উল্লেখ যদিও তিনি করেছেন, তথাপি একথাই বলেছেন যে ষড়্‌জগ্রাম এবং মধ্যমগ্রাম—এ দুইটি প্রচলিত। গান্ধারগ্রাম মর্তলোকে অপ্রচলিত হয়ে গেছে। ষড়্‌জগ্রাম ও মধ্যমগ্রামে শ্রুতিবিন্যাস ভরত যথাক্রমে এইভাবে দেখিয়েছেন :

ষড়্‌জগ্রাম—সা ৪ রে ৩ গা ২ মা ৪ পা ৪ ধা ৩ নি ২

মধ্যমগ্রাম—সা ৪ রে ৩ গা ২ মা ৪ পা ৩ ধা ৪ নি ২

দেখা যাচ্ছে, ষড়্‌জগ্রামের পঞ্চম-এর ১ শ্রুতি অপকর্ষ করে ৪-এর পরিবর্তে ৩ শ্রুতি হচ্ছে মধ্যমগ্রামে ; এই দুটি গ্রামের পার্থক্য হিসাবে ভরত আরো দুটি শ্লোকে বলেছেন যে ষড়্‌জগ্রামের স্বরমালিকা ষড়্‌জ থেকে শুরু হয়ে 'স ন ধ প ম গ র' অর্থাৎ অবরোহক্রমে গতিলাভ করেছে। অপর পক্ষে, মধ্যমগ্রামে স্বরমালিকা মধ্যম থেকে শুরু হয়ে 'ম গ র স ন ধ প'—এইরূপ অবরোহক্রমে গতিলাভ করেছে।

মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশীতে গ্রাম সম্বন্ধে নতুন কথা বিশেষ কিছু বলেন নি, প্রাচীন মতেরই উদ্ধার করেছেন। তিনি একথা বলবার চেষ্টা করেছেন যে সাধারণত গ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি, সাংগীতিক গ্রামও তুলনামূলকভাবে তাই-ই। অর্থাৎ স্বর শ্রুতি, জাতি, মূর্ছনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গ্রাম-নামক একটি বিশিষ্ট বস্তু তৈরি হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে সংগীতের একটি নির্দিষ্ট পরিচয় উদ্ভূত হয়। এ বিষয়ে শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থের স্বরাধ্যায়ের যে অনুবাদ করেছেন সি. কুন্‌হন রাজা, তাতে গ্রাম বিষয়টির চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা রয়েছে। মতঙ্গ তাঁর গ্রন্থে দুটি গ্রামের কথাই বলেছেন—ষড়্‌জগ্রাম এবং মধ্যমগ্রাম। শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরে আমরা গ্রামসম্বন্ধে নতুন তথ্য কিছু পাই না, কিন্তু এটুকু জানতে পারি যে তিনি মোটামুটি পুরাতন কথাই মেনে নিয়েছেন। অর্থাৎ একটি গ্রামের মধ্যেই স্বর, মূর্ছনা, তান, জাতি, অংশ এবং শ্রুতি নির্দিষ্টভাবে সাজানো রয়েছে। অবশ্য পার্শ্বদেবের শ্লোকটি সিংহভূপাল তাঁর শার্ঙ্গদেবের গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেবের গ্রন্থ থেকে আরেকটি বিষয় জানা যাচ্ছে—সেকালে মাত্র ষড়্‌জগ্রামই প্রচলিত ছিল ; মধ্যমগ্রামও অবলুপ্ত হয়ে যায়। সঙ্গীতরত্নাকরে আমরা গান্ধারগ্রামের শ্রুতিবিন্যাস পাচ্ছি এই-ভাবে : সা ৩ রে ২ গা ৪ মা ৩ পা ৩ ধা ৩ নি ৪ ; এখানে দেখা যাচ্ছে যে ষড়্‌জগ্রাম আর মধ্যমগ্রামের তুলনায় আমরা গান্ধারগ্রামের যে শ্রুতিবিন্যাস পাচ্ছি তাতে ষড়্‌জস্বরের দৌর্বল্য এবং গান্ধার আর নিষাদের প্রাবল্য লক্ষিত হচ্ছে। গান্ধারগ্রামের স্বরবিন্যাস যথাক্রমে 'গ র স ন ধ প ম' এইভাবে হয়। মধ্যযুগে এসে আমরা গ্রাম সম্বন্ধে আর নতুন কথা কিছু জানতে পারি না। সমস্ত রাগরাগিণী একমাত্র ষড়্‌জগ্রামের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণে কোনো সংগীতজ্ঞই এ বিষয়ে আর নতুন চিন্তাভাবনা করেন নি। বরং বলা যেতে পারে, আধুনিক ঔপপত্তিক চিন্তায় গ্রাম শব্দটির প্রচলন আর তেমন নেই। আমরা ভারতীয় সংগীতের প্রেক্ষিতে স্বরসপ্তক অথবা ইউরোপীয় সংগীতের ভিত্তিতে স্বর-অষ্টক বলে সাংগীতিক প্রয়োজন সিদ্ধ করি।

মূর্ছনা বিষয়টিও খুবই প্রাচীন। বিভিন্ন সংগীতজ্ঞ বিভিন্ন সময়ে মূর্ছনা নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। এমনকি কবি কালিদাসও তাঁর বিখ্যাত কাব্য মেঘদূতে গান্ধারগ্রামের মূর্ছনার কথা উল্লেখ করেছেন। নারদীশিক্ষায় সাতটি স্বর, তিনটি গ্রাম, একুশটি মূর্ছনা এবং উনপঞ্চাশটি তানের কথা উল্লিখিত হয়েছে :

"সপ্তস্বরাস্ত্রয়োগ্রামাঃ মূর্ছনা
স্তোকবিংশতি।
তানা একেনোপঞ্চাশৎ ইত্যেতৎ
স্বরমণ্ডলম্‌ ॥"

অর্থাৎ স্বরমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে ৭টি স্বর, ৩টি গ্রাম ইত্যাদি। ডঃ বিমল রায়ের মতে, এই ৪৯টি তান হচ্ছে শুদ্ধ তান[1]। শুদ্ধ বলতে, আমার মনে হয়েছে, উনি বেসিক অর্থাৎ প্রাথমিক মনে করছেন। পরবর্তী কালে সংগীতজ্ঞেরা অনেকেই মনে করেছেন যে বর্তমান কালে যে তানপ্রয়োগ হয়, তা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কালের মূর্ছনা থেকেই এসেছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আমরা ষড়্‌জগ্রাম এবং মধ্যমগ্রামের অন্তর্গত মূর্ছনাগুলির নাম পাই। সেগুলি যথাক্রমে—ষড়্‌জগ্রামের অন্তর্গত মূর্ছনা হচ্ছে উত্তরমন্দ্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধষড়্‌জা, মৎসরিকৃতা, অশ্বক্রান্তা এবং অভিরুদ্‌গতা। মধ্যমগ্রামের অন্তর্গত মূর্ছনা—সৌবীরী, হরিণাশ্ব, কালোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মার্গবী, পৌরবী এবং হৃষ্যকা। আমরা গ্রন্থ থেকে এও জানতে পারি যে, গান্ধারগ্রামের অন্তর্গত মূর্ছনা হচ্ছে নন্দা, বিশাখা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, শুখা এবং আলাপ। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে একটি মূল্যবান তথ্য আমাদের জানিয়েছেন যে, মূর্ছনাগুলি শুরু হয়েছে ষড়্‌জগ্রামের ষড়্‌জ এবং মধ্যমগ্রামের মধ্যমস্বর থেকে। গান্ধারগ্রামের যে মূর্ছনা, তাও শুরু হয়েছে গান্ধারস্বর থেকে। এই-ভাবে আমরা মূর্ছনার একটি ক্রম পাই। যেমন 'সনিধপমগরে' অথবা 'মগরেস নিধপ' ইত্যাদি। নারদ অবশ্য মূর্ছনার সঙ্গে তানের একটি সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু ভরত পরিষ্কারভাবে সেরকম কিছু বলেন নি। তবে বলেছেন 'ক্রমযুক্তা' হবে। কিন্তু বর্তমান কালে তান শুধু ক্রমযুক্তই নয় বলেই আমরা জানি। মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশী গ্রন্থে গ্রাম প্রসঙ্গে মূর্ছনারও উল্লেখ করেছেন। অবশ্য মতঙ্গ তার পূর্বসূরী নন্দিকেশ্বরের গ্রন্থ থেকেই মূর্ছনার প্রসঙ্গ পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। মতঙ্গ মূর্ছনাকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। মূর্ছনা বলতে তিনি এমন একটি বিশেষ অলংকার বুঝিয়েছেন যা গায়ক এবং শ্রোতাকে সমানভাবে আপ্লুত করে। মতঙ্গ দুরকম মূর্ছনার কথা বলেছেন। এক রকমের মূর্ছনা সাতটি স্বরের ক্রম নিয়ে অর্থাৎ শুদ্ধ সাতটি স্বরের পরম্পর্য। আর-এক রকমের মূর্ছনায় ১২টি স্বরই ব্যবহৃত হয়। শুদ্ধ স্বরের মূর্ছনা আবার চারটি বিভাগে বিভক্ত। যথা, পূর্ণ, ষাড়ব, ঔড়ুচিত, সাধারণ। সাধারণ মূর্ছনায় কাকলি এবং অন্তর স্বরগুলি ব্যবহৃত হয়। মূর্ছনা বিষয়ে মতঙ্গ একটি উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন যা থেকে আমরা তৎকালের মূর্ছনা এবং তানের পার্থক্য বুঝতে পারি। মূর্ছনা আরোহক্রমে গতিলাভ করে এবং তানের গতি হচ্ছে অবরোহক্রমিক। সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেব মূর্ছনা বিষয়ে নতুন কথা খুব কিছু বলেন নি, তবে মূর্ছনা বিষয়ে মতঙ্গের বর্ণনাকে তিনি পুরোপুরি মেনেও নেন নি। শার্ঙ্গদেব বলেছেন, মূর্ছনা আরোহ এবং অবরোহ গতিতে সাতটি স্বরের ক্রমযুক্ততা। মূর্ছনার যেসব নাম উনি ষড়্‌জ এবং মধ্যমগ্রামে দিয়েছেন তা মোটামুটি ভরতেই উল্লিখিত আছে। কিন্তু সঙ্গীতরত্নাকরে মূর্ছনার কিছু হিসেব দেওয়া হয়েছে। দুটি গ্রামে ১৪টি মূর্ছনা শুদ্ধ স্বর নিয়ে হচ্ছে। কিন্তু যদি কাকলি এবং অন্তর স্বরকে নেওয়া যায় তা হলে, শার্ঙ্গদেব বলেছেন, দুটি গ্রামে মূর্ছনার সংখ্যা ৫৬টি সবসুদ্ধ সরেগামাপাধানি—সাতটি স্বরের প্রত্যেকটি থেকেই যদি মূর্ছনা শুরু হয় তাহলে আমরা ৫৬×৭=৩৯২টি ক্রম পাচ্ছি ; সর্বশেষ শার্ঙ্গদেবই নিশ্চিতভাবে মূর্ছনার সঙ্গে তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থির করেছেন। তিনি বলেছেন, মূর্ছনা সম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ যাই হোক না কেন, যখন নিশ্চিত ক্রম হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখনই আমরা কূটতান পেয়ে থাকি। এবং শুদ্ধমূর্ছনা যখন ৬টি বা ৫টি স্বর লাভ করে তাকে শার্ঙ্গদেব তান বলে স্বীকার করেছেন।

প্রশ্ন ১ : বাইশটি শ্রুতির ভিন্ন ভিন্ন নামের মধ্যে কি কোনো তাৎপর্য আছে? ষড়্‌জস্বরে দাঁড়িয়ে আছে ছন্দোবতী শ্রুতি—অথবা বলা যায়, ছন্দোবতী শ্রুতিতে ষড়্‌জস্বরের অবস্থান। ষড়্‌জস্বরকে নান্দনিক এবং ক্রিয়াত্মক যে-কোনো ভাবেই ব্যাখ্যা করলে আমরা ছন্দোবতী নামের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি। তেমনি আলাপিনী শ্রুতিতে পঞ্চম স্বরের অবস্থানও আমাদের একটি বিজ্ঞানসম্মত ভাবনায় নিয়ে যায়। এভাবে কি বাইশটি শ্রুতিনামের তাৎপর্য জানা যায়? স্বরগুলি ছন্দের মধ্য দিয়েই অচলপ্রতিষ্ঠ রূপ লাভ করে। স্বরসপ্তকের প্রথম স্বর ষড়্‌জ। সেই ষড়্‌জ স্বর থেকেই ক্রমদূরত্বে অন্য স্বরগুলির বিকাশলাভ ঘটেছে, 'ষট্‌ জায়তে ইতি ষড়্‌জ'। সুতরাং ষড়্‌জ স্বরের নিশ্চিত স্থিতিশীল রূপ শিল্পীর মনে দৃঢ়মূল না হলে তাঁর পক্ষে স্বরসপ্তকের ক্রমনির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এবং ষড়্‌জ স্বরকে এভাবে ছন্দোযুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হয় বলেই সেই শ্রুতির নাম ছন্দোবতী রাখা হয়েছে। আলাপিনী শ্রুতিতে পঞ্চম স্বরের স্থিতিকেও নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যদি আমরা স্বর-অষ্টক গ্রহণ করি। অর্থাৎ সা-মা এবং পা-র্সা—এই দুটি বিভাজনকে ইউরোপীয় সংগীতের হিসেবে মেনে নিই। সমস্ত রাগরাগিণীর বিস্তারেই পূর্বাঙ্গে ষড়্‌জস্বর থেকে মধ্যমে শেষ হয় এবং পঞ্চম থেকে উত্তরাঙ্গের বিস্তার (আলাপ অর্থে) শুরু হয়। এবং অন্তরার পর সঞ্চারী ও আভোগের বিস্তারে পঞ্চম স্বরকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় (অবশ্য যেখানে পঞ্চম অনুপস্থিত, সেখানে মধ্যম স্বর পঞ্চমের কাজ করে থাকে)। এই নান্দনিক এবং গঠনরীতিরূপ বিশ্লেষণ মনে রাখলে পঞ্চম স্বরের শ্রুতি আলাপিনী কি যথার্থ মনে হয় না? এবং এভাবেই কি বত্রিশটি শ্রুতির ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়েছিল বলে সিদ্ধান্তে আসা যায় না?

প্রশ্ন ২ : সত্যি কি ভরতের সময় গান্ধারগ্রাম অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল? বা বলা যায়, এখনো কি গান্ধারগ্রামের শ্রুতিবিন্যাসে রাগসংগীত গাওয়া হয় না? আমার তো মনে হয়, নিষাদের ৪ শ্রুতি অর্থাৎ কাকলি নিষাদের ব্যবহারই প্রমাণ করে যে গান্ধারগ্রামের শ্রুতিবিন্যাসের লোপ ঘটে নি। পটদীপ রাগের আরোহে শুদ্ধ নিষাদ কি দুই শ্রুতি অতিক্রম করে যায় নি? রবীন্দ্রসংগীতের কিছু-কিছু স্বরলিপিতে নিষাদের তৃতীয় শ্রুতি স্বীকৃত হয়েছে—সেই শ্রুতি কোথায় অবস্থিত? পটমঞ্জরী রাগের আরোহে শুদ্ধ ধৈবতের প্রয়োগ আমি আমার স্বর্গত ওস্তাদ আতা হুসেন খাঁ-র কাছে যা শিখেছি তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে উক্ত ধৈবত ৩ শ্রুতিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, স্পষ্টত ৪ শ্রুতি কিনা, তা বলা না গেলেও। যদি সংগীতশাস্ত্রীদের কথা মেনে নেওয়া হয় যে এক শ্রুতি থেকে সামান্যতম শ্রবণীয় উচ্চতাতেই (ইমিডিয়েট হায়ার সিকোয়েন্স ইন অডিবিলিটি রেনজ) পরবর্তী শ্রুতি নিহিত, তাহলে পটমঞ্জরী রাগের ক্ষেত্রে ধৈবত স্বরের ৪ শ্রুতি মানতে হয়। এইসব রাগের বিষয়ে গ্রাম নির্ধারিত হবে কী করে? শুধুমাত্র ষড়্‌জগ্রাম দিয়েই কি সব রাগরাগিণীর শ্রুতিবিন্যাসকে সাধারণীকৃত ফর্মুলায় ফেলা যাবে?

প্রশ্ন ৩ ক : মূর্ছনা শব্দটির গুরুত্ব কতখানি ছিল, তা আমরা জানতে পারি কবি কালিদাসের মেঘদূত

[1] বিশ্বভারতী সংগীতভবনে আয়োজিত সাম্প্রতিক আলোচনাচক্রে ডঃ বিমল রায় এ বিষয়টি আমাদের জানিয়ে দিলেন।

কাব্যটি থেকেও, যা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু মূর্ছনার যে ক্রম, তা থেকেই কি পরবর্তী কালে তান বিষয়টির উদ্ভব? অথবা মূর্ছনা-তান এমন বিষয়টি বেশি গ্রহণযোগ্য? শার্ঙ্গদেবের বক্তব্য আমাদের কী ইঙ্গিত দিচ্ছে?

প্রশ্ন ৩ খ : কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গীতসূত্রসার গ্রন্থে তান শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, শব্দটি তন্‌ ধাতু থেকে এসেছে। তন্‌ অর্থে বিস্তার করা। অর্থাৎ বর্তমানে প্রচলিত তান বিষয়টিও প্রকৃতপক্ষে বিস্তার-এরই প্রকারভেদ। লক্ষণীয়, যে সময় তান শব্দটির প্রসঙ্গ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় সে সময় খেয়াল, এমনকি ধ্রুপদ গানেরও প্রচলন ছিল না। আমরা কিন্তু একমাত্র খেয়াল গায়নরীতিতেই বর্তমানে প্রচলিত তান শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করে থাকি। তখন ছিল প্রবন্ধসংগীতের যুগ—যে সংগীত ধ্রুপদের আদিপুরুষ বলে অনেক সংগীতশাস্ত্রী মনে করে থাকেন। তাহলে বিস্তার অংশে স্বরবিস্তারের বিস্তার এবং 'তান' অংশে স্বরবিস্তারের বিস্তার—এ দুটি বিষয়ের পার্থক্য প্রবন্ধসংগীতের যুগে কিভাবে নির্ণীত হত? যদি বিস্তার শব্দটিকে অঙ্কশাস্ত্রের প্রোগ্রেশনরূপে মাত্র ধরা যায়, যেমন (সাধারণ) ১২৩৪ অথবা ১৩৫৭ অথবা ১৪৭১০, অথবা কূট ১২৩ ২৩৪ ৩৪৫, ১৩ ২৪ ৩৫ ৪৬, ১৪২৩ ২৫৩৪ ৩৬৪৫ ৪৭৫৬, যাই হোক না কেন, যাকে স্বরবিস্তারে রূপ দেওয়া যায় সরগম, সগপন, সমনগ (সাধারণ) সরগরগমমপ, সগরমগপমধ, সমরগরপগম গধমপমনপধ (কূট) তাহলেই কি শুদ্ধ এবং কূট তানের ক্রম মূর্ছনারই একটি বিশেষ প্রকাশ হিসেবে ধরা যেতে পারে?

অরুণ ভট্টাচার্য

নাটক

ইয়েরজি গ্রোটোভস্কির 'থিয়েটার অব সোর্সেস'

উনিশ-শো একাশি সালের অগস্ট মাসে, পোল্যান্ডের পূর্ব-অঞ্চলে এক বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে ইয়েরজি গ্রোটোভস্কি যখন তাঁর 'থিয়েটার অব সোর্সেস'—এই ট্রান্স-কালচারাল প্রোগ্রামটির কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন নব-পর্যায়ে, তখন তাঁর সহচর-সংখ্যা সাতজন। 'থিয়েটার অব সোর্সেস'—এই প্রোগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে-জড়িয়ে-থাকা ঐ সাতজন অনতি-ঊর্ধ্ব ত্রিশের যুবক-যুবতীরা এসেছেন কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। ভারতবর্ষ, পোল্যান্ড, কলম্বিয়া, মেক্সিকো আর হাইতির থেকে ঐ বাছাই সাতজন সহ-উপলব্ধিকারীদের সঙ্গে পোল্যান্ডেরই আর-একজন মধ্য-ত্রিশ যুবা যোগ দিলেন একমাসের মধ্যেই। সহচর-সংখ্যা বেড়ে হল আটজন। এ ছাড়াও ছিলেন এক অপ্রত্যক্ষ সহচর। 'পান' (মহাশয়) পিগিনিস্কি এবং তাঁর স্ত্রী ঐ বনাঞ্চলেই একটি বাড়িতে বাস করতেন। তাঁর বাড়ির ফ্রিজিডেয়ারে রাখা থাকত আমাদের খাদ্য-সংগ্রহ, আর তিনি প্রতিদিন সকালে আমাদের জোগান দিতেন টাটকা গোরুর দুধ। প্রত্যেকের পালাবদলের নিয়মমতো, আমাদের উপর দায়িত্ব থাকত রোজ সকালে পান পিগিনিস্কির বাড়িতে হাজিরা দেওয়া দুধের জন্য। ভোরবেলায় দুধের বালতি হাতে নিয়ে আমাদের প্রত্যেককেই অতিক্রম করতে হয়েছে ঐ বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল।

অগস্ট মাসের শেষাশেষি, ব্রিজেজিংকা ছেড়ে আমরা দিন-সাতেকের জন্য প্রথমে যাই মিয়েনজিলেস', চেকোশ্লাভাকিয়ার ধার ঘেঁষে এক ছোট্ট শহরে। সেখানে মূল কয়েকটি 'অ্যাকশন'-এর জন্য বাছা হয়েছিল খুব পুরোনো একটি প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ-এর জমায়েত-ঘরটিকে। বর্তমানে-বাতিল ঐ চার্চের জমায়েত-ঘরে শুরু হত ফিজিক্যাল ট্রেনিং, প্রতিদিনের কর্মসূচীর প্রারম্ভে। কখনও বা ঐ চার্চ-সংলগ্ন একটুকরো খালি জমিতেও ফিজিক্যাল ট্রেনিং হয়েছে। এরপরের নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড 'মুভমেন্ট', যা ঐ খালি জমিতেই করা হত। এই মুভমেন্টের তিনটি পর্যায়। প্রতিটি পর্যায়ের মাঝে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট 'ইনটারমিডিয়ারি পজিশন'। মুভমেন্ট করা হত ছয়টি দিকে, পর-পর। বেলা বারোটার আগে মুভমেন্ট শুরু হলে, প্রথমে পূর্ব দিক, পরে পশ্চিম দিক, এরপরে ক্রমে দক্ষিণ, উত্তর, অধঃ এবং ঊর্ধ্ব। আর এই দিকবদল করতে হত সবসময়ই বাঁ দিক দিয়ে ঘুরে। এই 'ফিজিক্যাল ট্রেনিং' বা 'মুভমেন্ট'-এর সময়ে স্থানীয় অধিবাসীরা, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা প্রায় সব সময়ই কৌতূহল চোখে নিয়ে, পথচলতি অবস্থায় একঝলক দেখে নিত। খালি জমিতে, খোলা আকাশের তলায় হলে স্থানীয় অধিবাসীদের দেখতে তো কোনো অসুবিধাই নেই, এমনকি চার্চের ভিতরে ফিজিক্যাল ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হলেও, ঢোকার দরজা খুলেই রেখে দেওয়া হত।

এর পরের কর্মসংগঠন 'ম্যাটিনাল অ্যাকশন'। এই 'ম্যাটিনাল অ্যাকশন'-এর দ্রষ্টারা নির্বাচিত কয়েকজন, 'থিয়েটর অব সোর্সেস' মূল দলটির সঙ্গে যাঁরা মিয়েনজিলেসা'য় এসেছিলেন, তাঁরাই। রাত্রিবেলায় শুরু হত 'ভিজিন্যাল অ্যাকশন'। এই 'ভিজিন্যাল অ্যাকশন'-এ অবশ্য আমন্ত্রিত হয়ে দেখতে আসতেন স্থানীয় অধিবাসীরা। 'ম্যাটিনাল অ্যাকশন' এবং 'ভিজিনাল অ্যাকশন'—দুটিই অনুষ্ঠিত হত গিরজার জমায়েত-ঘরটিতে।

আবার প্রত্যাবর্তন বনভূমিতে। এখানে এবার 'পার্টিসিপ্যান্ট' হিসেবে পাঁচদিনের চক্রটিতে এসেছিলেন পোল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের বাছাই-করা কিছু ব্যক্তি। মিয়েনজিলেসায় অনুষ্ঠিত ঐ সব-কটি অ্যাকশনের সঙ্গে ছিল গ্রোটোভস্কির মূল সহচরদের প্রত্যেকের নিজস্ব একটি করে অ্যাকশন। স্বভাবতই দিনের কর্মতালিকারও মিয়েনজিলেসার থেকে বেশ খানিকটা রদবদল হয়েছিল।

মিয়েনজিলেসার পর যাওয়া হয়েছিল কোলোনিয়া গ্রামে। কোলোনিয়াতে 'ম্যাটিনাল অ্যাকশন' এবং 'ভিজিনাল অ্যাকশন'-এর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল 'দোম্‌ কুলতুরা' (কালচারাল হাউস)-র একটি কাঠের-মেঝেওয়ালা হলঘর। আর ঘরের বাইরের অ্যাকশনের জন্য পাশের জঙ্গল। কোলোনিয়ার পর 'লিপনো'। তারপর আবার ব্রিজেজিংকা।

ব্রিজেজিংকা'র পার্টিসিপ্যান্টদের সঙ্গে আর-একটি সাইকল শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, একাশি সালের তেরোই ডিসেম্বরে পোল্যান্ড-জুড়ে জারি হয়েছিল মার্শাল ল। ফলে, ইয়েরজি গ্রোটোভস্কিকে তাঁর সহচরদের সঙ্গে চলে আসতে হয়, ভ্রোত্‌শ্লভে থিয়েটার লেবরেটারিয়াম-এর অফিসবাড়িতে। সেখানে একটি বড়ো হলঘরে সবাইকে একনাগাড়ে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। পরে অবশ্য গ্রোটোভস্কি-সহচরদের সঙ্গে দিনকয়েকের জন্য বাস করেছিল এক পোলিশ যুবা। সব অ্যাকশনই অনুষ্ঠিত হত ঐ বড়ো হলঘরটিতে, যা একই সঙ্গে শোবার জায়গাও বটে। পরিভাষায় ঐ ধরনের বড়ো ঘরকে বলা হত 'সালা'।

'থিয়েটার অব সোর্সেস'-এর পরবর্তী পর্যায় শুরু হল ইতালিতে। ইতালিতে এত্রুসকান অঞ্চলের ছোটো শহর ভলতেরায় ফাউস্তো প্লুকিনোত্তা তাঁর কয়েকজন সহযোগীদের সঙ্গে থিয়েটারের যে সক্রিয় গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, ঐ কর্ম-সংগঠনটির নাম 'লা ভেনতুরা' (দি অ্যাডভেনচার)। ঐ 'লা ভেনতুরা'ই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন 'থিয়েটার অব সোর্সেস'-এর সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার জন্য। আর এই প্রোজেকটের পার্টিসিপ্যান্ট বলতে 'লা ভেনতুরা'র সংগঠকরাই। পরে অবশ্য এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আমেরিকা থেকে চিকিতা গ্রেগরি, বোলোনিয়া (ইতালি) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উগো ভোলি এবং মিলানের চেনাতা আলিনিয়ারি। ভলতেরার পর ওরই কাছেপিঠের ছোটো শহর পোমারানচের গায়ে, আর-একটি শহর থেকে দূরে ফাঁকা জায়গায়, 'থিয়েটার অব সোর্সেস'-এর প্রোগ্রাম হয়েছিল।

ইতালিতে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েট্রোলজি বিভাগে ইয়েরজি গ্রোটোভস্কি দীর্ঘ কয়েক মাসের যে একটি কোরস শুরু করেছিলেন, তার নাম 'অরিজিনাল টেকনিক অব অ্যান অ্যাক্টর'। এই কোরসেই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল 'থিয়েটার অব সোর্সেস'-এর মূল কয়েকটি সূত্র।

এই সূত্র কয়টি যে পাঁচটি অ্যাকশনের ব্যবহারিক রূপ পায়, সেই অ্যাকশনগুলি হল যথাক্রমে (১) ওয়াক, (২) মুভমেন্ট, (৩) নাইট অ্যাকশন, (৪) ব্রিথ অ্যাকশন এবং (৫) ওয়েটিং। এই-সমস্ত শব্দগুলির বাঙলা বা অন্য কোনো ভাষাতেই অনুবাদ না হওয়াটাই ভালো, যেহেতু এগুলিকে এই ট্রান্স-কালচারাল প্রোগ্রামটির পরিভাষা হিসেবেই ধরে নিতে হবে।

সমস্ত অ্যাকশনগুলির মধ্যেই 'ফিজিক্যাল প্রিসিশন' ছাড়াও অন্য যে কয়টি সূত্র রয়েছে তা হল সাইলেন্স, অ্যাটেনশন, অবজারভেশন এবং ডিসোসিয়েশন। এ ছাড়াও রয়েছে আর-একটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ঐ-সমস্ত অ্যাকশনগুলির সঙ্গে যাকে বলা যাবে 'ডিপ স্লিপ'। এই 'ডিপ স্লিপ' বিশেষ কোনো অ্যাকশন নয়, অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই এর জন্য, কিন্তু সাতদিনের এক-একটি সাইকল-এ প্রত্যেকেই, নির্দিষ্ট কর্মতালিকার বাইরে ফাঁকা সময়ে ঐ 'ডিপ স্লিপ'-এর অভিজ্ঞতায় যেতে পারতেন। এই 'ডিপ স্লিপ'কে আমরা 'ডিপ স্লিপ উইদাউট ড্রিম' এই অভিধাটিও দিতে পারি।

'ওয়াক' অ্যাকশনটির সঙ্গে ফরাসিরা যাকে 'প্রোমানাদ' বলেন, তার কিছু সম্পর্ক পাওয়া যাবে। 'ওয়াক'-এ লাইন-ধরে (একজন থেকে আরেকজনের দূরত্ব পাঁচ থেকে সাত মিটার) হাঁটা হত একটি নির্দিষ্ট পথে। এবং এই হাঁটার একটিই জরুরি সূত্রে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসকে পর্যবেক্ষণ করা। খুবই স্বাভাবিক হাঁটা। সঙ্গে নিজস্ব নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের পর্যবেক্ষণ। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে কনট্রোল করা নয়, শুধুমাত্রই তার পর্যবেক্ষণ।

মুভমেন্টের কথা আগেই বলা হয়েছে। 'নাইট অ্যাকশন'-এ মেরুদণ্ড সোজা রেখে একটি কক্ষপথে ঘুরতে হত। এই বিশেষ অ্যাকশনটি সম্পন্ন হত, উপনিষদে যে সময়কে 'সন্ধ্যা' বলা হয়েছে সেই সময়ে। 'ব্রিথ অ্যাকশনে' নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটেনশনকে অন্তরঙ্গ (ইনসাইড) এবং বহিরঙ্গে (আউটসাইড) বদলাতে হত। আর এই-সমস্ত অ্যাকশনগুলিই হত দল বেঁধে। প্রত্যেক অ্যাকশনের আগে, যাঁর উপর ভার থাকত, সেই বিশেষ ব্যক্তিটি পার্টিসিপ্যান্টদের ইনডিকেশন দিতেন। 'ব্রিথ অ্যাকশন' ছাড়া আর-সমস্ত অ্যাকশনই করা হত ঘরের বাইরে, ফাঁকা জায়গায়।

একমাত্র 'ওয়েটিং' করা হত একা-একা। রাত বারোটার পর শুরু হত ওয়েটিং। ঘরে জ্বলত একটি লণ্ঠন। একই ঘরে ঘুমোতে হত প্রত্যেককে, মেঝেতে। সময়-তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেককে একঘন্টা করে, মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসে থাকতে হত একটি নির্দিষ্ট বসার জায়গায়।

এবার ঐ চারটি সূত্র সম্পর্কে খুব মোটা দাগে কয়েকটি কথা বলা যাক। 'থিয়েটার অব সোর্সেস'-এর প্রসঙ্গে ঐ

চারটি অভিধার উল্লেখ আগেই করেছি —সাইলেন্স, অ্যাটেনশন, অবজারভেশন ও ডিসোসিয়েশন।

সাইলেন্স প্রসঙ্গে এলে, প্রথমেই পরিষ্কার হওয়ায় উচিত—এখানে সাইলেন্সকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হচ্ছে। প্রথমত, 'ভারবাল সাইলেন্স'। অর্থাৎ ঐ সাতদিনের সাইকল-এ খুব প্রয়োজনীয় কথা বলার না থাকলে, মৌখিক শব্দের দিক থেকে চুপচাপ থাকতে হবে। অপ্রয়োজনীয় কোনো কথাই বলা যাবে না।

এই 'ভারবাল সাইলেন্স' ছাড়াও ছিল 'নন-ভারবাল সাইলেন্স'। অর্থাৎ শুধু মৌখিকভাবে চুপচাপ থাকাই নয়, আচরণও হবে নিঃশব্দ। সহজে যেন ঐ আচরণ অন্যের চোখে না পড়ে, কেননা ঐ সাতদিন প্রত্যেকের উপস্থিতিই হতে হবে নিঃশব্দ। বিন্দুমাত্র শব্দবহুল নয়। স্বাভাবিক, অথচ, নিঃশব্দ।

সাইলেন্স-এর পরে আসা যাক অ্যাটেনশন-এ। এই অ্যাটেনশন অর্থে পরিপূর্ণ উপস্থিত থাকা। চারপাশের পরিবেশের মধ্যে, সঙ্গের সহচরদের মধ্যে এবং সাতদিনের প্রতিটি কাজকর্মের মধ্যে। আর এই প্রসঙ্গে যে তিনটি ইন্দ্রিয়ের যথাযোগ্য ব্যবহার দরকার হয়ে পড়ে, তা হল চোখ দিয়ে দেখা, কান দিয়ে শোনা, ত্বকের সাহায্যে অনুভব করা (ও পায়ের পাতার সাহায্যে সর্বদাই মাটির সঙ্গে সংযোগ অনুভব করা)।

অ্যাটেনশন-এর পর অবজারভেশন। একেও দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে : আউটসাইড অবজারভেশন এবং ইনসাইড অবজারভেশন। 'আউটসাইড অবজারভেশন'-এ চারপাশের সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং 'ইনসাইড অবজারভেশন'-এ মনের ভিতর সর্বদাই যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, স্মৃতি ইত্যাদি সব সময়ই জন্ম নিচ্ছে ভেসে উঠছে—তাকে পর্যবেক্ষণ করাই লক্ষ্য।

ডিসোসিয়েশন-এ এই দুটি চরিত্রের বিযুক্তিকরণ "দি সীয়ার (যিনি দেখেন) এবং সীন (যা দর্শিত হচ্ছে)-এর মধ্যে বিযুক্তিকরণ। এই 'আউটসাইড অবজারভেশন' বা 'ইনসাইড অবজারভেশন' পর্যায়ের সমস্ত কিছুই সীন (যা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু সাইলেন্সের মধ্যে কাজ করে আমাদের ছুঁতে হবে সেই নীরব দর্শককে, একত্র হবার জন্য পৌঁছুতে হবে তাঁর কাছে, যিনি দেখছেন, দি সীয়ার।

'থিয়েটার অব সোর্সেস' এক-একটি সাইকল হত প্রায় সময়ই সাতদিনের। কখনও কখনও তার বেশি দিনও একনাগাড়ে হয়েছে। এবং কম সময়ের ক্ষেত্রে, কখনই চার দিনের কমে ভাবা হয় নি। স্বভাবতই এই সময়ে বাড়ির সমস্ত-রকম কাজকর্ম, খাবারদাবার তৈরি করা—সমস্ত-কিছুই নিজেদের করতে হত। ইউরোপের প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যেও 'থিয়েটার অব সোর্সেস' চলার সময় কখনোই মদ খাওয়া যেত না। চা-কফি-সিগারেট বাদে আর সমস্ত নেশাই ছিল বর্জনীয়, সাইকল চলার সময়।

'থিয়েটার অব সোর্সেস' এখনও একটি ধারাবাহিক গবেষণার পর্যায়ে। শুধু ইউরোপেই নয়, পশ্চিম বাঙলাতেও এই ট্রান্স-কালচারাল প্রোগ্রামটির কয়েকটি সাইকল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ধারাবাহিক গবেষণার পর্যায়ে এখনও রয়েছে নানান প্রশ্ন, নানান অনুদ্ঘাটিত দিক, ভবিষ্যতে ব্যবহারিকভাবে যেগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতেই হয়তো এই প্রোগ্রামটি আরও সুসম্পন্ন রূপ নেবে। ক্রমশ তার আবিষ্কারের আওতায় আসবে থিয়েটারের ভাবার বহুধা ব্যাপ্তি, জীবন আর থিয়েটারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ তথা বিচ্ছেদের সূক্ষ্ম স্তরগুলি, বেঁচে থাকার এবং অভিনয়ের তাৎপর্য। এই লেখাটিতে শুধুমাত্রই 'থিয়েটার অব সোর্সেস'-এর একটি প্রেক্ষাপটই হাজির করা হল। তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক নানান অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে, ঐ যাত্রাপথের স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যে-কোনো ধারাবাহিক গবেষণারই যা মূল লক্ষ্য।

দিব্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থসমালোচনা

গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়— দর্শন চৌধুরী। অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলিকাতা। ১৯৮২। পৃ ৯৭। দশ টাকা।

শ্রীদর্শন চৌধুরীর 'গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়' বইটি যখন হাতে এল, খুব আগ্রহসহকারে পড়বার জন্য নিয়েছিলাম। কারণ, সে যুগে গণনাট্য সংঘের নাটক, গান, নাচ ইত্যাদি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা স্বভাবতই সেই দিনগুলির ইতিহাস কোথাও লিপিবদ্ধ হলে আনন্দিতই হবেন। কিন্তু ভূমিকাতেই হোঁচট খেলাম। প্রথমেই একটা ঝগড়ার সুর। "গণনাট্যধারা এখনো ইতিহাস হয়নি। নানা উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে সার্থকতা-ব্যর্থতার পথ বেয়ে এদেশে গণনাট্য এখনো সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর যাঁরা গণনাট্য ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে তথাকথিত 'নবনাট্য' এবং 'সৎনাট্য' ইত্যাদি নাট্যধারায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁদেরই বড় একটা অংশ উঠেপড়ে লাগল, গণনাট্যধারা বুঝি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিছু পত্র-পত্রিকা ও তাদের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি এই নবনাট্যধারাকে এত প্রবলভাবে সমর্থন ও প্রচার করল, যে মনে হতে লাগল গণনাট্য বুঝি মুখ থুবড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল।"

কথাটি সত্য হলে খুশি হতাম। সে যুগের 'জবানবন্দী' বা 'নবান্ন' অথবা 'নবজীবনের গান' বা 'মধুবংশীর গলি' অথবা সেন্ট্রাল আই-পি-টি-এ ট্রুপ-এর 'স্পিরিট অব ইন্ডিয়া' অথবা 'ইন্ডিয়া ইম্মর্টাল' কিংবা বিনয় রায়ের কণ্ঠে তাঁর রচিত 'সপ্তকোটি বীরপ্রসবিনী' গান যখন পরিবেশিত হত তখন তার প্রভাব শুধু মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না, সমস্ত দেশের মানুষকে সেদিন এই নতুন দল ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নতুন চিন্তাধারার জোয়ার এমনি কূল ভাসিয়েই আসে।

যদিও লেখক আমাদের নিশ্চিন্ত করতে চেয়েছিলেন এই বলে যে "মধ্যবিত্ত বিপর্যস্ত বাঙালীর স্মৃতি সব সময়ে বিপজ্জনক" তাই তিনি "এই ধরনের পারস্পরিক বিবৃতি, স্মৃতিচারণা এবং ব্যক্তিগত ভাবনা নিয়ে বিতর্কিত লেখাগুলিকে খুব মূল্য" দেন নি। "তার মধ্যে যেগুলি তথ্যদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে...সেগুলিকেই যতদূর সম্ভব যাচাই করে গ্রহণ" করেছেন। (ভূমিকা) এবংবিধ ভূমিকার পরেও দেখলাম লেখকের নিজেরও মন এমনই ব্যক্তিগত মন্তব্যে অভ্যস্ত যে ইতিহাসের নামে অনায়াসে, অনবরত অন্যের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন নি। স্মৃতিরও যে শ্রেণীবিভাগ আছে, সে-কথা আগে জানতাম না।

প্রথম পর্যায়কে লেখক বলেছেন ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ হয়ে ১৯৪৮, এবং তার রেশ ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। আমাদের আলোচনা এই প্রথম পর্যায় সম্পর্কে। ১৯৪০ সালের প্রসঙ্গে তিনি ওয়াই-সি-আই এবং ছাত্র ফেডারেশনের কালচারাল স্কোয়াড নিয়ে আরম্ভ করেছেন। নামের তালিকা না থাকলেই ভালো হত, কারণ দুটি অংশের নামের ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তথ্যের দু-একটি ভুলও আছে। যেমন—'শপকীপার' এবং 'কেরানী' অভিনীত হয় ওয়াই-ডব্লু-সি-এ হলে, ওয়াই-এম-সি-এ হলে নয়। তবু, সব মিলিয়ে ওয়াই-সি-আই-এর কাজকর্ম সম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু শ্রীচৌধুরীর লেখার ধরনটাই এত এলোমেলো যে কালানুক্রমিকতা রক্ষা পায় নি। যেমন : "সেই আদর্শেই এই সময়ে ওয়াই-সি-আই গড়ে ওঠে এবং বিদেশ-প্রত্যাগত সাম্যবাদী ভাবাদর্শে যাঁরা এর আগেই 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা এর পৃষ্ঠপোষকতায় রইলেন" ইত্যাদি (পৃ ২৭)। ওয়াই-সি-আই-এর একজন কর্মী হিসেবে বলতে পারি যে বয়সে ওয়াই-সি-আই সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির চেয়ে বড়ো। অর্থাৎ ১৯৪০ সালে ওয়াই-সি-আই গড়ে ওঠে।

এইরকম বহু এলোমেলো সন-তারিখ, নানা রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, অপ্রাসঙ্গিকভাবে তিনি মাও সেতুঙের বক্তব্যের অবতারণা ইত্যাদি পেরিয়ে 'জবানবন্দী' বা 'নবান্ন'র যুগে এসে পৌঁছতে পারলে কিছু তথ্যভিত্তিক লেখার সন্ধান মেলে। নাটক সম্বন্ধে এবং সমসাময়িক পেশাদার মঞ্চগুলির নাটকের একটি মূল্যবান তালিকাও অন্তর্ভুক্ত আছে তার সঙ্গে। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

'জবানবন্দী' এবং 'নবান্ন'র পৃষ্ঠপটে মন্বন্তর, কালোবাজার, মঞ্চসজ্জা, বিভিন্ন চরিত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু অবাক হতে হয় শ্রীশম্ভু মিত্র সম্পর্কে বারবারই লেখক, 'অন্যতম পরিচালক' বা পেশাদার মঞ্চে 'ব্যর্থ অভিনেতা' ছাড়া আর কোনো বিশেষণ খুঁজে পান নি। বইটিতে সর্বত্র রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শ্রেণীস্বার্থ ইত্যাদি ধরতাই বুলি ছড়িয়ে আছে, কিন্তু লেখক দেখেন নি বলেই বোধহয় বুঝতে পারেন নি যে দর্শকের চোখে যে অসামান্য অভিনয় সেদিন এবং আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে তা হল শম্ভু মিত্র আর বিজন ভট্টাচার্যের।

বইটি পড়লে বোঝা যায়—গবেষণার আগেই লেখক একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন, তারপর সেই সিদ্ধান্তটিকে প্রমাণ করবার জন্য তথ্য অথবা তাঁর ধারণাগুলিকে ঠেসেঠুসে সাজিয়েছেন। সেজন্যই বইটিকে প্রামাণ্য ইতিহাস হিসেবে গণ্য করা যায় না। আর-এক জায়গায় লেখক মন্তব্য করছেন 'নবান্ন' সম্পর্কে : "পরিচালক দুজনের কৃতিত্বও অস্বীকার করার মত নয়, কিন্তু সেটাই সব নয়। তাহলে পেশাদারী মঞ্চে এমন অভিনয়টা হচ্ছিল না কেন? উৎপাদন ব্যবস্থার জীর্ণ ঘেরাটোপে এ জিনিষ সম্ভব নয়।...এদের নাটকের সংগঠনে একটি রাজনৈতিক দল ও তার মতাদর্শ কাজ করেছিল। ফলে চেহারাটাই পালটে গেছে। সংগঠনের ভাবনাতে নাটকের বিষয়বস্তু রচিত হয়েছে, সংলাপ গাঁথা হয়েছে, অভিনয়ে ব্যক্তি প্রাধান্য নষ্ট করে দিয়ে গ্রুপ অ্যাকটিং-এ জোর দেওয়া হয়েছে। সমবেত অভিনয়, টিম ওয়ার্ক ও ছোটখাট সব চরিত্রেই আন্তরিক নিষ্ঠা—এ শুধু পরিচালকের কৃতিত্বে সম্ভব নয়।" (পৃ ৬৪)

এর নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই যে, পরিচালক-টালক এসব বড়ো কথা নয়। আসল কৃতিত্ব হল 'পলিটিকাল কমিসারের'—অর্থাৎ সংগঠকের। লেখককে স্মরণ করিয়ে দিই যে, এ ধরনের একটা সরল বিশ্লেষণ (যা ইতিপূর্বে অনেকের আত্মপ্রতিষ্ঠাকে আড়াল করবার জন্য করেছেন) মেনে নিলে গণনাট্যের দুর্দশার দায়িত্ব, নবান্নের মতো নাটকের মৃত্যুর দায়িত্বটাও 'পলিটিকাল কমিসারে'র কাঁধে এসে কিন্তু বর্তায়। 'উৎপাদনব্যবস্থার ঘেরাটোপ' কিন্তু আজও বদলায়নি। বিপ্লব এসে রাতারাতি সমাজের জমি আগাপাশতলা নিড়িয়ে দিয়ে যাবার পরদিনই গণসংস্কৃতির লাউডগা ফনফনিয়ে গজিয়ে উঠবে—এমন যান্ত্রিক ধারণা ভেবেছিলাম লোপ পেয়েছে। অন্তত চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিণাম দেখার পর। আলোচ্য বইটি পড়ে বুঝলাম আমার ধারণা ভুল। ইতিহাস থেকে শেখে না —এমন মানুষ আজও আছে।

একটা সজীব অন্দোলনের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়। আন্দোলনে যখন ভাঁটা পড়ে তখন সেই পার্থক্যটাকে বড়ো করে দেখাবার প্রবণতা আসতে পারে। কিন্তু গবেষকের কর্তব্য, জোয়ার এবং ভাঁটা—উভয়েরই গতিপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করে দেখা। কিন্তু এ বই পড়লে বোঝা যায়, লেখক গোড়া থেকেই একটি বিশেষ মতবাদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেছেন। সেই মতবাদের চৌহদ্দির মধ্য থেকে বেরোতে পারেন নি বলে তাঁর লেখায় এই সীমাবদ্ধতা।

তিনি কোথাও উচ্ছ্বাস করেছেন নবান্নর সার্থকতা সম্পর্কে (পৃ ৩৬)। কিন্তু তারপরেই আবার ১৯৬৪ সালে এসে দেখা যাচ্ছে, বিজন ভট্টাচার্য থেকে আরম্ভ করে পরম শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য পর্যন্ত কেউ তাঁর একতরফা ব্যক্তিগত আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পান নি। একে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ বলে না। লেখকের মতে—"ইতিহাসগত দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তিনটি কারণ আমার প্রধানতম বলে মনে হয়েছে। রাজনীতিগত, সংগঠনগত এবং ব্যক্তিগত। আবার গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে আপাত বিচ্ছিন্ন এই তিনটি বিরোধের মূল কারণ একটিই হয়ে পড়বে। আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা উপরিলিখিত ক্রমটিকে উলটিয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত সংগঠনগত এবং রাজনীতিগত—এইভাবে আলোচনা করে দেখব" (পৃ ৬৭-৬৮)।

লেখক কথা রেখেছেন। আলোচনার ক্রমটিকে উলটে নেবার প্রয়োজন কেন হল, সেটা তাঁর কদর্য ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকেই বোঝা যায়। দৃষ্টান্ত অসংখ্য—তার একটিমাত্র উদাহরণ উল্লেখ করছি। লেখক সে যুগের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সফলতার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির ভাবাদর্শের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। অথচ সেই সঙ্গে পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশী, যিনি সেই ভাবাদর্শের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ করে গেছেন : "তাঁর মত সংস্কারবাদী রাজনৈতিক নেতার আগ্রহেই তাঁর সংস্কৃতি শাখাও সংস্কারপন্থী হয়ে পড়েছিল। গণনাট্যশিল্পীদের দিয়ে সারা দেশের জনগণমনের কাছে যাওয়ার চাইতে, তিনি সব শিল্পীকে বম্বেতে এনে, তাঁদের দিয়ে নগরকেন্দ্রিক শিল্প প্রযোজনার দিকে উৎসাহ দিতে থাকেন। শহরের শিক্ষিত মানুষের উপযোগী সংস্কৃতি-শিল্প রচনায় তিনিই উৎসাহ দিয়ে গণনাট্যের মৌল আদর্শকে গোড়াতেই বিনষ্ট করেছিলেন" (পৃ ৭০)।

লেখকের জানার কথা নয়। সে যুগের মধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা জানেন, আসলে সে যুগটা ছিল অন্যরকম। সেদিন কমিউনিস্টদের মধ্যে যে আদর্শবাদিতা দিল, যে নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠতা ছিল, নেতাদের যে রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত জ্ঞান আর পাণ্ডিত্য ছিল, পার্টির মধ্যে যে শৃঙ্খলা আর গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ছিল—এক কথায়, যে মূল্যবোধ ছিল তারই নেতৃত্বের হাল ধরেছিলেন তখনকার তরুণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশী। সেইজন্যই সম্ভব হয়েছিল সে সময়ে সকলকে একটি প্ল্যাটফরমে জড়ো করা। সম্ভব হয়েছিল সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের পাশে দাঁড়ানো। তারই ফলে একটি সজীব সৃষ্টিশীল সাংস্কৃতিক হাওয়া বয়ে গিয়েছিল। আজকের ক্ষুদ্র ক্ষমতার লড়াইয়ের এই ঝুটোপুটি যুগের মানসিকতা দিয়ে সে যুগকে বোঝা যাবে না।

লেখকের সংশোধনবাদের ভূতের ভয়ের জন্য সম্ভব হয় নি বুঝতে, ১৯৪৬ সালের পর কেন গণনাট্যের জোয়ারে ভাঁটা পড়েছিল। তিনি সেই রাজনীতির পৃষ্ঠপট বুঝতে চেষ্টা করেন নি। সে সময়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে সমস্ত দেশ উদ্বেলিত। রসিদ আলি দিবস, নৌবিদ্রোহ, ২৯শে জুলাই কলকাতার সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে একত্রিত করেছিল যার পুরোভাগে ছিলেন শ্রমিক আর ছাত্র। তারপর এসেছে দাঙ্গা। সেই দাঙ্গার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল, ছাত্র-শ্রমিকের সঙ্গে রাস্তায় নেমেছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মীরাও। মঞ্চে তখন নাটক করার সময় বা প্রয়োজন ছিল না। নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল রাস্তায় রাস্তায়, ব্যারিকেডে ব্যারিকেডে। গণনাট্য সংঘের কর্মীরা সেদিন কটা নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন বা করেন নি, তার হিসেবটাই কিন্তু আসল সংশোধনবাদ।

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্ট সম্পর্কে লেখক প্রায় নীরব। অথচ স্বাধীনতার সেই জোয়ারে ভেসে যান নি, এমন 'বিপ্লবী' কি একজনও ছিলেন? আরো আশ্চর্য কথা—১৯৪৮-৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনি হবার কথা আছে। কিন্তু পার্টি যে ভুল করেছিল তার উল্লেখ কোথাও নেই। সেই ভুলই যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ঘাড় মটকে দিয়েছিল কোথাও তার স্বীকৃতি নেই।

রুচিবোধের অভাব প্রকাশ পেয়েছে যখন তিনি লেখেন : "ডিকসন লেনের আক্রমণ ও হত্যার সময়কার (১৯৪৮) সভাতেও শম্ভু মিত্র (এবং বিজন ভট্টাচার্য) অনুপস্থিত ছিলেন" (পৃ ৭৩)। ডিকসন লেনের সভায় সেদিন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন না। কারণ সভাটা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার যুব-প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা-সভা, গণনাট্য সংঘের সভা নয়। গবেষণার নামে লেখক অলিতে গলিতে ইতিহাসের আবর্জনা কুড়িয়ে বেড়িয়েছেন। তাই ধরতে পারেন নি যে, ইতিহাসে এমন সময় আসে যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনায় বা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় যদি ভুল হয়—যেমন ভুল হয়েছিল ১৯৪৮-৪৯ সালে—তাহলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপথে যায়। গণনাট্যসংঘ ভেঙে যদি নবনাট্য আন্দোলন হয়েই থাকে তার বিচার কি এই পৃষ্ঠপট ছাড়া সম্ভব? লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে, নবনাট্য আন্দোলনের ধ্যান-ধারণা এঁরা পেয়েছিলেন গণনাট্য থেকেই। এইটেই আসল কথা। সঠিক আন্দোলনের জোয়ারে একদা যাঁরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দেন তাঁরা যদি সেই আদর্শকে বুকে নিয়ে অন্যান্য সংগঠনে ছড়িয়ে দিতে পারেন তাহলে দোষ কোথায়?

ডিকসন লেনের গুলিচালনার মর্মান্তিক ঘটনা প্রসঙ্গে লেখক লিখেছেন : "...দুই কর্মীকে ভাড়াটে গুণ্ডারা মেশিনগানের গুলি ছুঁড়ে হত্যা করে" (পৃ ৭৩)। ঘটনার বিবরণ ঠিক। কিন্তু অত্যুৎসাহে লেখক স্টেনগানকে মেশিনগান বলে চালিয়েছেন। এমনি করেই ভুলের উপর ভুল জমে পাহাড় হয়। আজকাল মেশিনগান অনেক হালকা হয়েছে বটে, তবে স্টেনগান মেশিনগান নয়। লেখক জালিওয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার সঙ্গে ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেন নি তো? তা ছাড়া, সমস্ত বইতে সে যুগের সারাভারত গণনাট্য আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কর্মী শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাসের নাম একবারও উল্লিখিত হয় নি কি এই কারণে যে তিনি ডিকসন লেনের সভায় উপস্থিত থেকেও গুলিবিদ্ধ হন নি? (হেমাঙ্গ বিশ্বাস দীর্ঘজীবী হোন!)

এই ধরনের অজ্ঞতার দৃষ্টান্তের অনেকগুলির মধ্যে একটি উল্লেখ করছি। 'নবান্ন'তে ভদ্রঘরের মেয়েদের মঞ্চে অভিনয় করা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখছেন : "...উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ এবং অন্য দু-একজন এর আগেই বাড়ির মেয়েদের দিয়েই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু সেটা পেশাদারী নয়, সৌখীন অভিনয়। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘেই প্রথম লেখাপড়া-জানা ঘরোয়া মেয়েদের মঞ্চে অভিনয়ে নিয়ে আসে" (পৃ ৬৪)।

যিনি রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে এত অজ্ঞতা পোষণ করেন তিনি কোন দুঃসাহসে নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে বসেন! কারণ, গণ-নাট্য আন্দোলনেরও একটা আরম্ভ ছিল, তারও ঐতিহ্যবাহী ধারা ছিল, সে কথা তিনি ধরতে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে তাঁকে স্মরণ করিতে দিতে চাই যে শান্তিনিকেতন থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কলকাতায় 'রাজা', 'তাসের দেশ', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' মঞ্চস্থ করা হয়েছিল তিরিশের যুগে কবির উপস্থিতিতে। তার ছবিও আছে রবীন্দ্র-রচনাবলীতে।

পরিশেষে দু-একটা কথা বলি। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ভারতের অন্যান্য স্থানে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে বইতে তার কোনো বিশেষ উল্লেখ নেই। যেমন নেই তখনকার খ্যাতনামা গায়ক ওমর-শেখের নাম। একটি প্রশ্ন আমার করবার আছে : শ্রীউৎপল দত্তর নাম একেবারে অনুচ্চারিত কেন? ১৯৫২ সালের আগেই অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে তিনি তো ঘনিষ্ঠভাবেই ছিলেন গণনাট্য সংঘের সঙ্গে। তারপর তিনি লিটল থিয়েটার গ্রুপ করেন এবং আজও বহু নাটক মঞ্চস্থ করে যাচ্ছেন। কারণটা কি এই যে, তাঁকে ঠিক কোন্ জায়গায় অন্তর্ভুক্ত করবেন সে সম্পর্কে শ্রীচৌধুরী মন স্থির করতে পারেন নি?

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বইটির ছত্রে ছত্রে এমন সব উক্তি আছে যেগুলি সত্যের বিচারে খণ্ডিত হয়ে যায়। গণনাট্য নিয়ে 'গবেষণা' আজকাল প্রায় সংক্রামক আকার ধারণ করেছে। গসিপনির্ভর খুচরো গবেষণার বদলে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হাতে পেলে খুশি হতাম।

উমা সেহানবীশ

কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর—প্রদ্যোত গুহ। অয়ন, কলকাতা-৯। কুড়ি টাকা।

কলকাতার বাবুবৃত্তান্ত—লোকনাথ ঘোষ। অনুবাদক : শুদ্ধোদন সেন। অয়ন, কলকাতা ৭০০ ০০৯। চল্লিশ টাকা।

ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে যে ইউরোপীয় শিল্পীরা ভারতে এসেছিলেন তাঁদের প্রসঙ্গই প্রথম গ্রন্থে আলোচিত। টিলি কেটল, জোফানি, হজেস, সলভিনস, চিনারি, হোম, ডিঅইলি, গ্র্যান্ট প্রমুখ আরও কয়েকজন শিল্পী সম্পর্কে গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। বৈঠকি ঢঙে গল্প বলার ছলে শিল্পীদের কাহিনী পরিবেশনে লেখক মুনসীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পীদের কাজের নমুনা হিসেবে অনেকগুলি ছবিও ছাপা হয়েছে। ছবিগুলির অধিকাংশই পরিচিত, তবুও সেগুলির পুনর্মুদ্রণ যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কারণ, দীর্ঘদিন আগের মন্দির, প্রাসাদ, বাড়িঘর, গিরজা, রাজপথ অথবা জাহাজঘাটা কেমন ছিল, ওই ছবিগুলিই তা বলে দেবে। এদিক থেকে ওই দৃশ্যচিত্রগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু ড্যানিয়েল, চিনারি অথবা সলভিনস-এর ভারতীয় নারী-পুরুষের ছাপা চিত্রগুলিকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া যায় না—কারণ, ওঁদের আঁকা ছবিতে সাধারণ ভারতীয় নারী-পুরুষের আকৃতিগত গঠন-ভঙ্গিমা স্পষ্টতই বিজাতীয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী বেলনসের আঁকা ছবির কথাও মনে পড়ে। ইউরোপীয় শিল্পীরা সাধারণ ভারতবাসীর মুখাকৃতির রূপারোপের সময় নিজ নিজ 'ম্যানারিজম'-এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। ফলে, ছবিগুলি দেখে মনেই হয় না তারা ভারতীয়।

এদেশে-আসা শিল্পীদের মধ্যে টিলি কেটল, জন জোফানি, টমাস ড্যানিয়েল, জর্জ চিনারি এবং রবার্ট হোম-ই ছিলেন প্রথম সারির তৈলচিত্রশিল্পী।

রবার্ট হোম-এর আঁকা সুপ্রীম কোর্টের দ্বিতীয় প্রধান বিচারপতি স্যার রবার্ট চেমবার্স-এর প্রতিকৃতিটি কলকাতা হাই-কোর্টের এক নম্বর ঘরে টাঙানো আছে। এখন ওই ঘরেই বসে প্রধান বিচারপতির আদালত।

চিত্রাঙ্কনের জন্যে প্রভূত খ্যাতি এবং অর্থের অধিকারী হলেও চিত্রাঙ্কনে ব্যর্থতার পরিচয়ও দিয়েছেন ওই শিল্পীদের কেউ কেউ। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় চিনারির কথা। উইলিয়াম কেরির প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়ে কেরির ছবি আর শেষ করা হয় নি চিনারির। শেষে কেরি আর তাঁর মুনশীর মনোজ্ঞ তৈলচিত্রটি এঁকে দেন কেরিরই বন্ধু রবার্ট হোম। লন্ডনের স্টেপনি কলেজের লাইব্রেরিতে আছে এই ছবিটি।

রুশ শিল্পী ভেরেশচেগিনকে নিয়ে লেখা হয়েছে একটি অধ্যায়। কোম্পানির রাজত্ব চলে যাবার অনেক পরে এদেশে এসেছিলেন তিনি। ভেরেশচেগিনের সঙ্গে আরও এক রুশ শিল্পী সলতিকভ-এরও উল্লেখ আছে গ্রন্থে। প্রিন্স সলতিকভই কোম্পানির আমলে ভারতে এসেছিলেন। গ্রন্থে ভেরেশচেগিনের আঁকা সিপাহি বিদ্রোহের যে ছবিটি ছাপা হয়েছে তা কিন্তু বিদ্রোহের অনেক পরে আঁকা। বহির্বিশ্বে সবচেয়ে পরিচিত এই রুশ শিল্পীকে বলা হয় 'অ্যাপোসল অব্ পীস'। যুদ্ধের নৃশংস পরিণতিকে চিত্রপটে তুলে ধরে যুদ্ধের বিরোধিতাই করেছেন তিনি আজীবন। প্রথম জীবনে সৈন্যবাহিনীতে থাকলেও ভেরেশচেগিন রুশ-জাপান যুদ্ধে যোগ দেন নি। নৌ-যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ছবি আঁকার জন্যে রুশ ফ্ল্যাগশিপ 'পেট্রোপ্যাভলসক'-এ তিনি উঠেছিলেন। 'পেট্রোপ্যাভলসক' কোনো জায়গার নাম নয়। অ্যাডমিরাল যে জাহাজে থাকেন সেই জাহাজকেই বলা হয় ফ্ল্যাগশিপ। ওই ফ্ল্যাগশিপ ছিল ভাইস-অ্যাডমিরাল ম্যাকারফ-এর। তাঁর অতিথি হয়েই ভেরেশচেগিন জাহাজে ওঠেন। পোর্ট আর্থারের কাছাকাছি পে-চি-লি উপসাগরে জাপানি মাইনের বিস্ফোরণে ডুবে যায় 'পেট্রোপ্যাভলসক'। ওই জাহাজডুবিতেই মৃত্যু হয় ম্যাকারফ আর ভেরেশচেগিনের।

এ ধরনের গ্রন্থে লেখকের একটি দায়িত্ব থাকে। তা হল শিল্পীর জন্ম আর মৃত্যুর সময় জানানো। এ দুটির কোনো একটির উল্লেখ না থাকলে শিল্পীদের জীবনকাহিনীও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আলোচ্য প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর ক্ষেত্রে জন্ম-মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করা হলেও কোলসওয়ার্দি গ্র্যান্টের ক্ষেত্রে তা নেই। ১৮১৩ খৃীষ্টাব্দে লন্ডনে গ্র্যান্টের জন্ম। ১৮৪০তে কলকাতায় তাঁর জীবনাবসান। তাঁর জীবনের দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বাদ পড়েছে। তিনি ছিলেন কলকাতার মেকানিকস ইনস্টিটিউশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩৯)। ওই প্রতিষ্ঠানে তিনি চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিতেন। আবার শিবপুরের বেঙ্গল ইনজিনীয়ারিং কলেজের আদিপর্বে চিত্রাঙ্কন শিক্ষাদানের দায়িত্বও ছিল কোলসওয়ার্দি গ্র্যান্টের। সে সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে সিভিল ইনজিনীয়ারিঙের ক্লাস হত।

বিগত কালের লেখক আর গ্রন্থকারেরা বিদেশী শিল্পীদের নিয়ে যা লিখে গিয়েছেন তা সম্পূর্ণ নয়। ও'দের লেখায় ত্রুটি-বিচ্যুতিও আছে। তা ছাড়া কোম্পানির আমলে এদেশী দলের এমন বহু ইউরোপীয় শিল্পী সম্পর্কে আজও বিস্তারিত কোনো আলোচনাই হয় নি। গ্রন্থকার যদি এ বিষয়ে তৎপর হন তবে বিস্মৃত ওই শিল্পীদের কথা আমরা জানতে পারি।

ইদানীং পুরনো গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ কিংবা অনুবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন প্রকাশকেরা। ফলে, দুষ্প্রাপ্য কিছু গ্রন্থ সহজপ্রাপ্য হচ্ছে আজকাল। 'কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত'ও একটি দুষ্প্রাপ্য ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ। লোকনাথ ঘোষ-রচিত 'দ্য নেটিভ অ্যারিস্টোক্রেসি অ্যান্ড জেন্ট্রি অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থের অধ্যায়বিশেষের অনুবাদ এই বাঙলা সংস্করণ। একশ বছরেরও আগে প্রকাশিত মূল ইংরেজি গ্রন্থে কলকাতার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এবং তাঁদের পারিবারিক বৃত্তান্ত এবং কর্মকাণ্ডের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল আলোচ্য গ্রন্থটি সে অংশটির বঙ্গানুবাদ।

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকের কলকাতার কিংবদন্তীর নায়কদের আলোচনার মাধ্যমে বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি তথা ধর্মীয় আচরণের দিকগুলি পরিস্ফুট হয়েছে। ওই ব্যক্তিদের অনেকেই প্রভূত মর্যাদা এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সমাজ তথা সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের মূলে এ'দের দান ছিল বহুমুখী। স্বভাবতই এ ধরনের গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

কিন্তু মূল গ্রন্থে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকায় তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অনুবাদেও। একারণে গ্রন্থটির সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। স্বতন্ত্র এক সংযোজনীতে অথবা পাদটীকার সাহায্যে মূল গ্রন্থের ন্যূনতা অথবা অপূর্ণতাকে অনুবাদক যদি সম্পূর্ণ অথবা সংশোধিত করে দিতেন তবে গ্রন্থটির মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত।

যেমন রামগোপাল ঘোষ লর্ড হার্ডিনজের মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবই শুধু নেন নি, প্রস্তাবকে রূপায়িত করার জন্যেও সচেষ্ট হন। হার্ডিনজের অশ্বারূঢ় মূর্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন রামগোপাল। মূর্তি তহবিলে চাঁদাও দিয়েছিলেন তিনি পাঁচশো টাকা।

রামগোপাল যে শ্মশানটির অপসারণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন সেটি নিমতলা শ্মশান। জাস্টিসদের সভায় নয়—নিমতলার অপসারণের বিরুদ্ধে ভাষণ দেন তিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে (১৮৬৪)। শ্মশান অপসারণের বিরোধিতার জন্যে দিল্লির ইংরেজদের বিখ্যাত এক সাময়িকে কার্টুন এঁকে রামগোপালকে বিদ্রূপ করা হয়েছিল (১৮৬৪)।

পাথুরিয়াঘাটার দেওয়ান রামলোচন ঘোষের পরিবারবর্গের আলোচনায় বলা হয়েছে শম্ভুনাথ ঘোষ "বীরভূম জেলায় অ্যারারুট আবিষ্কার করে সেখানে এর চাষ করান"। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ জি টি এফ স্পিড "এতদ্দেশে অ্যারারুটের চাষ আরম্ভ করেন"। বাগান তথা কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে চল্লিশের দশকে একাধিক গ্রন্থও রচনা করেন স্পিড।

আবার, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্রের নাম গণেন্দ্রমোহন নয়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন। শুধু বাঙালিদের মধ্যেই নন, জ্ঞানেন্দ্রমোহনই প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কেও একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। রাজেন্দ্রলাল হাঙ্গেরির রয়্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর সদস্য ১৮৬৫-তে নির্বাচিত হন নি, হয়েছিলেন ১৮৭৪-এ। সদস্য নির্বাচিত হবার পর বুডাপেস্টের যে 'সানডে নিউজ'এ রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল তার ম্যাগইয়ার নাম 'ভাসারনাপি উজসাগ' (সানডে নিউজ)। ম্যাগইয়ার ভাষায় সচিত্র ওই প্রবন্ধটির (৮ নভেম্বর ১৮৭৪) লেখক থিওডোর ডুকা। পরে চোমা দ্য ক্যরস-এর জীবনী প্রকাশ করে যশস্বী হন ডুকা (১৮৮৫)।

যে বিদেশী বিম্বজ্জনদের সঙ্গে রাজেন্দ্রলালের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ছিল তাঁদের অন্যতম ইতালীয় পণ্ডিত এ দ্য গুবারনেতিস। গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ থাকায় জানাই যে, গুবারনেতিস স্বরচিত ইতালীয় ভাষার এক অভিধানে রাজেন্দ্রলালের জীবনী লিপিবদ্ধ করেন (১৮৮০)। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর অধ্যায়ে গুবারনেতিস-এর উল্লেখ আছে। গুবারনেতিস শুধু শৌরীন্দ্রমোহনকেই নয়, রাজেন্দ্রলাল আর রামদাস সেনকেও অন্তর্ভুক্ত করেন ওই ইতালীয় বায়োগ্র্যাফিক্যাল ডিকশনারিতে।

লোকনাথ ঘোষ যে সময়ে মূল গ্রন্থটি রচনা করেন সে সময়ে গ্রন্থভুক্ত বেশ কয়েকজন জীবিত ছিলেন। সেই কারণে অনেকের দেহত্যাগ এবং অন্যান্য বিষয়ের উল্লেখ মূল গ্রন্থে যুক্ত করা সম্ভব হয় নি। এ অসম্পূর্ণ কাজের দায়িত্ব অনুবাদক নিলে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতেন।

অনুবাদককে ধন্যবাদ, লোকনাথ ঘোষ সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সফল না হলেও অস্বীকার করব না—তাঁর পিতৃপরিচয় প্রথম পাওয়া গেল এ গ্রন্থেই। বিবিধ গুণের অধিকারী লোকনাথ সম্পর্কে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই, যদিও অনেক গবেষকই তাঁর কাছে ঋণী। প্রসঙ্গত তাঁর সম্পর্কিত একটি তথ্যের উল্লেখ করব। গোপালকৃষ্ণ গোস্বামী-সহযোগে লোকনাথ ঘোষ 'দশ অবতার' নামে এক সচিত্র গ্রন্থও প্রকাশ করেন (১৮৮৬)।

বাগবাজারের হরি ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্রের সহধর্মিণী হরসুন্দরী কলকাতার শেষ সতী, অথবা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর মুখের ছাঁচ তুলেছিলেন এক ইতালীয় শিল্পী, কিংবা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত আদতে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ—এমন সব কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে তিনশ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে। এই কারণে অভিনিবেশসহকারে পড়েছি গ্রন্থটি। এ ছাড়া চল্লিশ জন কৃতবিদ্য বাঙালির প্রতিকৃতি গ্রন্থটিকে করে তুলেছে আকর্ষণীয়।

পুরনো যুগের কারুকার্যখচিত চিত্রবিহীন এক ফ্রেমের ব্যবহার করে অজয় গুপ্ত গ্রন্থের প্রচ্ছদের যে রূপরেখা করেছেন তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

কমল সরকার

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ)। সম্পাদনা সনৎকুমার গুপ্ত। প্রজ্ঞাভারতী, কলকাতা। বারো টাকা।

লেখকের জীবনী বা আত্মজীবনী একান্তভাবে আধুনিক সাহিত্যের বস্তু। প্রাচীন বা মধ্যযুগের সাহিত্যে ইহা বিরল কি অনুপস্থিত। গ্রীক সাহিত্যে সক্রেটিসের কথা প্লেটোর মুখে শুনি, জেনোফোনের মুখে শুনি। কিন্তু কোনো গ্রীক কবির কথা তাঁহার মুখে বা আর কাহারও মুখে শুনি না। আইসেক্রেটিস সাইপ্রাসের এক রাজার কাহিনী লিখিলেন ; কিন্তু কোনো সমসাময়িক গ্রীক লেখকের জীবনকথা লিখিলেন কই? প্লুটার্কের জীবনী-সংগ্রহে পেরিক্লিস বা সীজারের সাক্ষ্য পাই, হোমার বা ভারজিলের সাক্ষাৎ পাই না। ল্যাটিন সাহিত্যও দেখি ল্যাটিন কবিদের সম্বন্ধে নীরব। ট্যাসিটাস তাঁহার শ্বশুর রোমক বীর এগ্রিকোলার জীবনী লিখিলেন, সুটোনিয়াস দ্বাদশ সীজারের জীবনী লিখিলেন, কয়েকটি কবির জীবনীও লিখিলেন কিন্তু আর কোনো বিশিষ্ট ল্যাটিন জীবনীকার কোনো ল্যাটিন কবির জীবনী লিখিলেন না। বোধহয় প্রাচীন গ্রীস বা প্রাচীন রোমের মানুষ ভাবিতেন—কবির সার্থক পরিচয় তাঁহার কাব্যে এবং উহার বাহিরে তাঁহার কোনো পরিচয় নাই।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যেও দেখি, কবি বা লেখকের জীবনী অনুপস্থিত। সেন্ট অগাস্টিনের ল্যাটিনে রচিত আত্মজীবনী এক অপূর্ব বস্তু। কিন্তু ইহা লেখকের আত্মজীবনী নয়, ধর্মগুরুর আত্মজীবনী। লেখকের জীবনী লেখার আরম্ভ রেনেসাঁস যুগে। উইলিয়াম রোপার-রচিত সার টমাস মোরের জীবনী ইংরাজি সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ জীবনী-গ্রন্থ। আইজাক ওয়াল্টনের কবি ডানের জীবনী (১৬৪০) ইংরাজি

ভাষায় প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিজীবনী। ডাঃ জনসনের 'দি লাইভ্‌স্‌ অব দ্য পোয়েটস' (১৭৭৯-১৭৮১) ইংরাজি লিটেরারি বায়োগ্রাফির এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ভারতীয় সাহিত্যেও লেখকের জীবনী এক অর্বাচীন সামগ্রী। বাণের হর্ষচরিতে তিনি আপন-কথা কিছু বলিয়াছেন, কিন্তু উহাকে ঠিক আত্ম-স্মৃতি বলিতে পারি না। কোনো কবির জীবন লইয়া কাব্য-রচনার কথা তখন কেহ ভাবিতে পারেন নাই। মধ্যযুগে চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের জীবনকাহিনী লইয়া কাব্য লিখিলেন; সম্রাট বাবর তুরকি ভাষায় তাঁহার আত্মকথা লিখিলেন; সম্রাট জাহাঙ্গীর ফরাসি ভাষায় তাঁহার আত্মকথা লিখিলেন। কিন্তু কোনো বিশিষ্ট ভারতীয় কবির কথা তাঁহার মুখে বা অন্য কাহারও মুখে শুনিলাম কই?

উনবিংশ শতাব্দীতে যে নূতন বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি হইল তাহা দেখিতেছি লেখকের জীবনী তথা আত্মজীবনীতে সমৃদ্ধ। জীবনী-সাহিত্যের মূলে জীবন-জিজ্ঞাসা, আত্মজীবনী-সাহিত্যের মূলে আত্মজিজ্ঞাসা। উভয়ের মূলে এক ইতিহাস-বোধ। এই জীবন-জিজ্ঞাসা, আত্মজিজ্ঞাসা এবং ইতিহাস-বোধ আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের প্রাণবস্তু।

গত শতাব্দীর প্রথম বাঙলা কবি-জীবনী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৫৬)। 'সম্ভাবশতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'রা-সের ইতিবৃত্ত' (১৮৬৮) বাঙলা ভাষায় প্রথম কবিকৃত আত্মকথা। আমাদের ভাষার দ্বিতীয় সাহিত্যিক আত্মজীবনী নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন' (১৯০৭-১৯১৩), তৃতীয় রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' (১৯১২)। মনে হয়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি (১৯২০) এই হিসাবে চতুর্থ। তবে এই জীবনস্মৃতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে রচনা করেন নাই। তাঁহার আত্মকথা তাঁহার মুখে শুনিয়া বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ যখন প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে কলেজ স্কোয়ারের এক পুরানো বইয়ের দোকান হইতে ক্রয় করিয়া প্রথম পড়ি তখন মন্মথনাথ ঘোষ-রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনী (১৯২৭) হাতের কাছেই ছিল। তথ্যের দিক হইতে মন্মথনাথ ঘোষের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' এক আকর-গ্রন্থ। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মুখে শোনা তাঁর জীবনকথার স্বতন্ত্র মূল্য—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বইখানি পড়িয়া উপলব্ধি করিলাম। তবে বইখানি সম্বন্ধে সেদিন যে প্রশ্ন মনে জাগিয়াছিল আজও সেই প্রশ্ন মনে রহিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনী হিসাবে লিখিত হয় নাই। আবার ইহা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যোতিরিন্দ্র-স্মৃতি বলিয়া ঠিক গ্রহণ করিতে পারি না। অর্থাৎ বইখানি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনীও নয়, তাঁহার লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথাও নয়। বসন্তকুমার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বজওয়েল নন। বজওয়েল ডাক্তার জনসনের সঙ্গে ১৭৬৩ হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭৮৪ পর্যন্ত একুশ বছর ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। তাঁহার 'দ্য লাইফ অব ডক্টর জনসন' যখন ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তখন এই গ্রন্থটিকে ইংরাজি ভাষার এক শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। ইহা একাধারে জীবনকথা এবং স্মৃতিকথা। ডাঃ জনসনের বহু উক্তি বজওয়েল যেমন শুনিয়াছেন তেমন লিখিয়াছেন। তিনি যাহা শুনিয়াছেন, যাহা দেখিয়াছেন সবই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া মেকলে লিখিয়াছেন যে বজওয়েল এক মহামূর্খ বলিয়াই বজওয়েল এক শ্রেষ্ঠ জীবনীকার। মেকলের এই অতিশয়োক্তি বজওয়েলের গুণগ্রাহী পাঠক উপেক্ষা করিয়াছেন। তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে বজওয়েল ডাঃ জনসনের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থিত করিবার প্রয়াসে নিজের ব্যক্তিত্বকে বহুলাংশে উহ্য রাখিয়াছেন।

কিন্তু বসন্তকুমার মাত্র এক বছর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১২ সালে রাঁচিতে বসন্তকুমার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গৃহে তাঁহার স্মৃতিকথা দিনের পর দিন শুনিয়াছেন। ১৯১৪ সালে সেই শ্রুত বস্তু তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বারো সংখ্যায় প্রকাশ করিলেন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু গ্রন্থখানিকে ঠিক অনুলিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। গ্রন্থের কিয়দংশ বন্ধনী-চিহ্ন দিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে, আবার কিয়দংশ ঐরূপ চিহ্ন ছাড়াই উপস্থিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, যে অংশ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্তি বলিয়া উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার ভাষা সাধু ভাষা। বলা বাহুল্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চলিত ভাষায়ই বসন্তকুমারের কাছে স্মৃতিচারণা করিয়াছেন। আবার ইহাও লক্ষ্য করিতে হয় যে এই গ্রন্থের কোথাও বসন্তকুমারের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথোপকথনের বিশেষ বিবরণ নাই। অনুমান করিতে পারি, বসন্তকুমারের এই 'রচনা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেখিয়া তথ্যের দিক হইতে ইহাকে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায়—ইহা কাহার রচনা। আখ্যানপত্রে দেখি লেখা হইয়াছে, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।' এবং উৎসর্গপত্রে লেখক বলিতেছেন—'গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিলাম।' কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কথিত বসন্তকুমার-অনুলিখিত জীবনস্মৃতিকে 'গঙ্গাপূজা' বলি কোন হিসাবে? ইহার সবটাই তো গঙ্গাজল। মনে হয়, বসন্তকুমার ইহাকে ঠিক একখানি অনুলিখিত গ্রন্থ বলিয়া উপস্থিত করেন নাই। এই গ্রন্থে শ্রুতি স্মৃতির সঙ্গে মিশিয়া এক অপূর্ব সাহিত্যবস্তুর সৃষ্টি করিয়াছে। এই যুক্তিতেই বোধহয় আচার্য সুকুমার সেন বইখানি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মকাহিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে শুনিয়া লেখা মূল্যবান গ্রন্থ।" ('বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৪র্থ খণ্ড, ১৯৪৮)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক বা অন্যান্য রচনা আজ সাধারণ পাঠকের কাছে প্রায় অপরিচিত। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলীও এখন বিস্মৃত। তবু মনে হয়, আমাদের সাহিত্যে কোথায় যেন এক অদৃশ্য দেবদূতের ন্যায় তিনি উপস্থিত। তাঁহার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব, তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার অন্তরের নিবিড় যোগ তাঁহাকে একভাবে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব এই গ্রন্থখানিতে যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে তেমন অন্য কোনো গ্রন্থে ফোটে নাই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কী সম্পর্ক ছিল তাহা কবির মুখেই শুনিতে পারি। ১৮৮১ সালে কবি তাঁহার নাটক 'রুদ্রচণ্ড' ভাই জ্যোতিদাদাকে উপহার দিয়া লিখিলেন:

ছেলেবেলা হতে, ভাই, ধরিয়া
আমারি হাত
অনুক্ষণ তুমি মোরে রাখিয়াছ
সাথে সাথ।
তোমার স্নেহের ছায়ে কত না
যতন করে
কঠোর সংসার হতে আবরি
রেখেছ মোরে।

ঐ বছরেই প্রকাশিত 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' জ্যোতিদাদাকে উৎসর্গ করিয়া লিখিলেন: "ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।" 'গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি' যে জ্যোতিদাদার কাছেই হইয়াছিল তাহা কবি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন: 'প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার এই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম।"

তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের অনেক রহস্য এখনও দুর্ভেদ্যই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের জীবনী-সাহিত্যে বজওয়েলের বড় অভাব দেখি না। সহসা কোনো বঙ্গীয় লিটন স্ট্র্যাচির কঠোর দৃষ্টিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের কোনো অনাবিষ্কৃত দিক ধরা পড়িবে কিনা জানি না। কিন্তু কোনো স্ট্র্যাচি এই মানুষটির চরিত্রের মহত্ত্ব ও মাধুর্যকে ম্লান করিতে পারিবে না। হয়তো যে গভীর দুঃখবোধ তাঁহার শেষ জীবনে তাঁহাকে সকলের কাছ হইতে একটু দূরে সরাইয়া নিয়াছিল তাহার কারণ একদিন উদ্ঘাটিত হইবে। কিন্তু এই স্মৃতিকথার মহৎ মানুষটি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকিবেন।

শ্রী সনৎ গুপ্ত এই গ্রন্থখানির এক দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার স্বলিখিত ভূমিকাটি বহু প্রাসঙ্গিক তথ্যে সমৃদ্ধ।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিশ্বসাহিত্য

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি গ্যেটে তাঁহার বন্ধু একারমানের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে যখন ভেল্ট-লিটেরাটুর কথাটি উচ্চারণ করিলেন, তখন উক্ত জার্মান পদটির তিনি কী অর্থ করিয়াছিলেন জানি না। কথাটি যুগ্মশব্দ, অর্থাৎ সমাসবদ্ধ পদ। জার্মান ভাষায় ভেল্ট শব্দের অর্থ বিশ্ব এবং লিটেরাটুর শব্দটির অর্থ সাহিত্য। শব্দ দুইটি পর পর উচ্চারণ করিলে বা লিখিলে তাহার অর্থ হইবে বিশ্ব-সাহিত্য। গ্যেটে কিন্তু শব্দ দুইটি পৃথক পৃথক করিয়া ব্যবহার করেন নাই। তিনি শব্দ দুইটিকে একত্র করিয়া একটি শব্দে পরিণত করিয়াছেন। সেই জার্মান যুগ্মশব্দের বা কম্পাউন্ড-ওয়ার্ডের বাঙলা প্রতিশব্দ হইবে বিশ্ব-সাহিত্য। কিন্তু বিশ্বসাহিত্য শব্দটির অর্থ কী? জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বাঙ্গালা ভাষার অভিধান"-এ শব্দটির দুইটি অর্থ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম অর্থ অর্থাৎ প্রাইমারি মিনিং হইল, 'সকল দেশের সকল যুগের সাহিত্য'। অর্থাৎ শব্দটি এক ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাসবদ্ধ বিশেষ্যপদ। শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ 'উচ্চসাহিত্য' অর্থাৎ ক্লাসিকস। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্য পদটি এই দুই অর্থের কোনো অর্থেই ব্যবহার করেন নাই। বিশ্বসাহিত্য সারা বিশ্বের সকল সাহিত্যের সমাহার, এমন কথা বলিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিশ্ব-সাহিত্য' প্রবন্ধে সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা বলা হইল না। যে-কোনো সাহিত্যেরই এক বিশ্বজনীনতা রহিয়াছে, অর্থাৎ সকল সাহিত্যই সকলের সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-সাহিত্য বলিতে তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। পদের প্রথম শব্দটি এখানে বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হই-

তেছে এবং পদটি কর্মধারয়-সমাসবন্ধ পদ।

বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যাকরণের এই সাধারণ কথাটির উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, গোটে-কথিত ভেল্টলিটেরাটুর লইয়া দেখিতেছি পণ্ডিতসমাজে বড়ো গোল। ভেল্ট্‌-লিটেরাটুর যুগ্মশব্দটিতেও গোটে ভেল্ট্‌ শব্দটিকে বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। এবং পুরা জার্মানি শব্দটির ইংরাজি অনুবাদে ওয়ার্ল্ড শব্দটিও বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত। তবে ইংরেজিতে ওয়ার্ল্ড লিটেরেচার শব্দ দুইটিকে একটি শব্দরূপে লিখিবার উপায় নাই। হাইফেন-যোগে শব্দ দুইটিকে যুগ্মশব্দরূপে লিখিতে পারি। গোটের ভেল্টলিটেরাটুর আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসাহিত্য এক বস্তু।

বিশ্বসাহিত্য শব্দটি এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাঙলা ভাষায় কেহ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া জানি না। ভেল্টলিটেরাটুর শব্দটি কিন্তু এই বিশেষ অর্থে জার্মানি ভাষায় গোটের পূর্বে অগাস্ট ভিলহেল্‌ম্‌ শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫) ব্যবহার করিয়াছেন। এই শ্লেগেল এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফ্রিড্রিক শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯) ভারতীয় সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। এই দুই ভাই সেই কালে এক ইউনিভার্সাল পোয়েটিকসের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইউরোপে বিশ্বসাহিত্যের প্রথম প্রবক্তা গোটে। তবে শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়ের সাহিত্যকর্মে এই আদর্শের সূচনা গোটে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

এখন দেখা যাউক, বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে গোটে ঠিক কী বলিয়াছেন। বন্ধু একারমানের সঙ্গে আলোচনায় তিনি বলিলেন : 'জাতীয় সাহিত্য এখন এক অর্থহীন কথা। বিশ্বসাহিত্যের যুগ আসন্ন। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া উহার আবির্ভাব ত্বরান্বিত করি।' অর্থাৎ বিশ্বসাহিত্যের বোধ অর্জন করিতে হইবে। সকলের মধ্যে ঐ বোধের উন্মেষের জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় পাঠকসমাজ এই পরিশ্রম বড়ো করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এমনকি গোটের কাছেও বিশ্বসাহিত্য বলিতে বুঝাইত ইউরোপীয় সাহিত্য।

কিন্তু আসল সমস্যা অন্যত্র। গোটের বিশ্বসাহিত্যের ভাবনাটি ইউরোপের সাহিত্যশাস্ত্রবিদগণ ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। বোধহয় গোটে তাঁহার এ কথাটির অর্থ বড়ো স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তবে তিনি যে সাহিত্য সম্বন্ধে একটি মহৎ কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারি। ভেল্টলিটেরাটুর কথাটির বক্তব্য এই যে পৃথিবীর নানা ভাষার নানা সাহিত্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এক অদৃশ্য আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত। যে সাহিত্য তোমার, সেই সাহিত্য আমারও হইতে পারে। যে সাহিত্য আমার, সে সাহিত্য তোমারও হইতে পারে। সাহিত্যের কোনো ভৌগোলিক সীমানা নাই। মহৎ কাব্যের কোনো জাত নাই। ধর্মজীবনে তুমি হিন্দু কি মুসলমান হইতে পার। রাষ্ট্রীয় জীবনে তুমি ভারতীয় কি ইংরাজ হইতে পার। কিন্তু সাহিত্যে তুমি বিশ্বপথিক। তুমি যে-কোনো দেশের সাহিত্যকে আপনার হৃদয়ের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে পার।

কিন্তু ইউরোপ এই কথা বুঝিল কই? আমাদের কালের এক শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পণ্ডিত রেনে ওয়েলেক ভেল্ট-লিটেরাটুর শব্দটির যে অর্থ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে হইবে, গোটের এই মহৎ উক্তিটি আজ একেবারে অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। ওয়েলেক মহাশয় লিখিয়াছেন :

Today world literature may mean simply all literature...or it may mean a canon of excellent works from many languages. (Rene Wellek, *Name and Nature of Comparative Literature*, 1970).

আভিধানিক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বিশ্বসাহিত্য শব্দটির যে অর্থ করিয়াছেন ওয়েলেক সাহেব ভেল্টলিটেরাটুর শব্দটির ঠিক সেই অর্থ করিয়াছেন। গোটে সাহিত্যের যে সার্বভৌম রূপ প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার আভাসমাত্র ওয়েলেকের এই কথায় পাইলাম না। তবে একজন বিশিষ্ট জার্মান পণ্ডিত গোটের ভেল্টলিটেরাটুরের তত্ত্বটির মর্ম উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মনে হইয়াছে। আর্নস্ট রবার্ট কুরটিয়ুস লিখিয়াছেন :

The whole domain of world's poetry is an enchanted island like Prospero's. It is enlarged by every great poet. Goethe's notion of world literature has this meaning among others. He discovered the beauty of Arab and Persian poetry and proclaimed : 'East and West are no more severed, they both belong to God." He paid homage to Kalidasa as well as to Hafiz. And he set to posterity the task of expanding European tradition. (E. R. Curtius, *European Literature and the Latin Middle Ages*, 1948, Eng. tr., W. R. Trask, 1953).

গোটে তাঁহার এই আদর্শ নিজের সাহিত্য-জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ দেখিতেছি তাঁহার বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে মহৎ ভাবনাটি বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ইউরোপীয় ট্র্যাডিশনেরও কোনো প্রসার ঘটিতেছে বলিয়া মনে করি না। ইউরোপীয় চিত্তের যে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা আর্নল্ড টয়েনবিকে পীড়িত করিত তাহা দূর করিবার জন্য আর-একজন গোটের আবির্ভাব হইবে কিনা জানি না। তবে এই প্রাদেশিকতা যে ক্রমে বাড়িতেছে তাহার প্রমাণ নিত্য পাইতেছি। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েটস তাঁহার 'অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ন ইংলিশ ভার্স' নামক সংকলনগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটি কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। হেলেন গার্ডনার-কৃত উক্ত গ্রন্থের নূতন সংস্করণে সেই কবিতা কয়টি বর্জিত হইয়াছে। নিকলসন ও লি-কৃত "অক্সফোর্ড বুক অব্ ইংলিশমিস্টিকাল ভার্স" (১৯১৭) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা নাই।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় তখন এই কথাটি নূতন বলিয়া মনে হইয়াছে, কিন্তু বস্তুটি নূতন বলিয়া মনে হয় নাই। তখন স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে। বাঙালি তখন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। জাতিবৈরের ভাবও তখন গাঢ় হইয়া উঠিতেছে। জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় সংস্কৃতির আদর্শের এক প্রধান প্রবক্তা তখন রবীন্দ্রনাথ। ইহার দশ বছর পূর্ব হইতেই তিনি আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে (২৫ চৈত্র ১৩০১) 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য' প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাংবৎসরিক উৎসব-সভায় পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের মূলকথা : "সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের মধ্যে যখন সাহিত্য আপন উত্তপ্ত সুরক্ষিত নীড়টি বাঁধিয়া বসে তখনই সে আপনার বংশ রক্ষা করিতে, ধারাবাহিকভাবে আপনাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিতে পারে।" ইহার পর স্বদেশী আন্দোলনের সময় কবি দেশের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে কত কথা বলিলেন। ইহার মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল কোন পথে? ইতিপূর্বে কোনো বাঙালি লেখক বিশ্বসাহিত্যের কথা চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। আর রবীন্দ্রনাথ যে গোটে-কথিত ভেল্টলিটেরাটুরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন প্রমাণও কোথাও নাই।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসাহিত্যের বোধ তাঁহার বিশ্ববোধের অন্তর্গত এবং তাঁহার বিশ্ববোধ তাঁহার স্বদেশবোধেরই এক স্বাভাবিক প্রসার। তাঁহার স্বদেশী গানেও দেখি, স্বদেশ যেন সারা বিশ্বের সঙ্গে একাকার হইয়া যাইতেছে।

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে
ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, বিশ্বমায়ের
আঁচল পাতা।

এই বিশ্ববোধের আধ্যাত্মিক উৎসের সন্ধানে যাইতেছি না। কিন্তু এই বোধের সত্যতা যেন কবির কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে স্বতঃ পরিস্ফুট হইতেছে। এমন বিশ্বমুখী স্বাদেশিকতা ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদে দেখি না। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তার আদর্শ তাঁহার আন্তর্জাতিকতার আদর্শের সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছে। দুই ভাব তাঁহার চিত্তে যেন বাগর্থ ইব সম্পৃক্ত। এবং রবীন্দ্রনাথে জাতীয়তা যেমন আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, জাতীয় সাহিত্যও তেমন বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসাহিত্যের ভাবনার মূলে তাঁহার বিশ্ববোধ। বিশ্বসাহিত্যের এই দৃঢ় মূল গোটের ভেল্টলিটেরাটুর-চিন্তায় অনুপস্থিত। জাতীয়তাবোধের সঙ্গে বিশ্ববোধের এক সার্থক সমন্বয় রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করিয়াছেন রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে, কর্মে ও চিন্তায়। 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধটি প্রকাশের প্রায় দুই বছর পর কবি রামমোহন সম্বন্ধে লিখিলেন : "তিনিই আমাদের জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর।" ইহার কিছু পূর্বে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন : "এই আমাদের স্বদেশীয় অধিকারের পথেই যাত্রা করিয়া আজ বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনস্বী এবং সেই সঙ্গে আমাদের সমস্ত দেশ...পৃথিবীর জ্ঞানীসভায় নিজের গৌরবে প্রবেশ করিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্ববোধের স্বরূপ না বুঝিলে আমরা তাঁহার বিশ্বসাহিত্যের তত্ত্ব বুঝিতে পারিব না। ১৯১০-এর ২৪ জানুয়ারি তারিখে কলিকাতায় মাঘোৎসব উপলক্ষে কবি যে ভাষণ দেন তাহার মূল বক্তব্য 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধের বক্তব্য হইতে অভিন্ন। 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধের কথা এই যে 'যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির মর্মে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্যদর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলেছে'। ("শান্তিনিকেতন", ১০ম ভাগ, ১৯১০)

ব্যক্তিমনের সঙ্গে বিশ্বচিত্তের এই যোগের তত্ত্ব এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের এক বিশেষ তত্ত্ব। মারকিন দেশের আর্বানা শহরে তাঁহার প্রথম বক্তৃতার (১০ নভেম্বর, ১৯১২) বিষয় এই 'বিশ্ববোধ'। "শান্তিনিকেতন" ১০ম ভাগে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির সতীশচন্দ্র রায়-কৃত ইংরাজি অনুবাদটি অবলম্বনে প্রদত্ত এই বক্তৃতা সেদিন তাঁহার শ্রোতাদের মুগ্ধ করিয়াছিল। 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধের এই ইংরাজি অনুবাদ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ইংরাজি 'সাধনা' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ—'ইন্ডিভিডুয়াল অ্যান্ড ইউনিভার্স'। এই বিশ্ববোধের ভাব হইতেই বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা। তাই বলিতে চাহিয়াছিলাম, 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধটি 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে সাহিত্য-বস্তুর বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে কবির বক্তব্য স্পষ্ট হইবে।

বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনিতে পারি : 'সাহিত্যকে দেশকালপাত্রে ছোটো করিয়া দেখিলে ঠিকমতো দেখাই হয় না। আমরা যদি এইটে বুঝি যে, সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তবে সাহিত্যের মধ্যে আমাদের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইব। যেখানে সাহিত্য-রচনায় লেখক উপলক্ষমাত্র না হইয়াছে সেখানে তাহার লেখা নষ্ট হইয়া গেছে। যেখানে লেখক

নিজের ভাবনায় সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করিয়াছে, নিজের লেখায় সমগ্র মানুষের বেদনা প্রকাশ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার লেখা সাহিত্যে জায়গা পাইয়াছে। তবেই সাহিত্যকে এইভাবে দেখিতে হইবে যে, বিশ্বমানব রাজমিস্ত্রি হইয়া এই মন্দিরটি গড়িয়া তুলিতেছেন ; লেখকেরা নানা দেশ ও নানা কাল হইতে আসিয়া তাহার মজুরের কাজ করিতেছে। সমস্ত ইমারতের প্ল্যানটা কী তাহা আমাদের কারও সামনে নাই বটে, কিন্তু যেটুকু ভুল হয় সেটুকু বার বার ভাঙা পড়ে।' বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে ইউরোপ এবং আমেরিকায় বড়ো কম আলোচনা হয় নাই। উহার কিয়দংশ পড়িবার সুযোগও হইয়াছে। কিন্তু আর কেহই যেন বিষয়টিকে এত স্পষ্ট করিতে পারেন নাই। একথা অবশ্য মানিয়া লইতে হইবে যে বাঙালির কাছে একটি বাঙলা প্রবন্ধ যত সুবোধ্য হইবে ইংরাজি প্রবন্ধ তত সুবোধ্য হইবে না। তবু বলি, বিশ্বসাহিত্য-ভাবনার এক শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার কাছেই প্রথম শুনিলাম সংসাহিত্যমাত্রেই বিশ্বসাহিত্য এবং সর্বকালের সকল সাহিত্যই সমসাময়িক সাহিত্য।

বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাটি যে-কোনো ভাষার সাহিত্যশাস্ত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য : 'এই বিশ্বসাহিত্যে আমি আপনাদের পথপ্রদর্শক হইব এমন কথা মনেই করিবেন না। নিজের নিজের সাধ্যমত এ পথ আমাদের সকলকে কাটিয়া চলিতে হইবে। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহিয়াছিলাম যে পৃথিবী যেমন আমার খেত এবং তোমার খেত এবং তাঁহার খেত নহে, পৃথিবীকে তেমনভাবে জানা অত্যন্ত গ্রাম্য ভাবে জানা, তেমনি সাহিত্য আমার রচনা, তোমার রচনা এবং তাঁহার রচনা নহে। আমরা সাধারণত সাহিত্যকে এমনি করিয়াই গ্রাম্যভাবেই দেখিয়া থাকি। সেই গ্রাম্য সংকীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্তি দিয়া বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশ চেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

এই উক্তির প্রথমে যে বিনয় প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা লক্ষ করিয়াছি। এ বিনয় আত্মবিশ্বাসী প্রতিভার বিনয়। অনুমান করিতে পারি এক বিশিষ্ট বাঙালি যে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেই কথাটি কবি এখানে স্মরণ করিতেছেন। এই শতাব্দীর প্রথমেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এক ইংরাজি প্রবন্ধে লিখিলেন :

If ever the Bengali language is studied by the Europeans it will be for the sake of Rabindra. He is a world poet.

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, বিশ্বসাহিত্যকে এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কম্প্যারেটিভ লিটেরেচার কেন বলিলেন। প্রবন্ধটিতে কবি স্পষ্ট বলিলেন : 'আমার উপরে যে আলোচনার ভার দেওয়া হইয়াছে ইংরাজিতে আপনারা তাহাকে কম্প্যারেটিভ লিটেরেচার নাম দিয়াছেন। বাংলায় আমি তাহাকে বিশ্বসাহিত্য বলিব।' আজ এমন কথা কম্প্যারেটিভ লিটেরেচারের কোনো ছাত্র যদি তাঁহারা পরীক্ষার খাতায় লেখেন তাহা হইলে তিনি শূন্য পাইবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেন বিশ্বসাহিত্যকে তুলনামূলক সাহিত্যেরই আর-এক নাম বলিয়া ধরিয়াছেন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তিনি যখন বিশ্বসাহিত্যের ভাবনাটি উপস্থিত করেন তখন ইংরাজিতে ওয়ার্ল্ড লিটেরেচার কথাটি বড় প্রচলিত ছিল না। গ্যেটের ভেল্টলিটেরাটুর সম্বন্ধে কোনো আলোচনা তখন ইংরাজি ভাষায় দুর্লভ। অপর পক্ষে কম্প্যারেটিভ লিটেরেচার কথাটি তখন ইংরাজি ভাষায় সুপ্রচলিত। ইংরাজি শব্দ দুইটি প্রথম ব্যবহার করেন ম্যাথু আর্নল্ড। ১৯৪৮-এ লিখিত একখানি চিঠিতে তিনি বলেন :

How plain it is now, though an attention to the comparativs literatures for the last fifty years might have instructed anyone of it, that England is in a certain sense far behind the continent. (*Letters*, ed., G. W. F. Russell, 2 Vols. 1895, p. 8).

আর্নল্ডের এই পত্র-সংগ্রহ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন কিনা তাহা বিশেষজ্ঞগণ বলিতে পারিবেন। আর ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে আর্নল্ড এখানে ঠিক বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না। কিন্তু ইংরাজি সাহিত্য পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের পিছনে পড়িয়া আছে, এই কথাটি যদি বুঝাইতে হয় কম্প্যারেটিভ লিটেরেচার্স কথাটি বহুবচনে ব্যবহার করিয়া তাহা হইলে মনে হয় সাহিত্যের বিশ্বজনীনতার কথাই এখানে বলা হইতেছে। কম্প্যারেটিভ লিটেরেচার্স বলিতে বুঝি পৃথিবীর কতগুলি পরস্পর তুলনীয় সাহিত্য। সেই সকল সাহিত্যের তুলনায় ইংরাজি সাহিত্য দুর্বল। কী হিসাবে দুর্বল। মনে হয় আর্নল্ড বলিতে চাহিতেছেন যে সে সাহিত্য একান্তভাবে ইংরাজের সাহিত্য ; তাহা বিশ্বমানবের সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। অবশ্য আর্নল্ড তাঁহার যুগের ইউরোপীয় সাহিত্যের কথাই বলিতেছেন। কম্প্যারেটিভ লিটেরেচার নামে একখানি গোটা বই ইংরাজি ভাষায় প্রথম লেখেন হাচিসন মেকলে পজ্‌নেট। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই বইখানি রবীন্দ্রনাথ পড়িয়াছিলেন কিনা জানি না। তবে এই সময় হইতে কম্প্যারেটিভ লিটেরেচার যে বিশ্বসাহিত্যেরই আলোচনা, তাহা তিনি জানিতেন। আজ কম্প্যারেটিভ লিটেরেচার এবং ওয়ার্ল্ড লিটেরেচারের মধ্যে যে ভেদ করা হইতেছে তাহা এই শতাব্দীর প্রথম দিকের সাহিত্য-আলোচনায় দেখিতে পাই না। রবীন্দ্রনাথ বলিবেন যে যদি বিশ্বসাহিত্য বলিয়া কোন বস্তু থাকে তাহা হইলে পৃথিবীর সকল সাহিত্য সকল সাহিত্যের সহিত তুলনীয়। বিশ্বের প্রত্যেক সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যেক সাহিত্যের এই সহিতত্বেই বিশ্বসাহিত্যের অবস্থান।

সারা বিশ্বের সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে আপন সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা দেখিতে পাই তাঁহার অসংখ্য সাহিত্য-প্রবন্ধে। ইংরেজিতে তাঁহার এই বিশ্বসাহিত্যবোধের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ "ক্রিয়েটিভ ইউনিটি" (১৯২২)। এই গ্রন্থে দেখি উপনিষদের জগৎ, ইংরাজ কবির জগৎ আর বাউল সংগীতের জগৎ একাকার হইয়া একটি জগতে পরিণত হইয়াছে। ইহার মূল কথা এই যে :

the ultimate truth in man is... in his illumination of mind, in his extension of sympathies across all barriers of caste and colour ; in his recognition of the world, not merely as a storehouse of power, but as a habitation of man's spirit, with its eternal music of beauty and its inner light of the divine presence.

'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে ("সাহিত্য", ১৯০৭) কবি এই কথাটিই বলিয়াছেন : "সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলি প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসসৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে। তাহার কত রূপ, কত রস, কতই বিচিত্র গতি।"

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

সংস্কৃতি-সমাচার

শান্তা দেবী

৩০ মে কথাসাহিত্যিক তথা চিত্রশিল্পী শান্তা দেবীর মৃত্যু ঘটেছে সুপরিণত ৯১ বৎসর বয়সে। তিনি ছিলেন 'প্রবাসী' এবং 'মডারন রিভিয়ু' পত্রিকা দুটির স্বনামখ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বড়ো মেয়ে। তিনি আর তাঁর ছোটো বোন সীতা দেবী শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে শিক্ষালাভ করেন। বেথুন কলেজ থেকে অনারস নিয়ে স্নাতক হন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম রচনা 'হিন্দুস্থানী উপকথা'—এ বইয়ের ছবি এঁকে দেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। চিত্রশিক্ষায় তাঁর গুরু ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ আর নন্দলাল। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় সংযুক্তা দেবী নামে দুই বোনের যৌথ সৃষ্টি 'উদ্যানলতা' উপন্যাস ; 'গার্ডন ক্রীপার' নামে এটির ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ সালে ইতিহাসের অধ্যাপক ডকটর কালিদাস নাগের সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্যান্য রচনা —'সিঁথির সিঁদুর', 'জীবনদোলা', 'চিরন্তনী', 'পঞ্চদশী' ; শিশুদের জন্য 'হুক্কাহুয়া', 'সাত রাজার ধন' (সীতা দেবীর সহযোগে)। 'ভারতের মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাঙলা' নামে ইতিহাসগ্রন্থটির জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভুবনমোহিনী পদক' লাভ করেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে প্রকাশিত হয় তাঁর অনবদ্য স্মৃতিচারণ 'পূর্বস্মৃতি'।

=

সন্তোষ সেনগুপ্ত

২১ জুন ৭৫ বৎসর বয়সে সংগীতসাধক সন্তোষ সেনগুপ্তের দেহান্ত ঘটেছে। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসংগীত আর নজরুলগীতির প্রখ্যাত গায়ক। জন্ম ১৯০৯ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। সংগীতশিক্ষার সূত্রপাত ঠুমরি গানে—বহরমপুরে, মঞ্জু সাহেবের কাছে। পরে তাঁর শিক্ষক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, হিমাংশু দত্ত আর কমল দাশগুপ্ত।

রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর প্রথম রেকর্ড 'কেন বাজাও কাঁকন'। তাঁরই প্রযোজনায় 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা', 'শাপমোচন', 'বাল্মীকিপ্রতিভা' আর 'চিত্রাঙ্গদা'র রেকর্ড প্রকাশিত হয়। 'চিরকুমারসভা' চলচ্চিত্রের তিনিই ছিলেন সংগীত-পরিচালক। কিছু দিন আকাশবাণীতে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষকতাও করেন। গায়ক-জীবনের শুরুতে শৈলেন দাশগুপ্ত-রচিত 'জীবনে যারে তুমি দাও নি মালা, মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল' গানটি তাঁর কণ্ঠে অপরূপ শিল্পসুষমা লাভ করে। অতুলপ্রসাদের গানও তিনি অত্যন্ত দরদ দিয়ে গাইতেন।

=

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার

১৯৮৩ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেছেন কন্নড় ভাষার প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মাস্তি বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার। সাহিত্যের সকল শাখায়ই তাঁর স্বচ্ছন্দ লিপিকুশলতা। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। প্রথম রচনা 'কেলাড়ু সান্না কাথেগলু' (১৯২০)। এটি ছোটোগল্পের একটি সংকলন।

=

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহিত্য-পুরস্কার

১৯৮৪ সালে অবনীন্দ্র-পুরস্কারে প্রবীণ চিত্রকর মুকুল দে এবং দীনবন্ধু-পুরস্কারে প্রবীণ নাট্যকার মন্মথ রায় সম্মানিত হয়েছেন। বঙ্কিম-পুরস্কার লাভ করেছেন সুলেখক সুশীল জানা। পুরস্কৃত গ্রন্থটির নাম 'শতদ্রু-সন্ধ্যা'।

নান্দীকার-এর পঁচিশ বছর

২৯ জুন 'নান্দীকার' নাট্যগোষ্ঠীর পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। গণনাট্য সংঘের পর বাঙলা থিয়েটারে নবনাট্য-আন্দোলনের সূত্রপাত করে 'বহুরূপী'। এর পর গ্রুপ থিয়েটারের দীর্ঘ মিছিলে নান্দীকার তার নিজের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মূলত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, এবং রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিভাস চক্রবর্তী, কেয়া চক্রবর্তী, রাধারমণ তপাদার এবং আরো অনেক প্রতিভাবান অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ হয়েছিল এই নাট্যদলে। দীর্ঘ সময়ে অনেকেই এ দল ছেড়ে নতুন দল গড়েছেন। নাট্যানুরাগী মানুষ কেয়া আর অজিতেশের অভাব সর্বদাই অনুভব করেন। পঁচিশ-বৎসর-পূর্তি উপলক্ষে এঁরা এক সর্বভারতীয় নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে এঁরা তৃপ্তি মিত্র, মহম্মদ রেজা, পি এল দেশপাণ্ডে এবং বিজয় তেনডুলকরকে সংবর্ধনা জানাবেন।

=

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শতবর্ষ

এই বছর উদযাপিত হবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র জন্মশতবার্ষিকী। শহীদুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই (বঙ্গাব্দ ২৭শে আষাঢ় ১২৯২) শুক্রবার। জন্মস্থান ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার পিয়ারা গ্রাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে ১৯১২ সালের এম-এ ; ডকটরেট ও ডিপ্লোফোন ডিগ্রী লাভ করেন প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর উপাধি ছিল বিদ্যাবাচস্পতি। যেসব গ্রন্থ রচনা করে তিনি ভাষাতত্ত্ব এবং সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর রাখেন তার কয়েকটির নাম :—ভাষা ও সাহিত্য, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত ; আমাদের সমস্যা ; বিদ্যাপতি-শতক ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনখণ্ড পূর্ব পাকিস্তানী (বর্তমান বাংলাদেশ) আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলনে তিনি প্রধান সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর শিশু-সাহিত্যমূলক রচনা, আরবি, ফারসি এবং উরদু থেকে অনুবাদগ্রন্থ, ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক গ্রন্থ এবং অন্যান্য সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যাও প্রচুর। বাংলা ভাষার আদিরূপ চর্যাপদের মর্মার্থ উদ্ধারে ডকটর শহীদুল্লার ব্যাখ্যা বিদ্বজ্জনের স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর বিশাল কর্মময় জীবনে তিনি অন্তত ছয়খানি পত্রপত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। শিক্ষকতা-জীবনের শেষদিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস-এর ডীন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'প্রোফেসর এমেরিটাস' মর্যাদালাভ করেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের আদমজী সাহিত্যপুরস্কার (১৯৬৩-৬৭) এবং দাউদ সাহিত্যপুরস্কার (১৯৬৩-৬৭)-এর প্রধান বিচারক।

১৯৬৯ সালের ১৩ই জুলাই রবিবার ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু উপলক্ষে পাকিস্তানের একটি মুখ্য দৈনিকের প্রধান সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, "এই মৃত্যু সারা জাতির আত্মাকে আলোড়িত এবং বিক্ষত করিবে। ইহার ক্ষতির পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। শুধু এইটুকু আমরা অনুভব করিতে পারি, ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র তিরোধানের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং আমাদের জাতীয় মনীষা ও সংস্কৃতির আকাশ হইতে শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত হইল।' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র অবদানের মূল্যায়নপ্রচেষ্টায় ড. সুকুমার সেন এবং ড. পবিত্র সরকারের রচনা মাসিক চতুরঙ্গের অগস্ট সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

RUPA PAPERBACKS

ANTHOLOGY

100 GREAT LIVES Rs. 60 00
100 GREAT ADVENTURES Rs. 60·00
100 GREAT MODERN LIVES Rs. 60·00
all edited by John Canning.

NOVEL

HERMANN HESSE
SIDDHARTHA

This thoughtful novel proves that knowledge is communicable ; Wisdom is not communicable. Rs. 16·00

PHILOSOPHY & RELIGION

HARICH JOHARI
LEELA : Game of Knowledge

There is really only one game, the game in which each of us is a player acting out his role. The game is Leela, the universal play of cosmic energy. Rs. 20·00

THE
WORLD'S RELIGIONS

A comprehensive guide. Articles by Experts. Photographs, Maps, Diagrams facts-finder Reference section.

Published by
LION PUBLISHING
LONDON
£ 11·95 Rs. 194·80

Rupa & Co
15, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-7000 073

Also at—**Allahabad : Bombay : New Delhi**